বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান

নূরুল হোসেন খন্দকার

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান

নূরুল হোসেন খোন্দকার

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান : নূরুল হোসেন খোন্দকার ॥
ইফাবা প্রকাশনা : ১৫৭৬ ॥ ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭'০৯ ॥
প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯৫, জিলকদ ১৪০৮, জুলাই ১৯৮৮ ॥
প্রকাশনায় : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০ ॥
প্রচ্ছদ শিল্পী : রায়হান শরীফ ॥ মুদ্রণে : মোবারক উদ্দিন, চলন্তিকা প্রেস, ১৪, বাংলাবাজার ঢাকা—১১০০ ॥ বাঁধাইয়ে : মাখন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা—১১০০ ॥

মূল্য : ৫০'০০ টাকা

BISWA SABHATAY MUSLIM ABADAN (Contribution of the Muslim to the World Civilization) : Written by Nurul Hossain Khondkar in Bengali and Published by Abu Sayeed Muhammad Omar Ali, Publication Director, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka.

July 1988

Price : Tk. 50·00
U. S. Dollar : 3·00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর ইতিহাসে বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মধ্যযুগে মুসলিম অবদান একটি বহুল আলোচিত ও স্বীকৃত ব্যাপার। এটা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজকের পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতি ও শিল্প সাহিত্যে উৎকর্ষের মুলে রয়েছে মুসলিম বিজ্ঞানী শিল্পী সাহিত্যিকদের সে যুগের নিরবচ্ছিন্ন কর্ম সাধনা ও গবেষণা ভিত্তিক অবদান।

এটাও আজ জ্বলজ্যান্ত সত্য যে, মুসলিম জাতি সেই গৌরব-দীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুস্মৃতি থেকে স্খলিত হয়ে গেছে বহু আগে। সেই মর্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সেই ইতিহাসের যথার্থ অনুশীলনে মনোযোগী হতে হবে, উত্তরাধিকারের সচেতনতা থেকে কর্মতৎপর হতে হবে।

প্রবীণ লেখক নূরুল হোসেন খোন্দকার 'বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং আমাদের অতীতের অবদানের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ দিগ-নির্দেশনা দান করেছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হতে সাহায্য করুন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সর্ব সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার	১
বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানের ভূমিকা	১৪
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম খলীফাবৃন্দ	২৫
বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা	৩১
আধুনিক বিজ্ঞান ও মুসলিম সভ্যতা	৩৪
বিজ্ঞানে মুসলিম খলীফাদের অবদান	৪৩
মুসলিম বিজ্ঞানীবৃন্দ	৬৫
আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবক	৭১
মুসলিম মনীষার অবদান	৮৫
মুসলিম বিজ্ঞানের বেনামীকরণ	১০২
ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান	১১৪
মহাজ্ঞানী আল-বেরুনী	১২০
মহাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা	১৩৪
হায়সাম ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক	১৫১
খৈয়াম, গাযালী, যারকালী প্রমুখ বিজ্ঞানী	১৬৮
তুসী, বাজ্জা, রুশদ প্রমুখ যুগস্রষ্টা বিজ্ঞানী	১৮৬
সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের জনক ইসলাম	২০৫
আরও কয়েকজন মুসলিম নৃপতি বিজ্ঞানী ও মনীষী	২০৮
মুসলিম রসায়ন বিজ্ঞান	২১৮
সমর-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	২৩৮
কুরআন ও কম্পিউটার বিজ্ঞান	২৪৮
সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল	২৫২
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যুক্তিভিত্তিক	২৬২
গ্রন্থসূচি	২৭৭
শব্দসূচি	২৮৭

www.pathagar.com

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান

www.pathagar.com

সম্পাদকের বক্তব্য

জনাব নূরুল হোসেন খোন্দকার অসাধ্য সাধন করেছেন। বয়সে প্রবীণ এই লেখকের ভাষায় প্রাচীনতা রয়েছে; কিন্তু তথ্য সংগ্রহ, বিষয়াবলীর উপস্থাপনা ও রচনার অভিষ্ট লক্ষ্য শুধু আধুনিক নয়, ভবিষ্যত দিগ-নির্দেশকও বটে। লেখকের বহু সাধনার এই অমূল্য পাণ্ডুলিপি ও সম্পদ খুব সতর্কতার সাথে সম্পাদন, পরিমার্জন ও সুবিন্যস্ত করে আধুনিক যুগের পাঠকদের নিকট তুলে ধরা হল।

আশা করব, আধুনিক সত্যানুসন্ধিৎসু মন আরো গভীরে গিয়ে— আরো বহু রত্ন উদ্ধার করে নিতে পারবে। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে মুসলমান মাত্রেরই জাতীয় অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা থাকা আবশ্যক। ঐতিহ্যের এই বুনিয়াদেই গড়ে উঠুক ভবিষ্যৎ মুসলিম বিশ্ব সভ্যতা—প্রবীণ লেখকের সাথে সেই কামনাই আমি করছি।

ইত্তেফাক অফিস
ঢাকা

আখতার-উল-আলম
১৮-৮-৮৪

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানবজাতি একদিকে পুঁজিবাদীদের নির্মম শোষণের করাল কবলে তার বৃহত্তম অংশ কোনমতে বেঁচে আছে মাত্র, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক নাস্তিকতার শিবিরে আটকে পড়েছে মানবজাতির এক বৃহত্তম অংশ। একদিকে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী, অন্যদিকে লাল ও হলুদ সাম্রাজ্যবাদী, মাঝখানে জনগণ নিষ্পিষ্ট ও ভীত-সন্ত্রস্ত।

সুতরাং মানব জাতির মৌলিক ও ব্যাপক কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্‌র শাসনই ন্যায় নিরপেক্ষ আইনের শাসন।

ইউরোপ যদি সম্পূর্ণ আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নতি লাভ করে থাকতে পারে, তাহলে প্রায় হাজার বছরের দীর্ঘস্থায়ী আরব সভ্যতার মূল 'আত্মা' স্বরূপ খুলাফায়ে রাশেদীনের ৩০ বছরের শাসনাদর্শে বর্তমান বিশ্ব সভ্যতাকে পাল্টিয়ে দেওয়া সম্ভব। মানবিক দর্শন ব্যবস্থায় দুদিন পরে পরেই ত্রুটি বের হয় বটে, কিন্তু আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর ব্যবস্থায় ত্রুটি বের হয় না বা ত্রুটি থাকে না।

এই মূলনীতি অনুযায়ী মুসলিম বিশ্ব সভ্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

গ্রীক ও আর্যদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আরবরা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় কত উন্নতি করেছিল এবং তাদের সেই উন্নতি বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান অভ্যুত্থানের ভিত্তি স্থাপনে কতটুকু সহায়তা করেছিল, এ সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বের জনগণ প্রায় ভুলে গিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব তো এখনও অর্ধমৃত বা অচেতন। ইউরোপ তো আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে প্রায় সব নিজের নামেই চালিয়ে দিয়েছে। আরব সভ্যতার ইতিহাসের, বিজ্ঞানের পাতাটাই মসিলিপ্ত করে দিয়ে ইউরোপের ভাষায় এর নাম রাখা হয়েছে পৃথিবীর 'অন্ধকার যুগ'। অথচ প্রকৃত ইতিহাস হল আরব জগত সে সময়ে ছিল সত্যিকারার্থে জ্যোতির্ময় যুগ এবং ইউরোপের ছিল সম্পূর্ণ 'অন্ধকার যুগ'। এই যুগের কালির বোঝা এনে গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আরব সভ্যতার স্কন্ধে।

www.pathagar.com

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান সম্পর্কে ধরে তুলতে গিয়ে তথ্যের দারুণ অভাবের মধ্য দিয়েই এই গ্রন্থটি রচনা করতে হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় বহু প্রামাণ্য পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। আমি সবার নিকট কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' গ্রন্থের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, আমার মত গঠনের অভিব্যক্তি নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে হয়েছে। এই গ্রন্থের আশ্রয় ছাড়া আরব বৈজ্ঞানিকদের অপরিহার্য সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মত গঠন ও প্রকাশ আরও নিরস হতো। এই গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ বলেই থামতে ইচ্ছুক নই, মুসলিম বিশ্বের শত শত লেখক তাঁর গ্রন্থ থেকে পাবেন বলিষ্ঠ তথ্যশক্তি এবং মুসলিম বিশ্ব সভ্যতার পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হলে এই গ্রন্থের বিজ্ঞ লেখক এম. আকবর আলী সাহেব হবেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম তথ্য-জনক।

আরব সাধনার দ্বারা বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে যদি বিশ্ব জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করা না হতো, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ সম্বন্ধে ভারতীয় লেখক মিঃ সমরেশ দেবনাথ বলেন, "মধ্যযুগের আরববাসীগণ যদি অনুবাদ কার্য দ্বারা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার নিদর্শনগুলি পুনরুজ্জীবিত করে রাখার কাজে এগিয়ে না আসতেন তাহলে ঐগুলি বিশ্ব হতে চিরতরে মুছে যেত।"[1]

প্রখ্যাত লেখক এইচ. জি. ওয়েলস বলেন, "গ্রীকরা যদি বাস্তবতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ম দিয়ে থাকেন, আরবগণ এর পালিত জন্মদাতা।"

সুতরাং আরব সভ্যতাই বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার জনক এবং এই আরব সভ্যতার মূল ইসলামী আদর্শে নিহিত। বর্তমান নীতিভ্রষ্ট সভ্যতা পাল্টিয়ে দিয়ে, বিশ্ব মুসলিম সভ্যতার নব জাগরণে আমার মনে এই সাধনা যদি কিঞ্চিৎ কাজে লাগে, আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

তারিখ ১২-১১-১৯৮৩

নূরুল হোসেন খোন্দকার
বারহাট্টা, নেত্রকোনা

১. 'ভারত বিচিত্রা' পত্রিকা, আগস্ট, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

সর্ব সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার

এই বিশ্ব সভ্যতা একমাত্র মানব জাতি ছাড়া অন্য কোন প্রাণী দ্বারা গঠিত নয়। সুতরাং ডারউইন ক্রমবিকাশবাদ বা বিবর্তনবাদের দ্বারা এবং এ্যারিস্টটল মানুষকে বুদ্ধিমান পশু বলে বিকৃতভাবে চিত্রিত করলেও সত্যিকার মানুষকে তা দিয়ে বিভ্রান্ত করা যায় না। প্রত্যেক প্রাণীর চৈতন্য আছে বটে কিন্তু কেবল মানুষই পরম চেতনাবিশিষ্ট সৃষ্টি : জীব-সম্রাট : প্রাণী সামঞ্জস্যকে প্রাণী নয়, পশু নয়—মানুষ মানুষই। আত্মশ্রেণী তাত্ত্বিক সব প্রাণীশ্রেণীর ঊর্ধ্বে বিস্ময়কর বিকাশ বিবর্তন-অধিকারী মানস-শক্তি দ্বারা গঠিত। কেবল মানুষ নয়, বিশ্বে কোন প্রাণী শ্রেণীই আত্মশ্রেণীর মধ্যেই বিকাশ, বিবর্তন ও বিলয় লাভ করা ছাড়া নিজ নিজ শ্রেণীর প্রাচীর কখনও অতিক্রম করে না। কখনও একটি প্রাণীশ্রেণী অন্য প্রাণী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় না। মানুষের সৃষ্টির সেরা কলাকৌশলে গঠিত মানসিক প্রচেষ্টা অন্য কোন প্রাণী-শ্রেণীতেই থাকতে পারে না। সুতরাং মানুষ তথাকথিত প্রাণী 'বস্তু' নয়—পশু নয়—স্রেফ স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ ছাড়া সে আর কিছুই নয়।

সমগ্র প্রকৃতি জগত আদি উপাদান দ্বারা গঠিত : বিকাশ বিবর্তন তার গতি-প্রক্রিয়া মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত পথ যেমন আদি ও অন্ত প্রসারিত পদ্ধতিতে গঠিত, তেমনি মানবসহ অন্যান্য প্রাণী জাতি অন্ত্যেষ্টি নিয়মে আদি উপাদান পদ্ধতিতে গঠিত। ক্রমবিবর্তন বিকশিত প্রক্রিয়ায় গঠিত নয়। এজন্যে মানব জাতিসহ অন্যান্য প্রাণী অনন্ত সত্তার সৃষ্টি-রহস্য শিল্পের প্রয়োজনে (বিকাশ বিবর্তন প্রক্রিয়া নয়) আদি সত্তার রূপ নিয়ে বিশ্ব-সারণিসমূহের মতই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে। সুতরাং এই মানব সভ্যতা যোগ-বিয়োগের অংকের নিয়মের ক্রমবিকাশ-বিবর্তন পদ্ধতিতে গঠিত নয়, মানব জাতিসহ প্রত্যেকটি প্রাণী শ্রেণী এবং প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থই আদি সত্তা নিয়ে

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ করে, আত্মবিকাশ-বিবর্তনে পৃথিবী ও মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে চলছে।

এই অজানা রহস্য মহাসাগরে মানুষের জানার পরিমাণ এত অল্প ও তুচ্ছ যে, একে সমুদ্রে বারি বিন্দুবৎও বলা যায় কিনা—জানি না। জ্ঞানের এত স্বল্প পুঁজি নিয়ে সৃষ্টিরহস্য অবাক অবলোকন ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

আজ থেকে প্রায় ৩ হাজার ৪ শত বছর পূর্বে হযরত মূসা (আঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আজ থেকে প্রায় ২৫৯৫ বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই গণনাও কতটুকু নির্ভুল, তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে কত হাজার বছর আগে এসে মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন, এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এই ত আমাদের পাণ্ডিত্যের পরিধি।

হাজার হাজার বছর পূর্বে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ উল্লিখিত হযরত দাউদ (আঃ) লোহার ব্যবহার জানতেন ; সেই যুগে সভ্যতার আলো-বঞ্চিত পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলের অসভ্য লোকেরা পাথরের অস্ত্র দ্বারা বাঘ, হরিণ শিকার করলে বা ঘর বাঁধতে না জানা বা গুহায় বসবাস করলে, একে 'গুহাযুগ' 'প্রস্তর যুগ' বা 'লৌহ যুগ' বলে কখনও অভিহিত ও চিহ্নিত করা যায় না। একই ধরিত্রীর বুকে চিরকাল একদিকে মানুষ উচ্চাসনে বসে উন্নত স্তরের গোশ্ত-পোলাও দিয়ে ভুঁড়ি সমৃদ্ধ করে, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার মানুষ উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। ধনী-দরিদ্র, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধারে প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ে গড়া দ্বান্দ্বিক পৃথিবী কখনও এক-চেটিয়া রূপরেখার অঙ্কিত অবস্থায় ছিল না। যেমন এক সময়ে পৃথিবী শুধু আঁধারেই ভর্তি ছিল, এ ছিল আঁধার যুগ ; তার পর পৃথিবী বহুকাল ব্যাপী শুধু আলোতেই পরিপূর্ণ ছিল। এ ছিল আলোর যুগ—একথা সত্য নয়। আমাদের এ বিশ্ব আদি থেকে জৈবিক ও মৌলিক পদার্থের দ্বান্দ্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি প্রক্রিয়ায় গঠিত। এই পৃথিবীটি কোন সময়েই কোন বিষয়ে এক ধরনের বিকাশ যুগে পরিণত ছিল না। সর্ববিষয় ও সর্ব উপাদানের সব কিছু জড়িয়ে সর্বংসহা চিরকাল চলে আসছে।

www.pathagar.com

মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যদিও গ্রেটবৃটেনকে লক্ষ্য করে পঞ্চদশ শতককে 'পুঁজির উদ্ভব যুগ' বলে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারো প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে সক্রেটিসের যুগে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের পুঁজির পক্ষে প্রহসন নাটক ও সাহিত্য রচনা প্রচার কি পুঁজিরই উদ্ভব যুগ নয়? শুধু তাই নয়, এখন হতে প্রায় পৌনে ৩ হাজার বছর পূর্বে নমরূদের যুগে এবং এখন থেকে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বছর পূর্বে ফিরাউনদের যুগে কি পুঁজির দৌরাত্ম্য কম ছিল? কাজেই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে পুঁজি বা যে কোন প্রকারের 'যুগ' দ্বারা এই পৃথিবী ক্রমবিকাশ বিবর্তনে বিভক্ত ছিল না।

কোন্ শুভক্ষণে সৌর জগত সূর্যকে আঁকড়ে ধরে সর্ব উপাদান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যেমন অন্য কোন নক্ষত্রের ক্রমবিবর্তনে সূর্য বা সৌর জগত জন্মগ্রহণ করেনি, তেমনি মানব জাতি বা যে কোন প্রাণী জাতি, শক্তি ও বস্তু জগত আদিসত্তার নির্দিষ্ট নিয়মে একদা আত্মপ্রকাশ করে ক্রমবিকাশ বিবর্তনের আওতাধীন হয়ে চলছে। কিন্তু মানবজাতি, প্রাণী জাতি, বস্তু ও শক্তি জগত ক্রমবিকাশ বিবর্তনে সৃষ্ট, বিকশিত—রূপান্তরিত নয়। স্রষ্টার সুনির্দিষ্ট নিয়মে সৃষ্ট জগতের সব কিছু একবারে আত্মপ্রকাশিত হয়ে ক্রমবিকাশের নির্দিষ্ট নিয়মে এগিয়ে চলছে! সুতরাং বাঁদরের আদি পিতা বাঁদর, মানুষের আদি পিতা মানুষ। বিবর্তনবাদ বিভ্রান্তিকর কষ্টকল্পনা মাত্র।

আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) কত হাজার বা লাখো বছর পূর্বে এ ধরায় এসে মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তা বলা মুশকিল। অবশ্যি চীনে পিকিং শহরের উপকণ্ঠে ৫ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের ফসিল এবং জাভা দ্বীপে ১০ লক্ষ বছর পূর্বের মানুষের ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।[১]

খৃস্টজন্মের ১০,০০০ বছর পূর্বে মানবজাতির মধ্যে প্রথম কৃষি কার্যের প্রচলন হয়। কোথা থেকে এই শুভাভিযান শুরু হয়—বলা কঠিন।

১. সমাজ বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণী, টেকস্ট বুক বোর্ড, ঢাকা, ৯৮ পৃষ্ঠা এবং ১০৩ পৃষ্ঠার টীকা।

www.pathagar.com

হয়ত মধ্য এশিয়া বা সেমেটিক ভূমি (আরব) বিশ্ব সভ্যতার সূতিকা গৃহ। মানব জাতির মনুষ্যত্ব সঞ্চার, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের এবং এই সভ্যতার মূল জনক পয়গাম্বরগণ সাধারণভাবে মধ্যপ্রাচ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। এই সভ্যতাকে ব্যবিলনীয় সভ্যতা থেকে উৎপন্ন বলে অভিহিত করা হয়। ব্যবিলনীয় সভ্যতা সেমেটিক। এই সভ্যতাকেই মানব সভ্যতার আদি সভ্যতা বলে অভিহিত করার সাহস আমাদের নেই। কারণ খৃস্টজন্মের ৪,০০০ বছর পূর্বে ব্যবিলনীয় সভ্যতার বিকাশের নযীর পাওয়া যায়। আরো ৬,০০০ বছর পূর্ব হতে মানব জাতির মধ্যে যে কৃষিকার্য প্রচলিত ছিল, তা কোন্ সভ্যতার আওতাধীনে ছিল, তা আমাদের জানার বাইরে। হয়ত ব্যবিলনীয় সভ্যতা চিহ্নিত সময়সীমার আরো কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই সেমেটিক সভ্যতা অভ্যুদয় লাভ করেছিল অথবা আমাদের জানার বহু হাজার বছর পূর্বেই আরো বহু সভ্যতার উত্থান-পতন হয়ে গেছে, যাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই খবর রাখি না।

এই সভ্যতা অতি সুপ্রাচীন বলে তার সম্বন্ধে আমাদের জানার পরিমাণ খুবই কম। ১,৮০০ খৃস্টপূর্বাব্দে মরুভূমির রাজকুমার হিবস্‌রা নীল অববাহিকা দখল করেন। হিটাইটরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। ১৪০০ খৃস্টপূর্বাব্দে হযরত মূসা (আঃ)-এর অভ্যুদয় এবং ৬১২ খৃস্টপূর্বাব্দে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাবও ব্যবিলনীয় সভ্যতারই গৌরবাধীন। ৩,০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে সিন্ধুনদের তটদেশে সিন্ধু সভ্যতার সূচনা হয়। ২,৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দে আর্য সভ্যতা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ৩২২ খৃস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ দ্বারা মৌর্য বংশের অভ্যুদয় ঘটে। ৫৬০ খৃস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধের আবির্ভাবে আর্য সভ্যতা থেকে বৌদ্ধ সভ্যতার উত্থান হয়।

১১৮০ খৃস্টপূর্বাব্দে ট্রয় নগরীর ভাগ্যের অবরোধ ও উত্থান-পতনের দ্বারা গ্রীক সভ্যতার সূচনা প্রমাণিত হয়। ৪৬৯-৩৯৯ খৃস্ট পূর্ব অব্দে সক্রেটিস, ৪২৭-৩৪৭ খৃস্ট পূর্ব অব্দে প্লেটো এবং ৩৮৫—৩২২ খৃস্টপর্বাব্দে এ্যারিস্টটলের অভ্যুত্থান গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ৩২৩ খৃস্টপূর্ব অব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু পর্যন্ত গ্রীক সভ্যতার জ্ঞানে ও শক্তিতে দিগ্বিজয়ী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

১২৬১ খৃস্টাব্দেও গ্রীকরা ল্যাটিনদের কাছ থেকে কন্স্টান্টিনোপল পুনর্বিজয় করে এবং গ্রীক সভ্যতার অস্তিত্ব প্রকাশ পায়।

৭৫৩ খৃস্টপূর্বাব্দে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা রোম সভ্যতার গোড়াপত্তন শুরু হয়। ৬৪২ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মৃত্যু এবং ৬৪৩ খৃস্টাব্দে আরব বা সারাসিন সভ্যতার প্রচণ্ড দাপটের নিকট রোমান সভ্যতার সাময়িক পতন ঘটে। ৮০০ খৃস্টাব্দে ফরাসী সম্রাট পেপিনের পুত্র শার্লিমেনকে রোম নগরীতে রোমান সম্রাট হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যের রাজ্যাভিষেক করা হয়। অনেক সভ্যতার ইতিহাস আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঞ্জি-পুঁথি ছাড়া সমর্থক ছিল না। কিন্তু রোমান সভ্যতা বরাবরই স্তিমিত আকারে হলেও অল্প-বিস্তর সমর্থক ছিল ; সমর্থকশূন্য শুধু বাগজী সভ্যতায় কখনও পরিণত হয়নি। এমন কি ১৪৯২ খৃস্টাব্দে স্পেনে মূর সভ্যতা বা সারাসিন সভ্যতার পতন ফার্ডিনাণ্ডের হাতে হয় অর্থাৎ রোমান সভ্যতার সমর্থকদের হাতেই হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সভ্যতার অভ্যুত্থান যা চলছে, রোমান সভ্যতারই দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র। বর্তমান সভ্যতাকে রোমান সভ্যতারই অঙ্গ-সভ্যতা বলা যায়। মাঝখানে সারাসিন বা ইসলামী সভ্যতা ৯২২ বছর পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়। রোমান সভ্যতার প্রভাবিত বর্তমান খৃস্ট সভ্যতার যেমন বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতির নেতৃত্ব রয়েছে, তেমনি সারাসিন সভ্যতারও খুলাফায়ে রাশিদীন, উম্মিয়া, আব্বাসিয়া, স্পেনের মূর, তুর্কী, বাগদাদের শাসনাধিপত্যের পরিচালনা ছিল। এমনকি ভারতে মোগল-পাঠান শাসন ও ইসলামী সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে চলেছিল।

বর্তমানে যেমন রোমানদের উত্তরাধিকারী ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্ম আবরণে খৃস্ট সভ্যতার প্রভাব বলয়ের খপ্পরে পড়ে মুসলিম জাহান দুর্বল ও পশ্চাদপদ হলেও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমেই চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি ৭৮৬ খৃস্টাব্দে বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকাল থেকে মুসলিম সভ্যতার চরম বিস্তার লাভ করে তখনও দুর্বল হলেও ৮১৪ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ফরাসী সম্রাট শার্লিমেন খৃস্ট সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ৮৭৮ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ওয়েসেক্স রাজাধিপতি মহামতি আলফ্রেড উত্তর পূর্ব ইংল্যান্ডে ডেনদেরে পরাজিত করে খৃস্টধর্মে

www.pathagar.com

দীক্ষিত করা, ৯১৯ খৃস্টাব্দে প্রথম হেনরী ফাউলার জার্মান সম্রাট হয়েই ফ্রান্স জার্মান ভাগ করে আত্মকলহ মীমাংসার চেষ্টা করা এবং ৯২৮ খৃস্টাব্দে ম্যারোজিয়া কর্তৃক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ১০ম পোপ জনকে বন্দী করা প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়, সারাসিন সভ্যতার পূর্ণ বিজয় যুগেও আত্মকলহের দুর্বলতায় অস্থির রোমানরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। ১০৭১ খৃস্টাব্দে তুরস্কের সেলজুকরা যখন বাগদাদ দখল করে নেয়, তখন আরব সভ্যতার মূল ক্ষমতা এসে যায় তুর্কীদের হাতে। প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের সেলজুক রাজবংশের ক্ষমতার বাড়াবাড়ির পরিণতিতেই নির্জীব খৃস্ট শক্তি মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে পুনর্জাগরণের অবকাশ পায়। ১০৭৫ খৃস্টাব্দে তুর্কীরা য়াহূদী-খৃস্টানদের তীর্থস্থান জেরুযালেম গায়ের জোরে দখল করে নেয়। এর ফলে বিক্ষুব্ধ খৃস্টশক্তির পক্ষে রোমের পোপ দ্বিতীয় আর্বান মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ১০৯৫ খৃস্টাব্দে ক্রুসেড আহবান করেন। মুসলিম শক্তি রোমান শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। খৃস্টানরা হয়ে উঠেছিল শক্তিহীন। ক্রুসেডের মাধ্যমে তারা সেই শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার পথ খুঁজছিল, সফলও হয়েছিল। শক্তি মদমত্ত তুরস্কের সেলজুক রাজবংশ ক্রুসেডকেই প্রতিহত করেনি। ৩২৮ খৃস্টাব্দে মহাপ্রতাপশালী রোমান সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের নামানুসারে স্থাপিত রাজধানী কন্সটান্টিনোপলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তুরস্কের সুলতানরা রোমের সুলতান নামে পরিচিত হন। রুমী নামে মশহুর হয়ে ওঠে সুলতানদের ব্যবহৃত টুপী। সেই মহাপ্রতাপশালী সেলজুক রাজবংশীয় একজন সূফী সাধক ১০৫৩ খৃস্টাব্দে ৩ হাজার মাইল দূরবর্তী বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার মদনপুরে ইসলাম প্রচারাভিযানে এসেও তাঁর নিজ নিজ বংশীয় নাম ধারণ করেছিলেন। সেই সূফীর নাম 'শাহ্ সুলতান রুমী'। সেলজুকদের ক্রুসেড সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল জেরুসালেম দখল করা। ৬৩৭ খৃস্টাব্দে হযরত উমর (রাঃ)-এর দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনী জেরুসালেম দখল করে, এই পবিত্র নগরীতে সত্যের পতাকা উড্ডীন হয়। তারপর বহুদিন গেছে। অতঃপর জেরুসালেম মুসলিম, খৃস্ট ও য়াহূদী শক্তির মধ্যে বহুবার হাতবদল হয়েছে। এখনও তার জের চলছে। সেলজুক তুর্কী শক্তিও তার অন্যতম অংশীদার মাত্র।

www.pathagar.com

২৪৬ খৃস্টপূর্বাব্দে শি-হোয়াং-টি (Chi-ho-ang-Ti) চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২১৪ [১] খৃস্টপূর্বাব্দে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণের মধ্য দিয়ে চীনা সভ্যতার নবদিগন্তের সূচনা হয়। পরবর্তী ৪ শ' বছর ধরে এই সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। ২২০ খৃস্টাব্দে চীনে হ্যান রাজবংশের পতনের পর পরবর্তী ৪ শত বছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। কুওসিনট্যাং সরকার পতনের পর ৭০ হাজার কমিউনে গঠিত মহাচীন আবার তার প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে জেগে উঠেছে। রোমান সভ্যতা যেমন ১৩৯৬ বছর চলার পর সারাসিনদের নিকট বিপর্যস্ত হয়ে নয় শতাধিক বছর স্তিমিত থেকে ১৪৯২ খৃস্টাব্দের পর বর্তমান সভ্যতার শীর্ষদেশে গৌরবোদ্দীপ্ত রয়েছে, তেমনি ২৪৬ খৃস্টপূর্বাব্দের পরবর্তী ৪৬৬ বছর পর্যন্ত বিশ্ব সভ্যতাকে চীন সভ্যতা অজস্র অবদানে সমৃদ্ধ করে, পরবর্তী শত শত বর্ষ ব্যাপী গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে লণ্ড-ভণ্ড ও খণ্ড-বিখণ্ড বা পর্যুদস্ত হয়ে এখন পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে নিয়ে আবার বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

৫৩৯ খৃস্টপূর্বাব্দে সম্রাট সাইরাস পারস্য সাম্রাজ্য বা পারস্য সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। এই সভ্যতা গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়েও নিজের অস্তিত্ব ও বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন প্রকার অবদান দিয়ে সহায়তা করে আসছিল। পারস্য সভ্যতা জন্ম থেকে ১১৭৬ বছর বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলার পর সারাসিনদের নিকট ৬৩৭ খৃস্টাব্দে রোমানদের চেয়েও শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। রোমান সভ্যতার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বা এখন পর্যন্ত, কোন সময়ই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু পারস্য সভ্যতা সারাসিন সভ্যতার মধ্যে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে, বর্ণআগ্রাসনের করাল

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরী: অধ্যক্ষ কে. এ. রহমান এম.এ-এর মতে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ খৃস্টপূর্ব ২১৪ অব্দে শুরু হয়। Student favourite dictionary, by A. T. Dev-এর মতে চীনের মহাপ্রাচীর ২১৬ খৃস্টপূর্ব অব্দে নির্মাণ শুরু হয়।

www.pathagar.com

গ্রাসে আরব সভ্যতার অঙ্গ সভ্যতায় বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আরব, মিসর, বাইজেনটিয়ান, পারস্য, মুর, ইরাক, তুর্কী, মোগল প্রভৃতি সব জাতীয় সভ্যতার সংমিশ্রিত শক্তি ও ভাববাদ ও ভাবধারায় আরব বা সারাসিন সভ্যতারই পুষ্টি সাধন করে।

যদিও ৭৫৩ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে রোম সভ্যতা শুরু হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসার (যীশুখৃস্ট) (আঃ) আবির্ভাবের পর পূর্ব-বর্তী সভ্যতাগুলো রোমান সভ্যতার আগ্রাসনের মুখে এসে স্তব্ধ হয়ে যায়। খৃস্টপূর্ব ৪ হাজার বছরেরও অধিককালের সুপ্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতার অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়ে যায় এবং বিশ্ব সভ্যতার গোড়াপত্তনে ও জ্ঞানভাণ্ডারে আদি উপাদান-অবদানের ভূমিকা পালন করে কালগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ব্যবিলনের শূন্যোদ্যান সৃষ্টির কলাকৌশল, পিরামিড-গুলো সৃষ্টির তত্ত্বকথা, মমি বা ফিরাউনদের লাশগুলোর মধ্যকার অদ্ভুত নির্মাণ কলাকৌশল, অতি বিস্ময়কর রাসায়নিক সংরক্ষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি বহু অবলুপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বিশ্ব সভ্যতা বঞ্চিতই রয়ে গেল। অথবা বর্তমান সভ্যতার বিস্ময়কর উপাদান রত্ন সম্ভারে ব্যবিলনীয় সভ্যতার কতটুকু বা কি কি অবদান লুকিয়ে রয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন। উল্লিখিত বিভিন্ন সভ্যতার আদি ও অন্ত সম্বন্ধে একান্ত নগণ্য পরিচয় উল্লেখ করা হলো মাত্র। অন্তর্বর্তী অফুরন্ত ঘটনা সমষ্টির মহা-সাগর দ্বারা বিশ্ব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই জ্ঞানের মহাসাগরসমূহ থেকে আমরা কত যে দূরে আছি এবং কত যে অসহায় ও দুর্বল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই সব সভ্যতার সমন্বয় শক্তি-প্রভাবেই মানব জাতি বর্তমান সুসভ্য পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি সভ্যতাই পয়গাম্বর বা ভাববাদীদের মহাবিপ্লবী প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। সর্ব সভ্যতা স্তরেই ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবীরা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও পরি-শেষে পয়গাম্বর ধর্মবাদী বা ভাববাদীদের প্রবল প্রভাব প্লাবনে প্রতিক্রিয়া-বাদীরা ভেসে গিয়েছে এবং বিশ্ব সভ্যতাগুলো দ্রুতগতিতে মানব জাতিকে টেনে নিয়ে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সর্বকালেই প্রবল পরাক্রান্ত অবিশ্বাসী, নৈরাজ্যবাদী ও উচ্ছৃঙ্খল পন্থীদের বাধা-বিপত্তির সীমাহীন অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও পয়গাম্বরী শক্তির ন্যায়ের সংগ্রামের নিকট ওরা শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন না হয়ে পারেনি। এ কথা আমরা

www.pathagar.com

জোর দিয়েই বলতে পারি, অবিশ্বাসী, বস্তুবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা কোন সভ্যতাই পরিপূর্ণ পরিণতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি। ব্যবিলনীয় সভ্যতার উপর হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর অসাধারণ আধিপত্য ছিল। আর্য সভতা, বেদব্যাস, পরাশর, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রভৃতি ধর্মবাদীর দ্বারাই গঠিত ছিল! সাংখ্য প্রভৃতির মতে দর্শন কোনদিন মাথা তুলতে পারেনি।

১১৮০ খৃস্টপূর্বাব্দ যদি গ্রীক সভ্যতার গোড়াপত্তনের সমকাল ধরা হয়, তবে তার ৫৬৮ বছর পরে ৬১২ খৃস্টপূর্বাব্দে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর আর্বিভাব ঘটে। তাহলে গ্রীক সভ্যতার প্রথম দিকে এবং ব্যবিলনীয় সভ্যতার শেষ দিকে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর অসাধারণ প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রতিফলন হয়েছিল। এমনকি হযরত মূসা (আঃ)-এর লক্ষ লক্ষ য়াহূদী সমর্থকও গ্রীক সভ্যতার নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।

ব্যবলনীয় ও গ্রীক সভ্যতার গোড়ার দিকটি যে দুইজন স্বনামধন্য পয়গাম্বরের আবির্ভাব প্রভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, ওদের ঘোর বিরোধী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্ষমতা উন্নত সম্রাট ফিরাউন নমরূদের নাস্তিক ও নৈরাজ্যবাদ হয়ত বস্তুবাদী ও নাস্তিকপন্থী গ্রীক দার্শনিকদেরকে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল। রোমান সভ্যতার অভ্যুদয়ের সাড়ে সাত শত বছর পর হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী শতকগুলোতে তৎকালীন পয়গাম্বর ও ভাববাদীদের অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তিতে উদ্বুদ্ধ ছিল। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব রোমান সভ্যতাকে সুদূরপ্রসারী দীর্ঘস্থায়ী প্রাণসঞ্চারে সজীব করে। বর্তমান রোমান ছাঁচে গড়া খৃস্ট সভ্যতা ও বস্তুতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার অভিনয় করলেও আসলে তারা হযরত ঈসা (যীশু) (আঃ)-এর প্রতি আনুগত্য, বিশ্বাস ও প্রভাবের বাইরে যেতে পারেনি।

চীনা সভ্যতায় যদিও বস্তুতান্ত্রিক জীবন দর্শন প্রসঙ্গে গ্রীক দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ-কনফুসিয়াসের প্রচণ্ড প্রভাবেই সভ্যতাটি লালিত-পালিত হয়ে গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং সবগুলো সভ্যতাই মানবজাতির কল্যাণার্থে: বস্তুবাদী নাস্তিকতার আদর্শে নয়, পয়গাম্বর ও ভাববাদীদের আদর্শের মহাপ্লাবনে

www.pathagar.com

প্লাবিত হয়ে গড়ে উঠেছিল। পয়গাম্বর ও ভাববাদীদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই যুগে যুগে মানুষ বিশ্ব সভ্যতার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে এসেছে। সর্বসভ্যতাকেই পয়গাম্বর ও ভাববাদীরা অসামান্য প্রভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন বটে কিন্তু একমাত্র সারাসিন সভ্যতাকেই খাস পয়গাম্বরী সভ্যতা বলা যায়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অসামান্য প্রভাবে এ সভ্যতার জন্ম এবং এই সভ্যতাটির অবসান মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মৌলিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই টিকে-ছিল। একথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, সারাসিন সভ্যতার পতন ঘটেছিল শুধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ বিচ্যুতির জন্যেই। তাঁকে ও তাঁর খলীফা চতুষ্টয়কে যদি হুবহু মুসলমানগণ অনুসরণ করত, তাহলে আজ পর্যন্ত সেই সারাসিন ছাড়া অন্য কোন সভ্যতাই মাঝখানে এসে মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ পেতো না। মানুষে মানুষে বৈষম্যশূন্য সমমর্যাদার মর্মস্পর্শী মনুষ্যত্ব বিকাশের মাত্র ত্রিশ বছরের স্থায়িত্বশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার নযীর সারাসিন সভ্যতায় স্থাপিত হয়েছিল, কোন সভ্যতাই এমন নিখুঁত ও সুনিপুণ মনুষ্যত্ববাদ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খাতামুননাবিয়্যীন বা শেষ নবী। তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য যে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা বিকশিত করে গেলেন, সেই সভ্যতার আদর্শেই কেবল বিশ্বের মানুষ শান্তির আস্বাদন লাভ করতে পারে। 'ইসলাম' শব্দটির অর্থই শান্তি।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দুশমনদের যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে সবংশে নির্মূল করে না দিয়ে তাঁর মহাপ্রাণের ভালবাসার শীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছিলেন, শত্রুপক্ষকে সবংশে নিধনের স্থলে, সবংশে পুরুষানু-ক্রমিকভাবে মুসলমান হিসাবে পাওয়াই ছিল তাঁর পরমানন্দ। এ শুধু ভাবাবেগ নয়, ইসলামের পরম সৌন্দর্যও বটে। কারণ ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে সেনাপতি মহাবীর খালিদকে ফাঁসি দিয়ে দিলে ৬৩৬ খৃস্টাব্দে ইয়ারমুক যুদ্ধ বা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য দুটিই নেপোলিয়নের চেয়েও অদ্ভুত বীরত্ব ও সমর-নৈপুণ্যে পরাজিত করে সারাসিন সভ্যতার এত দ্রুত, এত মজবুত গোড়াপত্তন কখনও এত সহজ সুন্দর হতো না। অথবা মহাবীর খালিদের নবম পুরুষ মহাপণ্ডিত ও আউলিয়া হযরত আলাউল হক ১৩২৫

www.pathagar.com

খৃস্টাব্দের পরে সুদূর বাংলায় পুরুষানুক্রমিকভাবে বসবাস করে প্রতিভা সম্পদ দ্বারা বাংলাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ চিরতরেই লোপ পেয়ে যেত। অথবা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহাশত্রু আবু সুফিয়ানকে মক্কা বিজয়ের দিন যুদ্ধশত্রু হিসেবে নিপাত করে দিলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত মাবিয়া (রাঃ) ৬৬১ খৃস্টাব্দে উমাইয়া নামক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে সারাসিন সভ্যতাকে ৯০ বছর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন অংকুরেই বিলীন হয়ে যেত।

উমাইয়ারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশকে ক্ষমতাচ্যুত ও নৃশংস নির্যাতন করেছিল বটে, কিন্তু ইসলাম ও সারাসিন সভ্যতাকে ভালবেসে বিশ্বের শীর্ষস্তরে তুলেও ধরেছিল। হযরত রসূল (সঃ) শত্রুপক্ষকে ধ্বংস না করে বরং তাঁর আদর্শের মধ্যে শত্রুকে চির-বিলীন করে দিয়ে নিজেকে শান্তিবাদী আদর্শের সহনশীলতার প্রত্যক্ষ হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি বংশতন্ত্রের চেয়ে গণ-তন্ত্রকেই আদর্শের সম্পদ বলে মনে করতেন।

ইসলামী সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী অভ্যুত্থানে উন্নত স্তরের অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসায় প্রায় সকল সভ্যতার জ্ঞান-গুণ আহরণ করে এই সভ্যতার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে অভূতপূর্বভাবে বিকাশ সমৃদ্ধ করা হয়েছিল।

সারাসিন সভ্যতা জন্ম লাভের পর, শতাব্দী পার হওয়ার পূর্বেই তার উদ্দেশ্য আদর্শের দিগ্বিজয়ী অভিযান নিয়ে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ—এই ৩টি মহাদেশের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার চলতে থাকে। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে স্পেনের ফার্ডিনান্ডের হাতে সারাসিন সভ্যতার পতন ধরে নিয়ে ৯২২ বছর এই সভ্যতার স্থায়িত্বকাল সিদ্ধান্তটিই একমাত্র সত্য নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের খৃস্ট ও খৃস্ট প্রভাবিত শক্তিগুলো যেমন রোমান সভ্যতারই বিজয়কেতন উড্ডীন করে বর্তমান সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, তেমনি মোগল আমল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম শক্তিগুলো রোমান সভ্যতার পাল্টা প্রতিদ্বন্দ্বী সারাসিন সভ্যতার পরবর্তী ঐতিহ্য প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে মস্তকোত্তলন করে সগর্বে টিকে আছে। প্রকৃতপক্ষে রোমান ও সারাসিন সভ্যতা দুটি পরস্পর পাল্টা প্রতিদ্বন্দ্বী। ৬৪৩ খৃস্টাব্দে রোমান সভ্যতাকে

www.pathagar.com

পরাজিত করে সারাসিনরা ক্ষমতার চরম শিখরে উঠে, যখন একটু দুর্বল হয়ে পড়ে সেই দুর্বলতার সুযোগে ১৪৯২ খৃস্টাব্দে সারাসিনদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ওদেরই অনুসারীরা বর্তমান সভ্যতার পূর্ণ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্যদিকে সারাসিন সভ্যতার অনুসারী মুসলমান ও মুসলিম শক্তিগুলো পরাজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালন করে কোনমতে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছে। আদর্শে দুর্বল হয়েই ক্রুসেড-ক্লান্ত সারাসিনগণ পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল।

যদিও সারাসিন সভ্যতার পূর্ণ গৌরব যুগ কয়েক শতাব্দী মাত্র ছিল, কিন্তু তড়িৎ গতিসম্পন্ন আদর্শ বলিষ্ঠতার পরিণতি হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সাফল্যের কেন্দ্রভূমি ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানসমূহ।

ব্যবলনীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল টাইগ্রীস নদীর তীরে। সারাসিন সভ্যতার প্রারম্ভেই তাঁরা সে স্থান দখল করে নেন। পারস্য সভ্যতাকে সারাসিনরা শুধু যে পরাজিত করেছিলেন তাই নয়, গোটা সভ্যতাটাই ওদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রোমান সভ্যতার কেন্দ্রস্থল রোম নগরীর সারাসিনরা দখল না করলেও, রোম সাম্রাজ্যের ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন সারাসিন নেতৃত্বে তুর্কীরা রোমান সম্রাট দাবী না করলেও রোমের সুলতান দাবী করতেন এবং তাঁদের নামের রাজকীয় পদবীও রুমী ছিল অর্থাৎ তখন রোমানদের কোন গুরুত্বই ছিল না। ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে সারাসিন সভ্যতার শীর্ষ নেতৃস্থানীয় তুরস্কের ২য় মুহাম্মদ গ্রীসে প্রবেশ করে দানিউব নদী অতিক্রম করে যান। সুতরাং গ্রীক সভ্যতা লোপ পেতে পেতে মাত্র গ্রীক জাতির মধ্যে এসে সীমাবদ্ধ হয়। সেই গ্রীক জাতিটিও সারাসিন শাসনের করতলে এসে যায়। ১৫২৬ খৃস্টাব্দে পানিপতের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ী বাবর দিল্লী দখল করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে বর্তমান সভ্যতার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শক্তি বৃটেনের নিকট মোগল শক্তি পরাজয় বরণ করে। যদিও মোগল সাম্রাজ্যকে সারাসিন সভ্যতার অঙ্গ-শক্তি হিসাবে অভিহিত করা হয় না, তবু মোগল সাম্রাজ্য যে ইসলামী ও আরব সভ্যতারই অন্যতম প্রতীক ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। ৭১২ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম

www.pathagar.com

সিন্ধু জয় করে আরব সভ্যতার প্লাবন নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ১১৪৫ বছর পর্যন্ত মুসলিম রাজশক্তিসমূহ ভারত শাসন করে। ৩৩১ বছর মোগল শাসনের পর খৃস্টশক্তি বৃটিশরা মোগলদের হাত হতে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। তবু আর্য ও বৌদ্ধ সভ্যতার মূল কেন্দ্রস্থল ভারতকে মুসলমানগণ ১১৪৫ বছর পদানত রেখে শাসন করেছিল।

সুতরাং ব্যবিলনীয়, রোমান, গ্রীক, পারস্য ও আর্য সভ্যতা-গুলো শেষ পর্যন্ত সারাসিন বা ইসলামী সভ্যতার নিকট পদানত হয়ে জ্ঞান-ভাণ্ডারসহ আত্মবিসর্জন দিয়েছিল। সারাসিনরা জ্ঞানের জন্যে যেমন পাগল ছিল, তেমনি সর্বসভ্যতা আত্মস্থ করে জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পূর্ণও করেছিল। এক মাত্র চীনা সভ্যতার মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছাড়া, জগতের প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাই ইসলামী সভ্যতার জ্ঞান সাগরে এসে আত্মবিলয় লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানের ভূমিকা

একটি জাতির সভ্যতাকে বিশ্ব সভ্যতার সিড়ি বলা যেতে পারে। কারণ নীচের সিড়ির অবলম্বন ছাড়া উপরের সিড়িতে উঠা যায় না। আদি সভ্যতার সঞ্চিত জ্ঞান-অবদানকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সভ্যতার উত্থানের ভিত্তি রচনা হয়। সুতরাং আদি সভ্যতার চেয়ে শেষ সভ্যতার জ্ঞান সঞ্চয় সম্পদ ও তার উৎকর্ষের শিল্প দক্ষতা ও জ্ঞান-সম্পদের প্রাধান্য বেশী থাকার কথা। কিন্তু তাই বলে আদি গোড়া-পত্তনকারী জ্ঞান, উপাদান ও শিল্পমান কিছুটা অপ্রতুল হলেও, তার উদ্ভাবনী ও সৃজনী প্রতিভা স্বীকার করে নিতে হয়।

সারাসিন সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ থাকায় জ্ঞানের সর্ববিভাগ এখানে এসে পূর্ণতা লাভ করেছিল। তার চেয়েও বাস্তব ও খাঁটি সত্য কথা এই যে, তৎকালীন বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল ইসলামের মৌলিক শিক্ষানীতি। তখন ইসলামের আদর্শে মুসলমানরা এত উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে, নিজ নিজ গায়ের রক্ত ও জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেও ইসলামের প্রত্যেকটি নির্দেশ কার্যকর করার চেষ্টা করতেন। মুসলমানরা জানতেন যে, ইসলামের মূলনীতি কুরআন-হাদীসের প্রত্যেকটি নির্দেশ যতই তাঁরা আঁকড়ে ধরবেন, ততই প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিশ্বনেতৃত্ব তাঁদের হাতে এসে যাবে। পক্ষান্তরে ইসলামের মূল শিক্ষা কুরআন-হাদীস থেকে তাঁরা যতদূর সরে যাবেন, পতনটিও তাঁদের তত ত্বরান্বিত হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলছেন, "সত্তর বছর ইবাদতের চেয়ে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করা অত্যধিক মূল্যবান।"[১]

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আসমান-যমীন সৃষ্টিতে ও দিবারাত্রির পরিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্য অফুরন্ত জ্ঞানের নিদর্শন রয়েছে।"[১]

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, যা ভাল গ্রহণ কর, যা মন্দ বর্জন কর। চীনদেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন কর।"[২]

কুরআন ও হাদীসের সর্বত্র মুসলমানদের সচ্চরিত্র ও উত্তমরূপে জ্ঞানার্জনের জন্যে বারবার জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন রসূল (সঃ) বলেছেন, "বিজ্ঞান মনে রাখবে মুসলমানদেরই হারানো সম্পত্তি, যেখানেই পাও, কুড়িয়ে নাও।" এ ধরনের বহু অনুপ্রেরণা দ্বারা বারবার মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ফলে গৌরব যুগে মুসলমানরা জ্ঞানার্জনের আকুল আগ্রহে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সমস্ত সভ্যতা থেকে তাঁরা জ্ঞান আহরণ করে এনেছিলেন। সংখ্যা-বিজ্ঞানের জন্যে গ্রীক ও আর্য সভ্যতার নিকট সারাসিন সভ্যতা অনেকটা ঋণী।

খৃস্টের জন্মের ৩৩০ বছর (৩৩০—২৬০) পূর্বে ইউক্লিড জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ ও জ্যামিতির জনক। ইউক্লিডের জন্মের ৪৩ বছর (২৮৭—২১২) পরে আর্কিমিডিস জন্মগ্রহণ করেন। উভয়ই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। আর্কিমিডিস আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ তো বটেই, পদার্থবিজ্ঞানেও বিপুল সাফল্য অর্জন করেন। তিনি বহু যন্ত্রের আবিষ্কারক। আর্কিমিডিস থিসিস বিশ্ববিখ্যাত।

খৃস্টপূর্ব কমবেশী ৩ শত বছর পূর্বে গ্রীকগণ গণিতবিদ বা সংখ্যা ও পদার্থবিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু উল্লিখিত গ্রীক সংখ্যা, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানীদের অভ্যুদয়ের ১৭ শত বছর পূর্বে সিন্ধু নদের তীরে আরেকটি সভ্যতা সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে গণিতেরও মূল সূত্র আবিষ্কারে

---

১. আল কুরআন ৩ : ১৯০।

২. হাদীস।

www.pathagar.com

সক্ষম হয়। ৯টি সংখ্যা[১] দ্বারা আর্যরা অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কার সাধনা শুরু করেন। আর্যরা এই গণিত সূত্র ব্যবিলনীয়দের নিকট পেয়েছিল কিনা, বলা যায় না। খৃস্টজন্মের ৫ শত বছর পূর্ব থেকে হয়ত আর্যদের গণিত সূত্র ধরে গ্রীকরা এগিয়ে যেতে থাকেন। কারণ গ্রীসে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার স্বর্ণযুগ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হযরত জায়দ (রাঃ)-এর মারফত আরব পণ্ডিতদের হিব্রু ভাষা শিক্ষার আদেশ দেন। এর পর ৬২৮ খৃস্টাব্দে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ শুরু হয়। হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত জায়দ (রাঃ) প্রমুখ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তন্মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন মহাপণ্ডিত। সংখ্যাবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্যে তিনি মদীনার মসজিদকে কেন্দ্র করে এক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তিনিই সেখানে প্রথম প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি ছিলেন একাধারে মহাযোদ্ধা এবং সুলেখক। সারাসিন সভ্যতার উন্মেষের যে মূল বুনিয়াদ—সেই বিজ্ঞান সাধনার শুভ সূচনা করেন তিনিই।

সারাসিনরা ৭১১ খৃস্টাব্দে স্পেন দখল করে। ৭১২ খৃস্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করে ভারতে প্রবেশ করে। ৭২০ খৃস্টাব্দে স্পেনের পূর্ণ বিজয় সমাপ্ত করে আরবরা জার্মানীর সঙ্গে পরবর্তীকালে চিরবিতর্কিত ফ্রান্সের আলসাস লোরেন প্রদেশের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করে এবং তারা ফ্রান্সের ২টি প্রদেশ দখল করে নেয়। ৭৬২ খৃস্টাব্দে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরব রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ৭৮৬ খৃস্টাব্দে বাগদাদের হারুনুর-রশিদ আরব সাম্রাজ্যের খলীফা হন এবং তাঁর খিলাফতকালে সারাসিন সভ্যতা ও সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করে।

---

১. অঙ্কশাস্ত্রের আদি সংখ্যা আর্যদের আবিষ্কার কিনা—এ সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। তবে '০' শূন্যটি যে আরবদের আবিষ্কার, এদিক দিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একমত। এর উপর বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে—লেখক।

www.pathagar.com

৭১২ খৃস্টাব্দে আরব অভিযাত্রীরা ভারতে প্রবেশের পর আর্যদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যা ছিল, তা আহরণে মনোনিবেশ করেন। এইভাবে গ্রীক, রোমান ও পারস্য সভ্যতাগুলোর নিকট হতে অবিরত জ্ঞান আহরণের জন্যে তাঁরা বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

বাগদাদের খলীফা হারুনুর-রশিদের নেতৃত্বে সারাসিন সভ্যতা খাইবার পাস-এর স্থলপথেই ভারতে প্রবেশ করে। এই সভ্যতা চট্টগ্রামের নৌপথেও বাংলায় প্রবেশ করার প্রমাণ আছে। ৮০৯ খৃস্টাব্দে খলীফা হারুনুর-রশিদের মৃত্যু হয়। কিন্তু আরব সভ্যতার বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে।

একথা সত্য নয় যে, আরবরা সপ্তম শতাব্দীর শুরু থেকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, বিজ্ঞান সাধনায় মনোযোগ দিতে পারেন নি বরং অষ্টম শতাব্দী থেকে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা শুরু হয়: প্রকৃতপক্ষে ইসলাম জন্মই নিয়েছিল বিজ্ঞানের সূতিকা-গৃহে। এখানে সৈয়দ আমীর আলীর একটি উদ্ধৃতি প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হলো। তিনি বলেন, "... ... পক্ষান্তরে হযরত আলী (রাঃ) মদীনাতে অবস্থান করিয়া সাহাবাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ও তাঁহার পিতৃব্য আব্বাসের পুত্র আবদুল্লাহ্ (ইবনে আব্বাস) মদীনার মসজিদে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, হাদীস, অলংকারশাস্ত্র ও মুসলমানদিগের সাধারণ বিধি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেন এবং অপরাপর বক্তা অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন। যে শিক্ষা ও সভ্যতার জন্যে বাগদাদের খলীফাগণ এককালে জগতে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সেই শিক্ষা ও সভ্যতার বীজ এই প্রকারে মদীনার মসজিদে প্রথম রোপিত হইয়াছিল।"[১]

"জ্ঞান-গবেষণা আল্লাহ্‌র প্রশংসাস্বরূপ। জ্ঞানানুসন্ধান আল্লাহ্‌রই ইবাদত। জ্ঞানদানের শিক্ষক দানের সওয়াব অর্জনের অধিকারী এবং যিনি ইহা উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করেন, এটাও তার মূল বন্দেগী। জ্ঞানী

---

১. আরব জাতির ইতিহাস: সৈয়দ আমীর আলী।

www.pathagar.com

ব্যক্তিই পাপ-পুণ্য নির্ণয়ের প্রকৃত বিচারক। ফলে জ্ঞানই বেহেশতের পথ প্রদর্শক। মরুভূমির মধ্যে জ্ঞানই আমাদের সমাজ, বন্ধুহীন জগতে জ্ঞানই আমাদের পরম বন্ধু, বিপদে সে আমাদের রক্ষক; বন্ধু সমাজে সে আমাদের (মূল্যবান) আভরণ। জ্ঞানের সহযোগিতায় আল্লাহ্‌র খাদেম (গণ) ন্যায়ের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন (এবং) জ্ঞান ইহকালে (মানুষকে) রাজক্ষমতা দান করে ও পরকালে পরমানন্দের অধিকার দেয়।"[১]

প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বিজ্ঞানের শুভ উদ্বোধন শুরু হয়। আরবী ভাষাকে সহজপাঠ্য করার জন্যে 'জের', 'জবর', 'পেশ', 'তশদিদ', 'জজম', প্রভৃতি হযরত আলী (রাঃ)-রই আবিষ্কার। পরবর্তীকালে তাঁর আবিষ্কার বীজগণিতের সাঙ্কেতিক চিহ্নের ক্ষেত্রেও গোড়াপত্তন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ তাঁর নিজস্ব অবদান।

পৃথিবীতে একমাত্র আর্য বা ভারতীয়গণই অঙ্ক ও বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়বস্তু কবিতায় প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানে কাব্যপ্রীতি আর কোথাও প্রায় দেখা যায় না। হযরত আলী (রাঃ)-র মধ্যে বিজ্ঞানে কাব্যরসের আভাস পাওয়া যায়।

হযরত আলী (রাঃ)-র কাব্য বাণী ঃ

যুজ আল ফারার ওয়াতি তালাক
ওয়াশ্ শায়য়ান আশবাহুল বারাক
এজাসাম জালাত ওয়া আস কাহাৎ
মালাক তাল গারার ওয়াশ্ শারার।

অর্থ —"পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি বিদ্যুৎ ও বজ্র সদৃশ কোন বস্তুর সঙ্গে সংমিশ্রণ করতে পার, তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হতে পারবে।"[২]

আধুনিক বিজ্ঞানের চরম বিকাশ যুগে মহাপরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন—এই ৩ প্রকার পরমাণুর মধ্যে 'প্রোটন' পরমাণুকে সংশ্লেষণ

১. স্পিরিট অব ইসলাম ঃ সৈয়দ আমীর আলী।
২. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ঃ এম. আকবর আলী।

www.pathagar.com

করলে নাকি স্বর্ণে পরিণত করা যায়। কিন্তু এই স্বর্ণের প্রস্তুত মূল্য প্রচলিত স্বর্ণের চেয়ে এত অধিক হবে যে, এরূপ স্বর্ণ প্রস্তুত করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু লাভের প্রশ্ন বাদ দিলে, স্বর্ণও মানুষের প্রস্তুতের আয়ত্তাধীন, একথা স্বীকার করতেই হয়। হযরত আলী (রাঃ) পারদ ও অভ্রকে বিদ্যুৎ বা বজ্রের মত ভীষণ তেজস্কর অগ্নি-সংশ্লেষাত্মক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আভাষ দিচ্ছেন। আবু আলী সীনাও স্বর্ণ প্রস্তুতে হযরত আলী (রাঃ)-র মত পারদকে অপরিহার্য ধরে নিয়ে অতিশয় বিশুদ্ধ গন্ধক ও পারদ জমিয়ে কঠিন করে স্বর্ণ প্রস্তুতের পদ্ধতি দিয়েছেন। গন্ধক ও পারদকে জমিয়ে কঠিন ও বিশুদ্ধ করতে গেলে বিদ্যুৎ বা বজ্রের মত ভয়ঙ্কর অগ্নি বিক্রিয়ার কথা না বললেও অনুধাবন করা খুব দুরূহ নয়। তাহলে হযরত আলী (রাঃ) আর ইবনে সীনার মতবাদের মধ্যে খুব তফাৎ থাকে না।

৬৮৩ খৃস্টাব্দে উমাইয়া খলীফা ২য় মাবিআর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা এবং প্রথম ইয়াযিদের শিশুপুত্র খালিদ সিংহাসনারোহণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অভিভাবক রূপে প্রধান অমাত্য বৃদ্ধ মারওয়ান ইবনে হাকাম খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই মারওয়ান খালিদের পরিবর্তে তাঁর পুত্র আবদুল মালিককে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। ৬৮৫ খৃস্টাব্দে বিষপানে মারওয়ানের মৃত্যু হলে আবদুল মালিক খলীফা হন। ইয়াযিদ-পুত্র খালিদ সম্পর্কে জানা যায়—তিনি জ্যোতিষবিদ্যা, চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁকে 'আল-হাকিম' আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

গ্রীক বিজ্ঞানের প্রতি খালিদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। গ্রীকদের বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো তিনিই প্রথম অনুবাদ শুরু করেন। এই বিজ্ঞান গ্রন্থগুলোর অনুবাদের মধ্যে তাঁর কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল না; নিজস্ব গবেষণাতেও তিনি নিমগ্ন ছিলেন। স্বর্ণ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তিনি নাকি স্পর্শমনি পর্যন্ত আবিষ্কারে সফল হয়েছিলেন। এই স্পর্শমণির সাহায্যে স্বর্ণ প্রস্তুত করা যেত। এই স্থপতি বৈজ্ঞানিক ৭০৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্যে মুসলমানদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য হিসাবে (ফরয) বিধিবদ্ধ করে দিয়ে বারবার

www.pathagar.com

বিভিন্ন বাণীতে সচেতন করে তুলেছিলেন। কারণ বিজ্ঞান ছাড়া মুসলমানরা চলতে পারে না। ইসলাম ধর্মটি বৈজ্ঞানিক ধর্ম।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই সময়মত নামায আদায় মুমিনদের উপর ফরয।" শুধু নামায ফরয নয়, নামাযের সময়সীমাটুকুও ফরয। সুতরাং নামায-রোযার সময় নির্ধারণ ও অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজনেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজন। চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি জানা ইসলামের ধর্মীয় প্রয়োজন।

হযরত আলী (রাঃ) থেকেই আরব সভ্যতার বিজ্ঞান গবেষণার সূচনার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তাঁর এ জ্ঞান গ্রীকদের বা আর্যদের কাছ থেকে ধার করা ছিল না। আর্কিমিডিস, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ মহাজ্ঞানীর মত তিনি ছিলেন প্রায় সর্বতোমুখী মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী।

একদিকে রণ-দুর্মদ মহাবীর, অন্যদিকে উদ্ভাবক বিজ্ঞানী—এই দুটি গুণের সমন্বয় বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। এ গুণ হযরত আলী (রাঃ)-র মধ্যেই সমন্বিত হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত যায়দ (রাঃ) প্রমুখের দ্বারা ৬৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সারাসিন সভ্যতার বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাতের স্বর্ণযুগও বলা যায়।

৬৬১ খৃস্টাব্দে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হওয়ার পরও উমাইয়া শাসনের প্রায় সূচনা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা প্রায় অব্যাহত-ভাবেই চলছিল। ৬৮৩ খৃস্টাব্দে যদিও খলীফা আবদুল মালিক রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু সিংহাসন বঞ্চিত খলীফা খালিদ পূর্ণোদ্যমেই গ্রীকদের বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থ সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও অনুবাদ শুরু করে আরব সভ্যতাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। নিজেও বিশেষ করে রসায়ন বিজ্ঞানে গভীরভাবে গবেষণা শুরু করেন। সুতরাং উমাইয়া শাসনেও শত প্রকার রাজনৈতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও বিজ্ঞান সাধনা অব্যাহতভাবেই চলছিল।।

খলীফা আবদুল মালিক আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আরবীকে বৈজ্ঞানিক ভাষার যোগ্যতা অর্জনের

www.pathagar.com

শুভ সূচনা করেন। আব্বাসীয় শাসনামলে খৃস্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবী ভাষা বিশ্ব সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের একমাত্র অবিসম্বাদিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে, সেই আরবী ভাষা উমাইয়া যুগেই বিজ্ঞান ও অন্যান্য উন্নতমানের শাস্ত্র পরিবহন উপযোগী ভাষায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বসরার বিখ্যাত পণ্ডিত আসওয়াদ সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র খলিল ইবনে আহমদ প্রথম আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উমাইয়া যুগে যদি বিজ্ঞান পরিচর্চার উপযোগী পরিভাষা ও উন্নতমানের ব্যাকরণ কাঠামো গড়ে না উঠত, তাহলে বিজ্ঞানের পরবর্তী অবয়ব গঠনে স্বাধীন পটভূমিকার অভাব দেখা দিত।

সারাসিন সভ্যতার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব এবং তথ্য প্রায় অবলুপ্ত পর্যায়েই রয়ে গেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ গঠনের জন্যে বিশেষভাবে ইউরোপিয়ান উদ্যোগে ছিটেফোঁটা যা কিছু আমরা পেয়ে থাকি, তা সম্পূর্ণ নয়। খুলাফায়ে রাশিদীন এবং উমাইয়া শাসনের সুদীর্ঘ ১২০ বছর একদম বিজ্ঞান বর্জিত ছিল, একথা সত্য নয়। ইসলামের সর্বাঙ্গই বৈজ্ঞানিক আদর্শ দ্বারা গঠিত। ইসলাম বিশ্বাসের মৌলিকতা ও যুক্তি প্রমাণ উপাদান দ্বারা গঠিত। তাই খুলাফায়ে রাশেদীনের থেকে উমাইয়া শাসন পর্যন্ত—এই ১২০ বছর জ্ঞান-বিজ্ঞান রণ-চাঞ্চল্যের রাজ্য জয়-পরাজয়ের মধ্যে অবলুপ্ত ছিল মনে করা অযৌক্তিক। তবে একথা সত্য যে, আব্বাসীয় খিলাফতকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা শুরু হয়, এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ কোন সংগৃহীত প্রমাণপঞ্জী এখনও আমাদের হাতে নেই।

আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস্-সাফফা মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা আল-মনসুর খলীফা হিসাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃতপক্ষে খলীফা মনসুরের শাসনামল থেকেই সারাসিন সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী জয়যাত্রা নিয়মিত অভিযান শুরু হয়। খলীফা মনসুর (৭৫৪—৭৭৫)-এর রাজদরবার সর্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত। তিনিই বাগদাদ নগরীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে বাগদাদ নামক একটি বড় গ্রামে তিনি রাজধানী স্থাপন করে নাম রাখেন 'মদীনাতুস সালাম'। কিন্তু মানুষ সরকারী নাম গ্রহণ না করে 'বাগদাদ' গ্রামের নামেই নতুন রাজধানীকে

www.pathagar.com

অভিহিত করতে থাকে। প্রাচীন ব্যবিলন নগরী যেখানে অবস্থিত ছিল, বাগদাদ নগরী সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

নও-বখত নামক একজন পারসী ইঞ্জিনিয়ার রাজধানীর নক্শা তৈরী করেন এবং মাশাল্লাহ্ নামক একজন য়াহূদী বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদের পরামর্শ অনুসারে ৭৬২ খৃস্টাব্দে খলীফা আল-মনসুর বিশ্ব-বিখ্যাত বাগদাদ নগরী প্রথম প্রতিষ্ঠা শুরু করেন এবং ৭৬৬ খৃস্টাব্দে নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি স্থান হতে সংগৃহীত প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক ও শিল্পী কারিগর ৪ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৎকালীন সারাসিন সভ্যতার এবং বিশ্বের বিস্ময়কর শীর্ষ নগরীর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক নির্মাণ কার্য ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ দিরহাম। ইঞ্জিনিয়ার নও-বখত ও মাশাল্লাহ্র সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারায় বাগদাদ দুই প্রাচীর বেষ্টিত গোলাকারে নির্মিত হয়। মতান্তরে বাগদাদ ৭৬৪—৭৬৮ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় সমর-নৈপুণ্যের সঙ্গে জ্ঞানের প্রতিও যে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছিল, খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় রাজ্য জয়ের পাশাপাশি জ্ঞানার্জনের প্রতিও জোর দেওয়া হয়েছিল।

উমাইয়া শাসনের শেষ পর্যন্ত সামরিক শক্তির দিকেই অত্যধিক জোর দেওয়া হয়। আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে জোর দেওয়া হয় বেশী। এ দুটোর সমন্বয় না থাকার জন্যেই সারাসিন সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে ইসলামের উপরে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামকে শুধু আইন ও নীতিগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো মাত্র অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশিদীন ছিল পূর্ণ ইসলামী গণতন্ত্র, অন্যদিকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমল ছিল পূর্ণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, যাকে বলা যায় প্রায় পরস্পর বিরোধী আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাসের উপাধি হলো 'আস্-সাফফা'—অর্থ হলো 'রক্ত-পিপাসু'। 'যেখানেই পাও, উমাইয়াদের পাইকারীভাবে হত্যা কর'—এই ছিল তার নীতি। আল-আব্বাসের মৃত্যুর

www.pathagar.com

পর তাঁর ভ্রাতা আবু জাফর-আল-মনসুর (বিজয়ী) নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদিও খলীফা আব্বাস আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ খলীফা আল-মনসুরকেই এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "আস-সাফ্ফার পরিবর্তে বরং তিনি (মনসুর) নতুন বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পরে যে পঁয়ত্রিশজন আব্বাসীয় খলীফা শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উত্তর পুরুষ।"[১]

আল-মনসুর শুধু আব্বাসীয় রাজবংশেরই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা নন, ইসলামী সভ্যতা তথা সারাসিন সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাঁকেই প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্যুৎসাহী। তাঁর রাজসভা শুধু যে বিভিন্ন পণ্ডিত দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকত, তাই নয়, তিনি নিজেও একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন।

খলীফা আল-মনসুর ছিলেন অতিশয় উদার ও মহান। যে সব দুর্গুণ তাঁর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। অথবা নরহত্যা নয়, আব্বাসীয় বংশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যে শত্রু নির্মূল করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও নীতিগতকর্তব্য।

খলীফা মনসুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মুর বলেন, "বিপদজ্জনক ও ঘৃণার্হ ব্যক্তিদের নির্মূল করিতে মনসুর যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্ষণিকের জন্যে সে দিকটির কথা বিস্মৃত হইতে পারিলে তাঁহার সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা হইবে। তাঁহার ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে তাঁহার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে।"[২]

খলীফা মনসুর তাঁর পুত্র আল-মেহেদীকে মৃত্যুর পূর্বে যে উপদেশ প্রদান করেন, তার মধ্যেও তাঁর সত্যিকার উদ্দেশ্য ও চরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, "সৈন্য ও প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে। শাস্তিদানের ব্যাপারে মাত্রা অতিক্রম করিও না এবং যাহাদের নিকট সদুপদেশ পাও, তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায়

---

১. ইসলামের ইতিহাস ঃ টি আলী, পৃষ্ঠা ৩১৮।

২, ইসলামের ইতিহাস ঃ টি আলী, পৃষ্ঠা ৩২৯।

www.pathagar.com

রাখিও। বিজয় প্রত্যাশা করিতে হইলে কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে ক্ষমতা, সমন্বয়কারী স্নেহের বিনিময়ে আনুগত্য প্রদর্শন করিও।"

উষ্ট্র সম্পর্কিত একটি মুকদ্দমায় মদীনার কাযীর নির্দেশে তিনি মদীনার কোর্টে আসামী হিসাবে হাযির হন এবং বিচারপতি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলে তিনি তা মেনে নিয়ে ন্যায়বিচারের জন্যে কাযীকে সানন্দে পুরস্কৃত করেন।

ইতিহাসে দেখা যায়, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হিসাবে পরিচিত শাসকদের মধ্যেও বহু সদগুণ বিদ্যমান ছিল। যেমন, চেঙ্গিস খান (১১৬২-১২২৭) ইয়েলিও কুৎসাই নামে একজন চীনা পণ্ডিতকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং এই চীনা পণ্ডিত তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন। চেঙ্গিস নারী নির্যাতন ঘৃণা করতেন এবং শাসনের ক্ষেত্রে সুবিচারক ছিলেন। ইতিহাসে নৃশংস বলে পরিচিত হালাকু খান ১২৫৮ খৃস্টাব্দে বাগদাদ নগরী রক্তের সাগরে পরিণত করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলোকে দজলা বা টাইগ্রীস নদীতে ডুবিয়ে দেন। সেই হালাকু খানও ছিলেন মহাপণ্ডিত নাসিরউদ্দীন তুসীর অন্ধ সমর্থক। জনাব তুসী যা-ই বলতেন, তিনি তাই করতেন। তাঁর জ্যোতিষ বিজ্ঞানের গণনার বাইরে একটি পদক্ষেপও দিতেন না। ১২৫৯ খৃস্টাব্দে জ্যোতিষ ও জ্যোতিবিজ্ঞানী নাসিরউদ্দীন তুসীকে দিয়ে হালাকু খান সারাখার বিশ্ববিখ্যাত মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবন সুধীমণ্ডলী ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আর এক অত্যাচারী বিজয়ী তৈমুর লং স্ত্রীর নামে গজনীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। পণ্ডিত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের জন্যে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করে উৎসাহ দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

সেই তুলনায় আল-মনসুরের অত্যাচার বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে বলার মত কিছুই থাকে না। তাঁকে যেসব অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়, সেসব ছিল তাঁর রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিপীড়ন ও অত্যাচার চিরকাল পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল বা আছে। ছেলের প্রতি পিতৃ উপদেশ দেখা যায়—পাইকারী হত্যায় আনন্দ বোধ দূরে থাকুক, শাস্তিদানের ব্যাপারে মাত্রা অতিক্রমকেই তিনি ঘৃণা করতেন।

www.pathagar.com

জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম খলীফাবৃন্দ

আল মনসুর (৭৫৪—৭৭৫) কেবল বিদ্যুৎসাহী ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সাধনাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রাজকীয় কার্য থেকে একটু অবসর পেলেই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সাধনায় ডুবে যেতেন। তাঁকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ তিনিই আরবের প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানী। একথা আমাদের নয়, সুপ্রসিদ্ধ ইউ-রোপীয় ঐতিহাসিক মিঃ বোসো বলেন, আরব জ্যোতির্বিদদের মধ্যে খলীফা আল-মনসুর সর্বপ্রথম।" তাঁরই প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দ্বারা আরব বৈজ্ঞানিক ও খলীফাদের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক, রোম, আর্য প্রভৃতি বিভিন্ন মৃত সভ্যতার বিভিন্ন প্রকারের দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির ব্যাপকভাবে অনুবাদ শুরু হয়। ফলে বিজ্ঞান আজো পৃথিবীতে বেঁচে আছে।

ইসহাক আল-ফাজারী, ইয়াকুব ইবনে তারিক, আবু ইয়াহিয়া আল বাতরিক, নও-বখত, মাশাল্লাহ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক মনসুরের রাজ-দরবারের সভাসদ ছিলেন।

৭৬৭ খৃস্টাব্দে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কঙ্কের সঙ্গে ইয়াকুব ইবনে তারিকের মনসুরের দরবারে সাক্ষাৎ হয়। কঙ্কের অনুপ্রেরণায় ইয়াকুব জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হন এবং গোলক ও কারদাজার প্রভৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ৭৭৭ খৃস্টাব্দে গ্রন্থগুলো রচিত হয়।

আবু ইয়াহিয়া আল-বাতরিক গ্রীক বৈজ্ঞানিক টলেমির 'টেট্রা-বিবলস' গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তিনি তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে প্রশংসা অর্জন করেন। শুধু অঙ্কশাস্ত্রবিদ নয়,

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি পূর্বেই বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপরও অনেকগুলো বই লিখেন। কারণ তিনি নিজেও বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি 'টেট্রাবিবলস' অনুবাদ করেন এবং দ্বিতীয় ফাজারী ভারতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থ 'সিন্দহিন্দ' আরবীতে অনুবাদ করায় মুসলিম পণ্ডিত সমাজের বিদেশী বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ 'সিন্দহিন্দের চেয়ে টেট্রাবিবলসের' দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েন।

আল নও-বখত (মৃত্যু ৭৭৫ খৃস্টাব্দ) জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর নাম হলো 'কিতাবুল আহ্কাম'। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল, বাগদাদের ভিত্তি স্থাপনই এর প্রমাণ।

মাশাল্লাহ্ (মৃত্যু ৮১৫ কিংবা ৮২০ খৃস্টাব্দ) জাতিতে মিসরীয় য়াহুদী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। জাতিতে যা-ই হউন, প্রতিভার পূর্ণ মর্যাদা দানকারী উদার মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব হয়। বাগদাদের ভিত্তি স্থাপনের সময় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার আল-নও-বখতের সঙ্গে মাশাল্লাহ্ যে কারিগরি প্রকৌশল ও পরিকল্পনায় দক্ষতা প্রকাশ করেন, তাতেই তাঁর প্রতি খলীফার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কারিগরির যন্ত্র নির্মাণ বিশেষভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত যন্ত্র নির্মাণে তার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। তিনি সূর্য নক্ষত্রের উষ্ণতা নির্ণয়ক আণ্ডারনব যন্ত্র নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রের উপর নির্ভর করেই দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রবিব-বিন-ইজরা এ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করে বিখ্যাত হন। মাশাল্লাহ্ বায়ু বিজ্ঞান বিষয়ক কতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নবম শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল-ফারগানীও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন, তাঁর মূল্য নিরূপক গ্রন্থাবলী আরব বৈজ্ঞানিকদের প্রথম গ্রন্থ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং অনুবাদক জোহানেস দ্য-লুনা হিসপালেনসিস তাঁর কতগুলো গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। জিরার্ড কর্তৃকও তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে—খলীফা আল-মনসুরকে বর্তমান সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে। কারণ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং

www.pathagar.com

তৎকালীন ভয়াবহ ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান হয়েও মুসলমান, য়াহুদী, হিন্দু, খৃস্টান প্রভৃতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অতিশয় মুক্ত উদার ও ন্যায় নিরপেক্ষ মন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা থেকে, বিজ্ঞানের গ্রন্থানুবাদ, গ্রন্থ সংগ্রহ, জ্ঞান আহরণ এবং বৈজ্ঞানিকদেরকে নিশ্চিন্ত-নিবিষ্ট মনে যদি জ্ঞান বিকাশের জন্যে উৎসাহিত না করতেন, তাহলে আরব শাসক ও বৈজ্ঞানিকদের এই আদর্শের জ্বলন্ত প্রেরণা আসত না এবং মনসুরের আদর্শের প্রেরণা প্লাবনে আরব বিজ্ঞান জগতে এ ধরনের নবজাগরণও আসত না। এই মহাপ্রেরণাই নতুন পথ প্রদর্শন করে, নবজাগরণের জোয়ার-তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আরবদেরকে ক্রমশ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এমন কি পরিশেষে গ্রীক বিজ্ঞানকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়ে, বিজ্ঞান জগতের শীর্ষস্তরে উত্তোলন করতে সক্ষম হয়েছে।

খলীফা আল-মনসুর ভারতের সঙ্গে এমন সভ্যতা স্থাপনের প্রয়াসী হন যে, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কঙ্ক তাঁর নিজস্ব রাজকীয় বৈজ্ঞানিকদের সংযোগ স্থাপনপূর্বক মত ও ভাব বিনিময় করতেন। তাঁর কেন্দ্রীয় হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে একজন ভারতীয়কে প্রধান চিকিৎসক (কবিরাজ) নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম কি ছিল জানা যায় না। তবে আরবরা তাঁর প্রতি এত সশ্রদ্ধ ছিলেন যে, তাঁদের মাতৃভাষায় তাঁকে ইবনে দহন বলে ডাকতেন।

ইবনে দহনকে খলীফা মনসুরের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত করার এমনও উদ্দেশ্য হতে পারে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপর আরবদের অনুবাদের দ্বারা ঔপপত্তিক জ্ঞান লাভের পরও প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জ্ঞান এই চিকিৎসকের মারফত আরব চিকিৎসকগণ জ্ঞাত হয়ে আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা। খলীফা মনসুর ভারতে নৃপতি ও বৈজ্ঞানিকদেরকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করতেন, যাতে বিভিন্ন গ্রন্থসহ বৈজ্ঞানিকগণ বাগদাদে আগমন করেন। বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো এইভাবে করায়ত্ত করে আরব বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে অনুবাদের ব্যবস্থা করতেন। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রধানত আল-ফাজারীই অতি উৎসাহী ছিলেন। আল-ফাজারীর উদ্যমের ফলেই তখনকার ভারতের বিখ্যাত জ্যোতি-বিজ্ঞানী কঙ্ক বা বাঙ্কায়ণ ৭৭১ খৃস্টাব্দে ভারতের বিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থ 'সিন্দহিন্দ' সঙ্গে নিয়ে বাগদাদে খলীফা মনসুরের রাজসভায়

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে খলীফার রাজ-আতিথেয়তার মর্যাদা রক্ষা করেন। 'সিন্দহিন্দ' কঙ্ক অথবা ব্রহ্ম গুপ্তের সূর্য সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের খণ্ড সংস্করণ বিশেষ।

৭৬৭ খৃস্টাব্দেও বৈজ্ঞানিক কঙ্ক খলীফার বিজ্ঞান সভায় আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। তখন বৈজ্ঞানিক ইয়াকুব ইবনে তারিকের সঙ্গে বহু উৎসাজনক আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত কঙ্ক তাঁকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহুভাবে উৎসাহিত করেন। এ সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সিন্দহিন্দ ছাড়াও খলীফার আগ্রহে 'আরকণ্ড' বা 'মন্দখাদ্যক' এবং 'আর্য্য ভট্টীয়' প্রভৃতি বিজ্ঞানগ্রন্থও বাগদাদে আনয়ন এবং এ সবের আরবী অনুবাদ করা হয়। আর্য্য ভট্টীয় গ্রন্থের লেখক আর্য্যভট্ট ভারতের অনন্য বৈজ্ঞানিক। তিনি পাটনার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর্য্যভট্ট পাটনার কসুমপুরে ৪৭৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আল-বেরুনী তাঁকে কুসুমপুরের আর্য্যভট্ট বলতেন।

আবু ইসহাক আল-ফাজারীর প্রচেষ্টায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের বার-বার বাগদাদ শুভাগমন সম্ভব হয়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতি মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। অবশ্য এর পেছনে ছিল খলীফা মনসুরের সদিচ্ছা।

তিনি নিজেও তৎকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে এবং দিনপঞ্জী নিরূপণ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো ছিল তৎকালে খুবই উচ্চস্তরের। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের উচ্চতা নির্ণয় করার যন্ত্র আস্তারলব নির্মাণ করেন এবং অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতিও নির্মাণ করেন। ইতিপূর্বে আরব দিনপঞ্জী অবৈজ্ঞানিক ও এলোমেলো ছিল। তিনি সর্বপ্রথম আরবদের বর্ষ গণনা সুনিয়ন্ত্রিত করে দিনপঞ্জী প্রস্তুত করেন।

আল-ফাজারীর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় আল-ফাজারী খলীফা মনসুরের আদেশে সর্বপ্রথম ৭৭২—৭৭৩ খৃস্টাব্দে 'সিন্দহিন্দের' আরবী অনুবাদ করেন। আল-বেরুনীর মতে এর পূর্বেই ৭৭০-৭৭১ খৃস্টাব্দে 'সিন্দহিন্দের' আরবী অনুবাদ হয়ে গিয়েছিল। কোন্ বৈজ্ঞানিক এ পুস্তক অনুবাদ করেছিলেন, তা অবশ্য তিনি উল্লেখ করেন নি।

www.pathagar.com

তাতে তিনি দ্বিতীয় ফাজারীর অনুবাদের কথাই উল্লেখ করেছিলেন কিনা বলা যায় না। দ্বিতীয় ফাজারী পিতার ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তিনি ছিলেন খুবই সুদক্ষ। তাঁর সিন্দ-হিন্দের অনুবাদের উপর ভিত্তি করেই এলজাবরার জনক আল-খাওয়ারিজম তাঁর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা 'ফি জিগ' প্রণয়ন করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল যন্ত্র আস্তারলব সহ অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত উন্নতমানের যন্ত্র খলীফা মনসুরের সময় নির্মাণ করা হয়। প্রথম আস্তারলব প্রস্তুত করেন একজন মুসলমান বৈজ্ঞানিক। নাম আল-ফাজারী। দ্বিতীয় আস্তারলব যন্ত্রটি প্রস্তুত করেন একজন আরব জাতীয় য়াহূদী বৈজ্ঞানিক। নাম---মাশাল্লাহ্।

এই পুস্তক রচনায় যার তথ্য-উপাদানের উপর বেশী নির্ভর করতে হয়েছে, এখানে সেই এম. আকবর আলী সাহেবের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। তিনি বলেন, "গ্রীক বিজ্ঞানের নাম-গন্ধও যখন বিলুপ্ত প্রায়, তখনই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব ও পূর্বেকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান বিজ্ঞান জগতে বিধাতার এক আশীর্বাদই বলতে হবে। মুসলমানদের পূর্বে বিজ্ঞান ছিল অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জমান প্রায়। গ্রীকদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনেকগুলিই অধুনা লুপ্ত। আরবী অনুবাদই শুধু পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল জগতকে শিক্ষা দিচ্ছে। বস্তুত মুসলিম মনীষী এবং নৃপতিগণ, এ দিকে মনোনিবেশ না করায় জগতের বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান গবেষণা আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হতো। এপোলোনিয়াসের ঘণিক সেলিলসের গোলক, বাইজেনটাইনের ফিলোব, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত। আরবী অনুবাদগুলিই তাদের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষ্য। মোটকথা, গ্রীক বিজ্ঞানের এত উন্নতির সাক্ষ্য হিসাবে রয়েছে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অনুবাদ কার্য এবং তারই উপর নির্ভর করে ইউরোপের বর্তমান বৈজ্ঞানিক অভিযান।

মুসলমানগণ যখন পুরাতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদ এবং নব নব জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত, খৃস্টীয় ইউরোপ তখন অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইউরোপে চলছিল তখন অসভ্যতার অভিযান, বর্বরতার চরম নিদর্শন, ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।"[১]

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ঃ এম. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ১১।

www.pathagar.com

সুতরাং প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো আরবরা যে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, আরবদের সেই জরাজীর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলো থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভিযানের সূত্রপাত হয়। একথা অকাট্য সত্য। এ সত্য গায়ের জোরে প্রচলিত কল্পনা কাহিনী নয়, এ সত্য প্রমাণিত সত্য। এ প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ড্রাপার বলেন, "আরবগণ নভোমণ্ডলে যে অম্লান হস্তছাপ রাখিয়াছেন, তাহা যে কোন ব্যক্তি ভূ-মণ্ডলের নক্ষত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ কালে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"[১]

১. ইসলামের ইতিহাস : টি. আলী, পৃষ্ঠা ৬৬৭।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা

যে কোন বিষয়ের উপর বিশেষ জ্ঞানকেই 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয়। সুই, কোদাল, কুড়োল থেকে আরম্ভ করে মোটর, রেল-গাড়ী, জল জাহাজ, উড়োজাহাজ, বিদ্যুৎ, তৈলের কাজ চলে বিদ্যুৎ দিয়ে, বিদ্যুতের কাজ চলবে আণবিক শক্তি দিয়ে, এসবই মানুষের সুখ সুবিধার জন্যে অসংখ্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা।

বিজ্ঞানকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে চাই। কাগজ, পেন্সিল থেকে আরম্ভ করে নাম জানি না এমন উচ্চস্তরের ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু দ্বারা গঠিত যত যন্ত্র জগতে বিদ্যমান আছে, তাকে বলা হয় বস্তু বিজ্ঞান। বস্তু বিজ্ঞান হলো সাধারণ বিজ্ঞান। দ্বিতীয় হলো—মানসিক বিজ্ঞান। বস্তু জগত অতিশয় অসহায়। যন্ত্র যত বৃহৎ ও যত শক্তিশালী বা যত উন্নত ও স্বয়ংক্রিয়ই হউক, তার কোন নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি থাকতে পারে না। যত বড় যন্ত্রদানবই হউক, তার শক্তির তুলনায় একটি অতি ক্ষুদ্র মানুষের মানস শক্তি থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। সেই মানুষটি তার গায়ে হাত দিয়ে বোতাম না টিপলে, তার কোন কিছুই করার থাকে না। সুতরাং উচিত ছিল বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলে বিজ্ঞানীকেই 'বিজ্ঞান' বলা। এতটায় না গিয়ে আমরা বস্তুবিজ্ঞান স্বীকার করে নিলাম, যেমন মানসিক শক্তিই মূল শক্তি, তেমনি মানসিক বিজ্ঞানই মূল বিজ্ঞান।

উল্লেখ্য যে, শত সহস্র বছর পূর্ব থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্র সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব, আকার, গতিবিধি লক্ষ্য করে আসছেন এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা মানচিত্রও শত সহস্র বছর আগে থেকেই অঙ্কন করা হয়ে আছে। এ-তো প্রকৃতই মানসিক বিজ্ঞানের শক্তি-প্রতি-ক্রিয়ার প্রতিফলন। আসলে জড় বিজ্ঞানও বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানী-ই প্রকৃত বিজ্ঞান।

www.pathagar.com

'জ্ঞান কথাটাই তো অ-'জড়'। মানস ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত। বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান তো আরো উন্নত মানস শক্তিরই সহজাত। কিছুতেই বিজ্ঞান বস্তু বংশজ নয়। বস্তুর উপর বিজ্ঞানের প্রাধান্য ব্যতীত কখনও বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে বস্তুর প্রাধান্য থাকতে পারে না। সুতরাং 'বস্তু বিজ্ঞান' কথাটা সত্য নয়, বিজ্ঞানের প্রয়োজনে বস্তু ব্যবহৃত হবে মাত্র।

আইনস্টাইনের মতে শক্তি মাত্রই অখণ্ড ও অবিভাজ্য নিষ্ক্রিয় বস্তু দূরে থাকুক, প্রকাণ্ড যন্ত্র ও শক্তিও কোন প্রকার নিজস্ব বিচ্ছিন্ন শক্তি নয়, অখণ্ড মহাশক্তিরই অংশ বিশেষ।

মানুষ থেকে কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যত প্রকার জীবে আত্মা আছে, দেহে অবস্থিতি সর্বপ্রকার আত্মাই কোনদিন ঘুমায় না। মানব দেহের মস্তিষ্ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কিছুই এক সময় বিশ্রাম চায়, বিশ্রাম করে, অবশেষে সবাই ঘুমায়। মানুষ থেকে আরম্ভ করে সর্বজীবের সর্ব আত্মাই কোন সময় ঘুমায় না। সুতরাং আত্মার প্রতিনিধি মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া মানস শক্তি। মানস শক্তির কৃত উন্নত প্রক্রিয়ার নামই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কোন প্রকার বস্তুর প্রতিক্রিয়া নয়, মানস শক্তির প্রতিক্রিয়ার নাম বিজ্ঞান। মানুষ বিজ্ঞান তৈয়ার করে, বিজ্ঞান মানুষ তৈয়ারের ক্ষমতাই রাখে না। মানুষের ইচ্ছায় পুতুল ব্যবহৃত হয়, এমনি মানুষের, বিজ্ঞানও ব্যবহৃত হয়। কাজেই প্রাধান্য থাকতে হবে মানুষের, বিজ্ঞানের নয়। সুতরাং বিজ্ঞানকে কল্যাণময় করতে হলে মানস সংগঠন অপরিহার্য অর্থাৎ আগে মানুষ গঠন করে পরে বিশ্ব গঠন করাই মৌলিক বিশ্ব কল্যাণ। মানুষ গঠন করতে গেলেই আত্মাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

আমরা বিশ্ব ইতিহাসের সপ্তম শতাব্দীতে ফিরে যেতে চাই। সপ্তম শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইসলামী গণতন্ত্র মানুষকে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পরিশুদ্ধ করেছিল। মানুষকে প্রথমেই মানুষ হিসাবে তৈয়ার করেছিল। মৌলিক প্রয়োজনের চাহিদা সমভাবে পূরণ করে মানুষকে ভবিষ্যৎ জীবিকার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। এক কথায় ইসলামী সভ্যতার এই ৩০ বছরের মধ্যে পরিপূর্ণ সুখী হওয়ার জন্যে নিখুঁত সমাধান মানব জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল।

এই খুলাফায়ে রাশিদীনই সারাসিন সভ্যতার মূল আত্মা বিশেষ। তাঁরা প্রথমেই মানুষ তৈয়ার করেন, পরে সভ্যতা সৃষ্টি করেন।

www.pathagar.com

আরবদের কাছ থেকে হাতেখড়ি নিয়ে বিজ্ঞানে যদি আজ চন্দ্র পর্যন্ত অবতরণে অগ্রসর হতে পারে, তাহলে আর একবার এই বিজ্ঞান ইসলামী আদর্শের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কল্যাণময় হয়ে উঠতে আপত্তি কোথায়? চরিত্র গঠন, অর্থনীতির নিখুঁত মৌলিক সমাধান, আইনানুগ হওয়ার পদ্ধতি, বিজিত দেশসমূহের প্রতি শোষণহীন মানবিক আচরণ প্রভৃতি মূল নীতিমালা যদি আজকের আধুনিক বিজ্ঞান, আরব বিজ্ঞানের মতই, মূল অবদান হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে মানব সভ্যতা অনায়াসেই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞান ও মুসলিম সভ্যতা

কেউ যদি কোন ভাল কথা বলে এবং তার মধ্যে শক্তিশালী সত্য নিহিত থাকে, তাহলে তা তখনই কর্ণপাত বা গ্রহণ না করলেও তার পরবর্তী বিজ্ঞানসম্মত প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট হয় না।

আমাদের একটা প্রচলিত কথা আছে, আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিয়ে এ যুগে এতদূর অগ্রসর হয়ে আছি যে, আর পিছন দিকে ফিরে যেতে পারি না। মনে হয় যেন জেলখানা থেকে একজন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী বেরিয়ে এসে যেমন পুনরায় জেলখানায় ফিরে যেতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করে, তেমনি এক শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত মানুষও মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ মনে করেন। তাদের মতে বিজ্ঞান বলতে মধ্যযুগে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু ধর্মীয় কুসংস্কার।

'সমাজ বিজ্ঞান' নামে একটি পাঠ্য বই ১৯৮২ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য মনোনীত। বাংলাদেশের যত মেধাবী ছাত্র ১৯৮৩ খৃস্টাব্দের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার জন্য, এই বইটি ওদের অন্যতম মূল্যবান পাঠ্য বই। বাংলার ভবিষ্যৎ মেধাশক্তির শিশুমনে কোন মারাত্মক অজ্ঞতা যদি দাগ কেটে যায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহেই জাতীয় ক্ষতি।

সেজন্য উক্ত পাঠ্য পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের ৮৭ পৃষ্ঠার শেষ দিকের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। বইটির মন্তব্য হলো : মধ্যযুগে বিজ্ঞানের সাধনা নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ যুগটিকে অনেকে তাই 'অন্ধকার যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৪০০ থেকে ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ।"

১৪৯২ খৃস্টাব্দে সেনাপতি ফার্ডিনাণ্ডের হাতে স্পেনের মূরদের পতনের মধ্য দিয়েই সারাসিন সভ্যতার পতন ধরে নেওয়া গেলে, চৌদ্দশ থেকে

www.pathagar.com

এর পরবর্তী উত্তেজনামূলক শতাব্দীটি হলো ৯২২ বছরের অভ্যুত্থান কৃত দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সভ্যতার পতন এবং ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতার উত্থানমূলক রেনেসাঁ বা নবজাগরণ যুগ।

ঢাকা বোর্ডের 'সমাজ বিজ্ঞান' বই-এর বোর্ড ১৪ শত শতাব্দীর পূর্ব-বর্তী যুগকে যে বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। এতে সারাসিন সভ্যতাটাকেই আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়েছে। শীর্ষ স্তরের উচ্চশিক্ষিত লোক নিয়ে গঠিত একটি উন্নত বোর্ড যদি একটি (ইসলামী) সভ্যতারই খবর না রাখেন, তাহলে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে!

প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন দিন একক ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, তেমনি বিজ্ঞানও কোন দিন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে এককভাবে গড়ে উঠে না। পিছনের সভ্যতাকে ভিত্তি করে যেমন নতুন সভ্যতা গড়ে উঠে, বিজ্ঞানেও তেমনি পিছনের বিজ্ঞান সূত্র ও যুগকে কেন্দ্র করে ক্রমবিকাশের ভিত্তিতে নতুন সভ্যতার নতুন বিজ্ঞান যুগ গড়ে উঠে। কাজেই বিজ্ঞানের পিছনের ভিত্তি যুগকে অন্ধকার যুগ বলা যায় না। এজন্যে সপ্তম থেকে ১৪ শত শতাব্দীর পূর্ব যুগকে অন্ধকার যুগ বলা যায় না, আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি যুগ বলা যায়। এ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভের জন্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ১৪ শত শতাব্দী থেকে ১৬ শত শতাব্দীর সময়কে বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ কথাটি ত্রুটিপূর্ণ। বিজ্ঞানের জাগরণ যুগ শুরু হয়েছে একাদশ শতাব্দীর কিছু পূর্ব থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়সীমা নিয়ে। ইউরোপে বিজ্ঞানের যে নব জাগরণ যুগ শুরু হয়েছিল, তা বিকাশ লাভ করে বিংশ শতাব্দীর আনবিক যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে—এ কথাটাই শুদ্ধ সত্য।

বিজ্ঞানের জন্মের কথা প্রসঙ্গে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই: ৩০০০—২০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দের সিন্ধু সভ্যতা ২৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে আর্যরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ গবেষণা ও সাধনা শুরু করে।

অন্যদিকে প্রায় একই সময় সেমেটিক সভ্যতার একটা অংশ বিশেষ-ভাবে তাদের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর বিস্তৃত উর্বর অঞ্চলে ৩৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে এসে বসতি স্থাপন করে। এর ১৪০০ বছর পরে হয়ত তাদেরই কেউ হাম্মুরাবি নামক আমুরিয়া দলপতি ইউফ্রেটিস নদী এলাকায়

www.pathagar.com

হয়ত ২১০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করে, এর রাজধানীর নাম দেন ব্যবিলন। ব্যবিলনীয়রা 'কুইনি ফরম' নামে এক ধরনের মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

ঐতিহাসিক মায়ার্সের মতে খৃস্টজন্মের তিন হাজার বছর পূর্ব থেকেই লিখন পদ্ধতির জন্যে এই 'কুইনি ফরম' যন্ত্র প্রচলিত ছিল। তাহলে ব্যবিলন সভ্যতা খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্ব থেকেই চালু ছিল।

ব্যবিলনীয়রা জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, চন্দ্র-সূর্য সম্পর্কে ভবিষৎ-বাণী, পঞ্জিকা প্রস্তুত করে বছরকে বার মাসে ভাগ করে, মাসকে দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড প্রভৃতিতে বিভক্ত করেন। গণিতশাস্ত্রে তাদের আবিষ্কৃত দশমিক গণনা প্রণালী আজো প্রচলিত আছে। তারা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন এবং শক্তি পরিমাপ প্রথা আবিষ্কার করেন। আরো এমন আছে যে, খৃস্ট জন্মের ৫৭০০ বছর পূর্বেও ব্যবিলনীয়রা অঙ্কশাস্ত্রের উপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন।[১]

সেমেটিক সভ্যতা হতে বহির্গত মিসরীয় ও ব্যবিলনীয় সভ্যতা এবং ভারতের আর্য সভ্যতা প্রায় সমসাময়িক। এমন কি পরবর্তী সেমিটিক শাখা এসিরীয় সভ্যতাও ব্যবিলনীয় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর্য এবং ব্যবিলনীয় সভ্যতা সেমেটিক সভ্যতা থেকে জ্ঞান নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে।

এর পরবর্তী পর্যায়েই বিজ্ঞানের উদ্ভাবক জাতি গ্রীক। খৃস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রীক জাতি অলিম্পিক খেলা উদ্ভাবন করে। খৃস্টপূর্ব ৩৫৬—৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের দিগ্বিজয় সুদূর ভারত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় অর্থাৎ এর পূর্ব ও পরবর্তী শতাব্দী গ্রীক সভ্যতা অভ্যুত্থানের স্বর্ণ যুগ।

আমরা স্বাভাবিকভাবেই মনে করতে পারি যে, গ্রীকদের পূর্ববর্তী ব্যবিলনীয় মিসরীয় (খৃস্টপূর্বাব্দ ৪০০০ বছর) এবং আর্য সভ্যতার নিকট গ্রীকরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে।

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : এম. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ৪।

www.pathagar.com

অতঃপর গ্রীক ও আর্য সভ্যতা বিলুপ্ত প্রায়। অন্যান্য সভ্যতার বিজ্ঞানের লেশটুকুও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সারা বিশ্ব অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইতিমধ্যে বহু প্রাচীন সেমিটিক জন্মভূমিতে আরব সভ্যতা সগর্বে জেগে উঠল। সপ্তম শতাব্দীতে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে বিব্রত থাকলেও অষ্টম শতাব্দীতে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করল। কিন্তু বিজ্ঞান পাবে কোথায়! বিজ্ঞান পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। গ্রীক পণ্ডিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো কোথায় আছে, কে জানে। জানলেও এই দুর্বোধ্য বিষয়াদি বুঝবার মত কোন লোকও নেই, আগ্রহও নেই। মুসলিম বৈজ্ঞানিকরা ছুটে গেলেন গ্রীসে। তাঁরা গ্রামে, শহরে, আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে জ্ঞানগ্রন্থগুলো, বহু টাকা ব্যয় করে, উঁই, ইঁদুর ও তেলা পোকার কবল থেকে' চামড়ার কাগজে লেখা জরাজীর্ণ গ্রন্থ উদ্ধার করে আরবীতে অনুবাদ করতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, একইভাবে তাঁরা আর্যদের জ্ঞান গ্রন্থগুলো আরবীতে অনুবাদ শুরু করেন।

এই ভাবে আরবরা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই—৫ শত বছর আর্য-গ্রীক বিজ্ঞান থেকে সাধনা গবেষণা করে নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবন দ্বারা বিজ্ঞানকে গ্রীকদেরও বহু উর্ধ্বস্তরের উন্নত মানে গড়ে তোললেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে আরবরা খৃস্টান সভ্যতার নিকট হেরে গেল। হেরে গেলেও তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখানে ওখানে কিছু কিছু রয়ে গেল। কিন্তু তাদের বিজ্ঞান ইতিপূর্বেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকে বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছে। সেই গ্রীকদের অবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কীটদ্রষ্ট আরবী গ্রন্থগুলো বুঝবার লোক নেই।

তখন ইউরোপ জেগে উঠছে। তারা সেই মুসলিম উত্থান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে পাগল। পাবে কোথায়? গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো মুসলমানেরা শত শত বছর পূর্বেই নিয়ে গিয়েছিল। এখন তার পাত্তাও পাওয়া যাবে না। তখন আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরবী গ্রন্থগুলো হিব্রু আর ল্যাটিন ভাষায় তাঁরা অনুবাদ শুরু করেন। আরবের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে এখানে-ওখানে এবং দোকানীর পুটলী বাঁধার কবল থেকে আরব বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো পুনরুদ্ধারের অভিযান দিন-রাত চালিয়ে নেন।

www.pathagar.com

এখানে একজন পণ্ডিত ব্যক্তির মত উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন……"সাম্প্রতিকতম গবেষণায় জানা গেছে যে, (ইউরোপীয়দের) অনুবাদের কাজ শুরু হয় ১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এবং ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত। মাঝখানে ১১ শত শতাব্দীতে আরবী থেকে হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় যে অনুবাদ হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের অনূদিত বিষয়ের মধ্যে ইসলামিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে।"[১]

তাহলে ঢাকা বোর্ডের 'সমাজ বিজ্ঞান' বই-এ উল্লিখিত '১৪০০ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী যুগকে অন্ধকার যুগ' কথাটি সত্য নয়। বরং মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিকট অন্ধকার ইউরোপের আলো প্রার্থনার যুগ বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ১৪শত শতাব্দীটি ইউরোপের বিজ্ঞানে নব জাগরণের যুগ নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ইসলামী সভ্যতার বুনিয়াদের উপরে ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা গড়ে তোলার রাজনৈতিক (বিজ্ঞান নয়) নবজাগরণের যুগ বলা যেতে পারে। ইউরোপের বিজ্ঞানের নব জাগরণের যুগ শুরু হয় ১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ১৩শত শতাব্দী পর্যন্ত, ১৪০০ শতাব্দী নয়।

যে সব কেন্দ্র থেকে ইউরোপ আরবী ভাষা থেকে আরবদের বিজ্ঞান ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করে সংগ্রহ করেছিল, সে সব স্থানের নাম স্পেন, সিসিলি, দক্ষিণ ইটালী ও ফ্রান্সের আলমাস লোরেন প্রদেশ। স্পেনের টলেডো, তারাজোনা, পাল প্লোনা, বারসোলোনা, বুটোনা এবং সিসিলির পোলানো—এসব স্থান অনুবাদ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এর টলেডোর ট্রান্স্লেসন স্কুল অনুবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিসিলির হোয়েনস্টাফেন রাজবংশের দ্বিতীয় কিং রাজার এবং দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে ধর্মান্তরিত সুলতান বলা হতো। কারণ তাঁদের

---

১. ভারত বিচিত্রা : অধ্যাপক ডঃ এম. এস. খান। নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সংস্কৃতি সভ্যতার বিশেষ করে ভারতে ইসলামের অবদান শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার।

www.pathagar.com

মারফতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ফ্রান্সের লোরেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে বিস্তার লাভ করত। লীজ, সবুজ এবং কলোন ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্পেন থেকে মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে সম্প্রসারিত হয়।

এমন এক সময় ছিল, যখন বলা হতো যে, মুসলমান ইসলাম সম্বন্ধে জানে না, জানে ইউরোপ। এখনও এ কথা বলা চলে যে, যদিও ইউরোপের খৃস্ট শক্তি ইসলামের সর্বাপেক্ষা বেশী দুশমনী করেছে, তবু ইসলামের সঠিক গুরুত্ব আমাদের চেয়ে তারাই বেশী দিয়ে থাকে। শুধু ঢাকা বোর্ড নয়, বাংলাদেশে এমন বহু উচ্চশিক্ষিত লোক আছেন, যাঁরা মধ্যযুগকে অত্যন্ত বিরূপ ও তাচ্ছিল্য চক্ষে দেখেন। এ যুগ নিয়ে তাঁরা অতিশয় আতঙ্ক বোধ করেন। অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ।

সত্য কথা বলতে কি, ইউরোপ যদি আধুনিক সভ্যতা গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্যে অনুবাদের মারফত মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সজীব না রাখত, তাহলে আধুনিক সভ্যতার দশা যা-ই হউক – মুসলিম বিজ্ঞানের অস্তিত্বই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেত। এখনও মুসলিম বৈজ্ঞানিদের পাণ্ডুলিপিগুলো ইউরোপের বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্রে বেশী সংখ্যায় সংরক্ষিত আছে। তুলনামূলকভাবে তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি স্থানে খুবই কম পরিমাণে মুসলিম বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত পাওয়া যাবে।

যা হোক, মুসলমানদের প্রতি জাত ক্রোধ বশত ইউরোপীয়রা মুসমানদের ঋণ স্বীকারে বদ্ধমূল ছিল। তাছাড়া যে কোন মানুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করলে যেমন তার পূর্ববর্তী স্বরূপ চেহারার অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যায়, তেমনি গোটা ইসলামী বিজ্ঞানকেই ইউরোপের নিজস্ব বিজ্ঞান রূপে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়। এটা বোঝার কোন পথ ও উপায় রাখা হয় না যে, এই মৌলিক বিজ্ঞান জগতটাই খৃস্টানদের নয়, মুসলমানদের।

ইউরোপ সেই বিজ্ঞানের মান উন্নত ও তার বিকাশ ব্যাপকতর করেছে। কিন্তু মূল সূত্রের মালিক তাঁরা নন, মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ মুসলমানরা যে গ্রীকদের কাছ থেকে বিজ্ঞান গ্রহণ করেছিলেন, একথা তখনও, এখনও—সর্বকাল ব্যাপী বহু বিঘোষিত। অথচ গ্রীকদের কাছ থেকে তাঁরা যা পেয়েছিলেন, সেসব পুস্তকের সংখ্যা কিছু সংখ্যক

www.pathagar.com

মাত্র। কিন্তু এসব পুস্তক অবলম্বন করে মুসলমানেরা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে মেতে উঠেন। শত শত বৈজ্ঞানিক গড়ে উঠেছিলেন এবং পুস্তকের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, গ্রীক আর্য সূত্র অবলম্বন করে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ নব নব আবিষ্কার-উদ্ভাবন দিয়ে বিজ্ঞানকে অতি উচ্চস্তরে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলমানেরা গ্রীক বিজ্ঞানের উপর ৫ শত বছর সাধনা করে যা ফল হয়েছিল, তা দান করেছিল ইউরোপকে। তার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের এরূপ উৎকর্ষ-উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি মুসলমানেরা ইউনানী তথা গ্রীক বিজ্ঞানে মোটেই হস্তক্ষেপ না করতেন বা তাদের পক্ষে তা সম্ভব না হতো, তাহলে খৃস্টান ইউরোপকে আরো ৫ শত বছর পিছিয়ে গিয়ে গ্রীক বিজ্ঞানের গোড়া থেকে সাধনা শুরু করতে হতো।

মুসলমানেরা যখন গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো আরবীতে অনুবাদ করতে শুরু করে, তখন গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের নামগুলো এমন বিরূত করেন নাই, যাতে নামের দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিককে কি গ্রীকের বোঝায়, না আরবের? বইটি কি টলেমির না যে কোন একজন আরব বৈজ্ঞানিকের বিদঘুটে নাম। সূত্রটি আর্কিমিডিসেরও হতে পারে, আরব বৈজ্ঞানিক আল কারমিরও হতে পারে।

আর্কিমিডিস, টলেমি, ইউক্লিড, এরিস্টটল প্রমুখ সকল বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের নাম অক্ষরে অক্ষরে মুসলিম বৈজ্ঞানিকরা সশ্রদ্ধভাবে অক্ষত রেখেছিলেন। কোন প্রকার বিকৃত করা হয়নি। তাঁদের বিজ্ঞান গ্রন্থের বিষয়বস্তুও যার যার যে যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। পরের আবিষ্কার উদ্ভাবক নিজের নামে বা আরবদের বিজ্ঞান ইউরোপীয়করণের মতো কোন বেনামী করার অনুরূপ কোন প্রকার বদ্‌বুদ্ধি তাদের মাথায় ছিল না।

বস্তুত গ্রীক এবং মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য ছিল, সত্য থেকে যেন তারা দূরে সরে না যায়। মুসলিম শাসকগণও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের রাখতেন রাজনীতির উর্ধ্বে। মুসলমানদের পতনের পূর্ব শতকে স্পেন যখন বেশ কয়েকটি মুসলিম খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পরস্পর আত্মঘাতী হানাহানিতে মেতে উঠেছিল, তখনও বিজ্ঞান সাধনা ও বৈজ্ঞানিকদেরকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা হয়েছিল। বরং প্রত্যেক

www.pathagar.com

রাজ্যের মুসলিম নৃপতিগণ নিজ নিজ রাজ্যে বিজ্ঞান গবেষণাকে প্রতি-যোগিতামূলক কর্তব্য হিসাবে মনে করতেন।

পক্ষান্তরে আরব বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদের সময় বৈজ্ঞানিকদের নাম এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে, অনেক সময় বৈজ্ঞানিকের নামটাই ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করে বৈজ্ঞানিকের অস্তিত্বই খতম করে দেওয়া হয়েছে। নামের এরূপ গোলমাল করা হয় সাধারণভাবে মুসলমানদের জাঁদরেল বৈজ্ঞানিকদের নামের উপরই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পৌনে দুই শতেরও উপরে বিজ্ঞান বই লিখেছেন—এমন বৈজ্ঞানিকও আছেন। ফলে এরূপ নামের ধূম্রজালে লেখক সম্পাদক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ওঁদের বহু মূল্যবান বিজ্ঞান গ্রন্থ ইউরোপিয়ানদের দ্বারা ইচ্ছামত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নামে বেনামী করা হয়।

এইভাবে এক কালে খৃস্টান ইউরোপ তথা পৃথিবীর ভাগ্য বিধাতা মুসলমানদের পরাজয়, পতন ও হীনবলের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের কোণঠাসা করে মুসলিম সভ্যতাকে বিশ্ব জনমনের স্মৃতিপট থেকে চিরতরে মুছে ফেলার পাশ্চাত্য উদ্দেশ্যের জের হিসাবেই এখনও মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। যে ব্যক্তি নিজকে গুরুত্ব না দেয়, তার পক্ষে নিজ জাতি ও ধর্মকে নিয়ে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করা খুব বিচিত্র নয়।

আমাদের যুক্তি প্রমাণভিত্তিক করার জন্য যেসব বিখ্যাত মুসলমান বৈজ্ঞানিকের নাম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের প্রকৃত নাম ও বিকৃত নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

প্রকৃত নাম	ইউরোপে বিকৃত নাম
১. আল-বাত্তানী	১. আল বাতেনিয়াস, আল বাতেজনিয়াস, রেথেন, বোয়েলিয়েন প্রভৃতি
২. ইউসুফ আল-ঘুরী	২. জোসেফ টি প্রিজড
৩. আর-রাযী	৩. রাজম
৪ আল খাসিব	৪. আল-বুবাথের
৫. আল-কায়াবিসি	৫. আল-ক্যাবিটিয়াস

www.pathagar.com

প্রকৃত নাম	ইউরোপে বিকৃত নাম
৬. আল-খাওয়ারিজমী	৬. আল গরিটাস, আল-গরিজম, আল-গরিদম
৭. আবু আলি ইবনে সিনা	৭, ইভান সিনা (হিব্রুতে), এভি-সিনা (ল্যাটিনে)
৮. ইবনুল হায়সাম	৮. আল হাজেন
৯. আল-যারকালী	৯. মারজাকেল
১০. ইবনে আবির রিজাল	১০, আল-বোহাজেন (ল্যাটিন), আল বোরাছেন, আবেন রাজেল প্রভৃতি
১১. জাবির ইবনে হাইয়ান	১১. জিবার
১২. ইবনে বাজ্জা	১২. এটেন পেস, এডেমপেস
১৩. ইবন রুশ্দ	১৩. এভেরোন
১৪. আল-বিতরোজী	১৪. আল পিট্রাজিয়ান
১৫. আবু বকর ইবন তোফায়েল	১৫. আবু বাথর
১৬. আবুল মাশার	১৬. আলবু মাছের
১৭. আল-কিন্দি	১৭. আল-কিন্দাস
১৮. আল-ফারগানী	১৮. আল-ফাগানেস
১৯. হোসায়েন ইব্‌ন ইসহাক	১৯. জোহান্নিটিউস ওনাম, হোসাই নুজ

আরো বহু মুসলিম বৈজ্ঞানিকের বিকৃত নাম ইউরোপে চালু আছে। ওঁদের চেনাই যায় না যে, ওঁরা প্রকৃতই মুসলমান বৈজ্ঞানিক। আগাগোড়াই এই সভ্যতাটিকে চাপা দিয়ে অন্ধকার যুগে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে পূর্ণ কৃতিত্বের মালিকানা দখল করাই বড় কথা ছিল না, ইসলামী সভ্যতা পৃথিবীতে আর যেন কোন দিন মাথা তুলতে না পারে, এটাই ছিল প্রতিপক্ষের মূল কথা।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানে মুসলিম খলীফাদের অবদান

খলীফা আল-মনসুর সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং এ-ও আলোচনা করা হয়েছে যে, রাজকার্যে ব্যাপৃত থেকেও বিজ্ঞান চর্চার ঘটনা ইসলামী সভ্যতা ছাড়া জগতের ইতিহাসে বিস্ময়কর ও বিরল। এর প্রধান কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে রাজকার্য ছাড়াও আত্মমর্যাদার জন্যে সকল সময় বৈজ্ঞানিকদের সাথে উঠাবসা করা সম্ভব ছিল না।

পূর্বেকার রাজ আভিজাত্যবোধ ছিল এখনকার তুলনায় আরো বহু গুণে বেশী। বৈজ্ঞানিকদের সাথে সাধারণ কাতারে এসে জ্ঞান সাধনা করা তাদের পক্ষে তাই সহজে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিলেন মুসলিম সুলতান ও খলীফাগণ। তাঁরা বিজ্ঞানীদের সাথে মেলামেশা করতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা নিজেরাও বিজ্ঞান চর্চা করতেন।

ইসলামের সামাজিক সাম্যবাদই এর মৌলিক কারণ, জামা'আতের নামাযে আসতে একটু দেরী হলে সুলতানকে একটু আগে আসা গোলামের পিছনে কাতারে দাঁড়াতে হতো।

ইসলাম পৃথিবীতে এমন একটি ধর্মীয় মতবাদের জন্ম দিয়েছে, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটেছে।

নিজেরা বিজ্ঞান চর্চা করা ছাড়াও মুসলিম নৃপতিবৃন্দ অজস্র অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞান বিকাশের জন্যে বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

খলীফা মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-মেহেদী (৭৭৫—৭৮৫) সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত তাঁরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি

www.pathagar.com

একান্ত আগ্রহ ছিল এবং জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি আগ্রহ সহকারে তাঁর রাজসভায় সম্মান ও স্থান দিতেন। কিন্তু মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জীবনে তিনি এমন একটি কাজ করে গিয়েছিলেন, যা মানব জাতির সেরা কল্যাণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মের দুইশত বছর পূর্বে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পারস্যে মাজদাক নামে একজন নাস্তিকতাবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি নারী-পুরুষের অবাধ যৌন মিলনের সাম্যবাদ প্রচার করেন। সম্রাট নওশেরওয়াঁর সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে এই মতবাদ দমন লাভ করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই মাজদাক মতবাদই ইরান, খুরাসান প্রভৃতি স্থানে জিন্দিকবাদ নামে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং মানিকিয়ান ধর্মমতের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে পাইকারী ব্যভিচারের কদর্য রূপ ধারণ করে, পশুর অনুরূপ নারী-পুরুষের অবাধ যৌন মিলনই এই মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য।

জিন্দিকরা সবাই লাল কাপড় পরিধান করত। মাজদাকের ৪ শত বছর পর সেই এলাকাতেই অনুরূপ মতেরই পূর্ণ অভ্যুত্থানে খুরাসান, ইরাক এবং পারস্যে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। জিন্দিকরা যৌন উচ্ছৃঙ্খলা দ্বারা পারিবারিক ও সমাজ বন্ধনকে ধ্বংস করে, অসহায় শাসন কর্তৃত্ব উৎখাত করে, নারী-পুরুষের অবাধ যৌন মিলনের নারকীয় রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিল। জিন্দিকরা প্রয়োজনানুযায়ী উদ্দেশ্য গোপন করে বাকচাতুর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করত এবং সামাজিক শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটনই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত শুধু যৌন নৈরাজ্যই নয়। এই জিন্দিকরা রাজনৈতিক নৈরাজ্যসহ সমাজ-সভ্যতার বিরুদ্ধে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

খলীফা মেহেদী কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করেন। জিন্দিক মতবাদ বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং জিন্দিকদের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

www.pathagar.com

খলীফা মেহেদির মৃত্যুকালে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল হাদীকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যান এবং হাদীর অবর্তমানে কনিষ্ঠ পুত্র হারুনুর-রশিদকে খলীফা হিসাবে মনোনয়ন দান করে যান। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই হাদীর প্রতি খলীফা হিসাবে হারুনুর-রশিদ আনুগত্য প্রকাশ করেন। খলীফা হাদী যদিও উদার ও ন্যায়বাদী ছিলেন, কিন্তু নিজের বেলায় ন্যায়বিচার ভুলে গিয়ে তাঁর অবর্তমানে পিতার মনোনীত হারুনুর-রশিদের খলীফা মনোনয়ন বাতিল করে, তাঁর ছেলে জাফরকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন করেন। কিন্তু তাঁর রাজসভার অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই মনোনয়নের বিরোধিতা করেন। যা হোক খলীফা হাদী দেড় বছর রাজ্য শাসন করে অকালমৃত্যু বরণ করার দরুন এই প্রশ্নটি সমস্যার আকার ধারণ করতে পারেনি। হারুনুর-রশিদ নির্ঝঞ্ঝাটে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জাফর নির্বিবাদে চাচার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন।

হারুনুর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯) ২৫ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শাসনে অত্যন্ত উদার, ন্যায় বিচারক ও জনকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ নরপতি ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সাহসী সুদক্ষ রণকুশলী ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানকে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তরে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে গবেষণাগার ও মানমন্দির নির্মাণ ছাড়াও তিনি তাঁর রাজসভায় বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতকে স্থান দিতেন।

শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন মহান ও উদার। শত্রুকেও তিনি বারবার ক্ষমা করেছেন। তাঁর মহিয়সী মাতা খাইজুরানের রাজ্য শাসনে হস্তক্ষেপ বড় ভাই খলীফা হাদী সহ্য করতেন না। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েই খলীফা হারুনুর-রশিদ তাঁকে যথাযথ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারিণী করেন।

প্রথম রাজনীতি প্রজ্ঞার সঙ্গে অসম সাহসী ক্ষিপ্ত রণকুশলতার সমন্বয় গুণে খলীফা হারুনুর-রশিদের হাতে পশ্চিমে ইউরোপের বাইজানটাইন বা গ্রীক রাজ্য থেকে আরম্ভ করে প্রাচ্যের আফগানিস্তান ও হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এর ফলে একদিকে গ্রীক সভ্যতা থেকে এবং অন্যদিকে আর্য সভ্যতা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ ও জ্ঞান আহরণের পথ সুগম হয়।

www.pathagar.com

আরব শাসকদের মধ্যে খলীফা হারুনুর-রশিদই সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এজন্যে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বহু মূল্যবান উপঢৌকন বিনিময় হয়। তিনি ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

তখনকার আরব সভ্যতা যে যন্ত্রবিজ্ঞানে কত উন্নত ছিল, একটি নযীর থেকেই তা অনুধাবন করা যাবে।

খলীফা হারুনুর-রশিদ তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ফরাসী সম্রাট শার্লিমেনের নিকট একটি অদ্ভুত ঘড়ি উপঢৌকন দেন।

৭৯৯ খৃস্টাব্দে খলীফা হারুনুর-রশিদ ফরাসী সম্রাট শার্লিমেনকে যে ঘড়িটি উপহার দেন, ঘড়িটির ডায়ালে ১২ ঘন্টার প্রতীক হিসাবে ১২টি ছোট দরজা ছিল। প্রত্যেক ঘন্টায় সেই ঘন্টার প্রতীক দরজাটি খুলে যেত। ঘন্টার পরিমাণ অনুযায়ী কয়েকটি ছোট গুলী একটি কাঁসার পাত্রের উপর পড়ে ঘন্টার পরিমাণ অনুযায়ী এক থেকে কয়েকটি শব্দ করত। বেলা বারটার সময় ১২টি ঘন্টা পড়ার পর বারজন ছোট ছোট ঘোড় সওয়ার যোদ্ধা একসঙ্গে বেরিয়ে এসে ডায়ালের চার-দিকে প্যারেড শুরু করে দিত এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিত। এই একটি মাত্র ঘড়িই তখন সমগ্র ইউরোপকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে তোলে।

খলীফা হারুনুর-রশিদ সম্বন্ধে অধ্যাপক হিট্টি বলেন, বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচ্যের হারুনুর-রশিদ এবং পাশ্চাত্যের শার্লিমেনকে লইয়া নবম শতাব্দী পরিক্রমা সূচনা করে। এই দুইজনের মধ্যে আবার হারুন নিঃসন্দেহে অধিক শক্তিশালী এবং উন্নত কৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

অধ্যাপক হিট্টি যদিও গুণাগুণের দিক দিয়ে হারুনের সাথে শার্লিমেনকে তুলনা করেছেন বটে, কিন্তু বিশাল আরব সাম্রাজ্যের শক্তির সঙ্গে যে ফরাসী শক্তির তুলনা চলে না এবং সুসভ্য আরব কালচারের সঙ্গে ইউরোপীয় নির্জীব কালচারের যে তুলনা চলে না, সে কথাও তিনি সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন।

পিতামহ খলীফা মনসুর বিভিন্ন ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করার জন্যে যে অনবাদ বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,

www.pathagar.com

হারুনুর-রশিদ তা আরো সম্প্রসারণ করেন। তিনি বায়তুল হিকমা বা 'জ্ঞান-নিবাস' নাম দিয়ে বাগদাদে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। দেশ-বিদেশের বহু কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জ্যোতিবিদ, জ্যোতিষবিদ, সাহিত্যিক, গায়ক ও চিকিৎসাবিদ তাঁর রাজসভায় স্থান লাভ করতেন। তন্মধ্যে ব্যাকরণবিদ আসমাই ও শফি, সঙ্গীতজ্ঞ ইবরাহীম মাসুনী, চিকিৎসাবিদ জিবরাইল, অনুবাদক হাজ্জাজ এবং কবি আবু নোরায়েমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খলীফা হারুনুর-রশিদ গ্রীক ও ভারত থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো সংগ্রহ ও অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। খৃস্টপূর্ব ৩৩০-২৬০ অব্দের ইউক্লিডের নাম যখন পৃথিবী ভুলে গিয়েছিল, কতগুলো গল্প-গুজবের মধ্যেই তাঁর অপ্রমাণিত জীবন ঘুমিয়ে ছিল, হারুনুর-রশিদই তাঁর চামড়ার কাগজের পুটলির বাঁধা জরাজীর্ণ বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে খুঁজে বের করেন।

তখনকার সময়ের অন্যান্য প্রাচীন জ্ঞান-গ্রন্থগুলোর মত ইউক্লিডের গ্রন্থও চামড়ার কাগজে ছোট ছোট পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে লিখিত ছিল। ইউক্লিডের মৃত্যুর পর তার পাণ্ডুলিপিগুলো কেউ খুলে দেখেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথচ যে ইউক্লিডকে ছাড়া আজকের আধুনিক সভ্যজগতের বিজ্ঞান এক পদও অগ্রসর হতে পারে না, ইউরোপ সেই ইউক্লিডের জন্যে সে দিন কোনরূপ মাথা ঘামায়নি। তার পরিচয়ের জন্যে কেউ কোনদিন প্রয়াস চালাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। তিনি গ্রীক না মিসরীয় ছিলেন, এ সম্বন্ধে এখনও সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না। অনেকেই বলেন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন মিসরে। তাঁর কর্মজীবন চলে আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং তিনি জ্ঞান লাভ করেন এথেন্সে।

খলীফা হারুনুর-রশীদই বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ইউক্লিডের বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো পুনরুদ্ধার করে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি যদি পৃথিবীর সামনে ইউক্লিডকে তুলে না ধরতেন আর আধুনিক বিজ্ঞান জগতে তাঁর বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো যদি অজ্ঞাতই থেকে যেত, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ত।

www.pathagar.com

যা হোক, খলীফা হারুনুর-রশিদের রাজত্বকালে ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকাংশ আরবীতে অনূদিত হয়। আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সর্বপ্রথম অনুবাদ শুরু করেন এবং ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ সমাপ্ত করেন। এ ছাড়াও একজন বিশ্ববিখ্যাত আরব বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবও হারুনুর-রশিদের রাজত্বকালকে ইতিহাসের বুকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রেখেছে। তিনি জাবির ইবনে হাইয়ান।

জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২২—৮১৩) ছিলেন বিশেষভাবে রসায়নশাস্ত্রবিদ। তিনি আরব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক এবং বর্তমান রসায়ন বিজ্ঞানের স্রষ্টা। শুদ্ধ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি আণ্ডারলব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

খলীফা হারুনুর-রশিদ মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করায় বিশ্ব সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। তাঁর জীবনের মাত্র ২৩ বছর রাজ্য শাসনামলে তিনি বিশ্বব্যাপী যে শাসন সৌকর্য প্রদর্শন করে গিয়েছেন, সমগ্র পৃথিবীতে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তাঁর শাসনে শিল্পী-কারিগর বৈজ্ঞানিকদের সহায়তায় বহু কল-কারখানা গড়ে উঠে। ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে মণ্ড তৈয়ার করে কাগজ প্রস্তুতের কারখানাও গড়ে উঠে এই সময়ে। বিশেষভাবে ফরাসী সম্রাটকে তাঁর প্রদত্ত উপঢৌকন-ঘড়িটি দ্বারা বোঝা যায় যে, বিজ্ঞানের দিক থেকে তাঁর যুগ কতটা উন্নত ছিল।

৮০২ খৃস্টাব্দে হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মক্কা গমন করে হাজীদের পানিকষ্ট নিরসনের জন্যে খলীফা হারুনুর-রশিদের বিদুষী পত্নী যুবায়দা নিজ খরচে যে খালটি খনন করে দেন, সেই 'নহরে যুবায়দা' নামক খালটির দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্যে যে বৈজ্ঞানিক কারিগরি কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়, তা ছিল প্রকৃতই অভূতপূর্ব।

খলীফা হারুনুর-রশিদের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মামুন বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। দেশে তখন অরাজকতা বিরাজ করছিল। ৮১৯ খৃস্টাব্দে আল-মামুন স্বহস্তে

www.pathagar.com

শাসনভার গ্রহণ করে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি হাসান বিন সহলকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

খলীফা হারুনুর-রশিদ বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যে জ্ঞান-নিবাস কার্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন, খলীফা মামুন তা আরো সম্প্রসারণ করেন। এর নাম ছিল 'বায়তুল হিকমা'। এতে ছিল বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও অনুবাদ কার্যালয়। এখানে পারসিক, হিন্দু, আরবীয়, গ্রীক ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ শিক্ষা, গবেষণা ও অনুবাদ কার্যে নিয়োজিত থাকতেন। হুনায়ন-ইবনে ইসহাক নামক জনৈক বিখ্যাত শিক্ষাবিদকে খলীফা এর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। খলীফা বহু দূর-দূরান্তরে প্রতিনিধি প্রেরণ করে নানা দেশের পুরাতন অমূল্য গ্রন্থাদি উদ্ধার করেন। সংগ্রহকারীদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করার জন্যে প্রত্যেক গ্রন্থের সম-ওজনের স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক দিতেন।[১]

আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষা নিকেতনের অমূল্য লিপিসমূহ, গ্রীসের দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি এবং পারস্য ও ভারতীয় চমকপ্রদ গল্প গ্রন্থাবলী বাগদাদে আনয়নপূর্বক সুযোগ্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুদিত ও সম্পাদিত হতে থাকে। লিউকের পুত্র কোস্টারের তত্ত্বাবধানে হুনায়ন ঈশা, হাজ্জাজ প্রমুখ মনীষী গ্যালেন, প্যাল, ইউক্লিড ও টলেমির চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং প্লেটো ও এরিস্টটলের দর্শন গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়। মানকা ও দুবান নামক দুইজন হিন্দু ও মাহ্য়া নামক জনৈক পারসিক পণ্ডিত সংস্কৃত ও পারসী ভাষার গ্রন্থাবলী আরবীতে অনুবাদ করেন। এই সব অনুবাদ কার্যের ফলে সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, "এই সকল মনীষীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের দেশসমূহ তাহাদের নিজস্ব অথচ বিস্মৃত গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের নিদর্শনাবলীর সহিত পুনঃ পরিচিত হয়।"[২]

---

১. ভারত বিচিত্রা : সমরেশ দেবনাথ, আগস্ট, ১৯৮৩।

২. ইসলামের ইতিহাস : টি. আলী, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

www.pathagar.com

খলীফা মামুন নিজে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বাগদাদের নিকটবর্তী সামশিয়াতে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।[১] জ্যোতি-বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম মান-মন্দির। ইয়াহিয়া ইবনে মনসুর, খালিদ-ইবনে-আবদুল মালিক প্রমুখ জ্যোতির্বিদ সৌর জগত সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন এবং 'প্রামাণিক তালিকাতে' লিপিবদ্ধ করেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহাদি সম্বন্ধে ইউরোপের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, আরব জ্যোতির্বিদ-গণ তা নিরসন করে দেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র ছাড়াও গণিত, ভূগোল, চিকিৎসা, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের বহু মৌলিক দিক আবিষ্কার করা হয়। বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোল বিশারদ মুহাম্মদ বিন-মুসা আল খাওয়া-রিজমী তাঁর 'সুরত আল-আরদ' গ্রন্থে চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, বিষুব রেখা ও ধূমকেতুর গতিপথ নির্ণয় করেন। আবুল হাসান নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌ-কম্পাস যন্ত্র আবিষ্কার করেন।[২] খাওয়ারিজমীর বিশ্ববিখ্যাত বীজগণিত 'এলমুল আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা' গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সমাদৃত ছিল। সেই যুগের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ উহান্নার 'দাখাল আল-আয়ান' ছিল চক্ষুরোগ নিবারণের তথ্যপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থ।

খলীফা মামুন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের নিয়ে প্রতি মঙ্গলবারে আলোচনা সভায় বসতেন। আবু তাম্মাম ও আবু মাতাহিয়া ছিলেন তাঁর সভাকবি।

বিশ্ববিখ্যাত হাদীস সংগ্রাহক হযরত ইমাম বুখারী (রহ.), ঐতিহাসিক ওয়াকিদি, ধর্মীয় আইনবিদ ইমাম শাফি (রহ.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল এই যুগেই আত্মপ্রকাশ করে জগদ্বরেণ্য জ্ঞানী হিসাবে ইসলাম জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। খলীফা হারুনুর-রশীদের রাজত্বকালে ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুবাদ কার্য শুরু করেন হাজ্জাজ

১. ভারত বিচিত্রা ঃ সমরেশ দেবনাথ, আগস্ট, ১৯৮৩।
২. ভারত বিচিত্রা ঃ সমরেশ দেবনাথ, আগস্ট, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

ইবনে ইউসুফ। পুত্র আল-মামুনের অনুপ্রেরণাতেই হাজ্জাজ তাঁর অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করেন।

খলীফা মামুন বাগদাদের আল-শামসিয়া জুনদি শাহপুর ও দামাসকাসের দুই মাইল উত্তরে কাসিয়াস পর্বতে মানমন্দির তৈয়ার করে শুধু যে জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত ও বিজ্ঞানে নবজীবন দান করেছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন এবং অবসর পেলেই নিজেও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বসে বসে সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের মতই গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন।

গ্রীক বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো সংগ্রহের জন্যে তিনি যে বিদ্যানুরাগের পরিচয় দেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। তিনি সম্রাট তৃতীয় মাইকেলের নিকট যে সন্দিশর্ত প্রেরণ করেন, তার একটি শর্ত ছিল এই যে, কনস্টান্টিনোপলের রাজকীয় লাইব্রেরীর কতগুলো গ্রীক গ্রন্থ তাঁকে দিতে হবে। হয়ত প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থগুলো করায়ত্ত করার জন্যেই রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। তিনি সম্রাট তৃতীয় মাইকেলকে সন্ধিশর্তে বাধ্য করেছিলেন। মামুনের দাদা খলীফা মেহেদীর রাজত্বকালে বাইজান্টাইনে সম্রাজ্ঞী আইরীন করদ রাজ্য হিসাবে বাগদাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাজ্ঞী আইরীনের পরবর্তী শাসক নাইসেফোরাস মামুনের পিতা হারুনুর-রশিদের সঙ্গে বারবার বিদ্রোহ করে এবং বারবার পরাজয় বরণ করেও করদানের কবল থেকে রেহাই পান নি। এ হলো ৮০২ খৃস্টাব্দের ঘটনা।

খলীফা মামুন অতিশয় ব্যক্তিত্বশালী শাসক ছিলেন। যেখানে আদেশ করতে হয়, সেখানে প্রার্থনা করতে গেলে বিবেকে বাধা আসা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবুও খলীফা মামুন শুধু পুরাতন গ্রন্থাদি বা হস্তলিখিত পুঁথি-পুস্তক পাওয়ার লোভে সমস্ত আত্মমর্যাদা বাদ দিয়ে বাইজান্টাইন (গ্রীস) সম্রাট লিওঁর নিকট পুরাতন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্যে একটি মিশন প্রেরণ করেন।

তখনকার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সামরিক শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আব্বাসীয় খলীফাগণ যে ভাবে গ্রীক, আর্য ও

www.pathagar.com

অন্যান্যদের লুপ্ত বিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করেছিলেন আর কোন শাসক গোষ্ঠির দ্বারা তাহা সম্ভব ছিল না।

গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ শুদ্ধ ও সঠিক করার জন্যে বিজ্ঞানী নরপতি আল-মামুন দুই-তিন জায়গায় মানমন্দির প্রস্তুত করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানের আহরিত সত্য একত্র করে ফল ঘোষণা করার ব্যাপারে তাঁর সেই অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞান জগতও অনুকরণ-অনুসরণ করে আসছে।

মূল মধ্যরেখা ও পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করার জন্যে খলীফার আদেশে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা শুরু করে কৃতকার্য হন।

বিজ্ঞানের যে কোন প্রাথমিক উদ্ভাবন অনুশীলনের দোষ-ত্রুটি (যে দোষ-ত্রুটি প্রথমত থাকবেই) পরবর্তী উৎকর্ষের মানদণ্ডে হেয় প্রতিপন্ন করলে তা অবৈজ্ঞানিক ধারণা বলে ধরে নিতে হবে। কাজেই মূল মধ্যরেখা ও পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ে আরব বৈজ্ঞানিকগণ যে সাফল্য লাভ করেন, তাতে নগণ্য ত্রুটি থাকলেও তাঁরাই সকল উদ্ভাবনের অগ্রপথিক।

মামুনের আদেশে আরব বৈজ্ঞানিকগণ ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতাও নির্ধারণ করেন। এর নির্ধারিত ফল হলো ২৩° ৩৫´। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের নির্ধারিত মানের চেয়ে এটি আরো সঠিক এবং বর্তমান মানের অতি কাছাকাছি।

৬টি মানমন্দিরের পরীক্ষিত ফলানুসারে মামুনের আদেশে যে তালিকা তৈরী হয়, তার নাম হয় 'আল জিজ আল-মুসতাহাম' এ দ্বারা বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞান তালিকা প্রস্তুত হয়। এই তালিকা তৈরী করতে ভারতীয় পদ্ধতিতে সিন্দহিন্দের বা সূর্য সিদ্ধান্তের অনুকরণ করা হয়। আল-মামুন অভিজ্ঞ জ্যোতিবিদদের নিয়ে একটি জ্যোতিবিজ্ঞান গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

পদার্থবিদ আবুল হাসান এখানেই সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ৮৩৩ খৃস্টাব্দের পূর্বে আবুল হাসানই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম ও প্রকৃত আবিষ্কারক। ১৬৪২ খৃস্টাব্দের পূর্বে গ্যালিলিও এর আবিষ্কারক নন, উন্নত সংস্কারক মাত্র। গ্যালিলিওর জন্মের ৭৩১ বছর পূর্বে আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক। তাঁরই যন্ত্র

www.pathagar.com

কিছুটা উন্নত আকারে পরবর্তীকালে সারাসা ও কায়রোর মানমন্দিরে খগোল বিজ্ঞানের নবযুগ আনয়ন করে খলীফা মামুনের রাজত্বকালেই বিষুব রেখা ও আয়নমণ্ডলের সংযোগস্থল, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, ধূমকেতুর গতিপথ প্রভৃতি সৌরজগত সংক্রান্ত তথ্য নির্ণয় করা হয়। যাঁদের চেষ্টায় এ সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের সবারই নাম এখনও জানা যায়নি। তবে মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিজমী ও আল-ফ্রাগানাস প্রমুখ ছিলেন অন্যতম নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিক।

'আল-জিজ আল-মুসতাহাম' তৈরী করতে আবু আলী ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবি মনসুর ছিলেন অন্যতম। খলীফা তাঁর বিজ্ঞান গবেষণায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শামসিয়া মানমন্দিরের মহাপরিচালক নিয়োগ করেন। আল-আব্বাস ইবনে সাঈদ আল জাওহেরী, সাদ ইবনে আলী প্রমুখ বিজ্ঞানীর সহায়তায় ৮২৯—৩০ খৃস্টাব্দে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ফল দিয়ে জ্যোতিবিজ্ঞান সম্পর্কে আরবী ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৮৩১ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র হারুন ইবনে আলী তাঁর-স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রকুশলী বৈজ্ঞানিক ৯০০ খৃস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

টলেমির টেট্রাবিবলসের অনুবাদ করা হয় প্রথম খলীফা মনসুরের সময়। ইয়াহিয়া অনুবাদক ছিলেন কিন্তু তখন এই গ্রন্থের অনুবাদে কোন মন্তব্য ও টীকা লেখা ছিল না। মামুনের সময় আত্-তাবারী নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এর ভাষ্য ও টীকা লেখেন। তিনি মামুনের অভিপ্রায় অনুযায়ী বহু মূল্যবান পারসী গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরো বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে 'কিতাবুল উসূল বিন নজুম' গ্রন্থটি অন্যতম। তিনি ৮১৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আত্-তাবারীর পুত্র আবু বকর জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর একটি গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীতে জোহানেস দ্য-হিস পালেনসিস কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

আল-নাহাওয়ান্দী (মৃত্যু ৮৩৫ খৃস্টাব্দের পরে) অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফল

www.pathagar.com

নিজ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যোজনা না করে স্বয়ং স্বাধীন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কার্য তালিকা নিজেই প্রস্তুত করেন। এই খগোল তালিকার নাম হলো 'আল-বুশতামান' এটি একক বিজ্ঞান তালিকা হলেও বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও উৎসাহের কারণে এই জ্যোতিবিজ্ঞান তালিকার গুণগত বৈশিষ্ট্য কম ছিল না।

আল-মারওয়াররোজী দামাসকাস ও বাগদাদের মানমন্দিরের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল সংরক্ষক। মানমন্দিরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের কার্যাবলী বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিপিবদ্ধ ও একত্র করে রাখার সমুদয় দায়িত্বভার ছিল তাঁর উপর। তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ও পৌত্র ওমরও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। খলীফা আল-মামুনের দেশব্যাপী বিজ্ঞানী গোষ্ঠী গড়ে তোলার উৎসাহও তার অন্যতম কারণ। ওমর জ্যোতিবিজ্ঞান তালিকা প্রস্তুত করেন এবং 'আস্-সুমাততাহ্' নামে আণ্ডারলব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল আণ্ডারলবি। খলীফা আল-মামুনের বিজ্ঞান-সভার অন্যতম সদস্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূপৃষ্ঠ পরিমিতি এবং আণ্ডারলব সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক পুস্তক রচনা করেন। তবে তাঁকে বিজ্ঞান জগতে সত্যিকারভাবে অমরত্ব দান করেছেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ ও উদ্ভাবনের কীর্তি। জ্যোতি-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় যন্ত্র নির্মাণকারী হিসাবে তখন তিনি ছিলেন সুবিখ্যাত। তাঁর যন্ত্রপাতি দিয়েই মানমন্দিরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজ চলত।

আবুল-বাইয়াত (মৃত্যু ৮৩৫ খৃস্টাব্দ) বাগদাদের অন্যতম শিল্প স্থপতি। মাশাল্লাহ্‌র শিষ্য। তিনিও জ্যোতিবিজ্ঞানী ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করেন। ১১৩৬ খৃস্টাব্দে প্লেটো টিওলি তাঁর একটি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ১১৫৩ খৃস্টাব্দে জোহানেস হিসপালেনসিসও তাঁর আর একটি বই-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটি ১৫৪৮-১৫৪৯ খৃস্টাব্দে Johann Schoner কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত ছোটখাট আরও অনেকগুলো বই রচনা করেন।

আল-মামুন বিজ্ঞানকে এত ভালবাসতেন যে, মানুষকে আপ্রাণ উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে একটি বিজ্ঞান জামানা সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

খলীফার প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় সে সময়ে বহু বৈজ্ঞানিক আত্মপ্রকাশ করেন। তন্মধ্যে উপরের বিজ্ঞানীবৃন্দ শুধু আধুনিক বিজ্ঞান জগত নয়, পৃথিবীতে যতদিন বিজ্ঞান বেঁচে থাকবে, অন্তত তাঁদের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগেই বলেছি—খলীফা মামুনের পুণ্য শাসনের অবদানে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে অন্তত একজন যদি পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করতেন, তাহলে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকত। মামুনের প্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভকারী দুইজন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর একজন হলেন আল ফ্রাগানাস ও অন্যজন হলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমী। খাওয়া-রিজমী হলেন আধুনিক বীজগণিতের সৃষ্টিকর্তা। তাঁকে মুসলিম নিউটন বলা হয়। তাঁর লেখা 'এলমুল-জাবর-ওয়াল মুকাবিলা' গ্রন্থটির নাম সংক্ষিপ্ত করেই উরোপীয়ানরা এর নাম রাখেন 'এল-জাবরা'। একে ইউরোপে সাধারণত খাওয়ারিজমীর 'আল-জাবরা' বলা হয়। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অনুরূপ ইউরোপীয়রা এই দুইজন বৈজ্ঞানিকের নাম পরিচয় বিকৃত করেছেন। তা পূর্ব তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-ফ্রাগানাস (মৃত্যু ৮৩৩ খৃস্টাব্দের পরে) তিনি জ্যোতি-বিজ্ঞানেই বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত Elements of Astronomy গ্রন্থটি পাশ্চাত্যে বহুল সমাদৃত গ্রন্থ। অল্পদিন পূর্বেও প্রাচ্য জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত ছিল। ছাপা-খানা আবিষ্কারের পর ইউরোপে এর ঘন ঘন সংস্করণ হতে থাকে। গ্রন্থটি জিরার্ড এবং জোহানাস দ্য লুনা হিসপালেনসিস ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। ইউরোপের জাগরণ যুগে রেজিওমনটেনাস এই অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে পূর্ণ অনুবাদ করেন এবং ১৪৮৩ খৃস্টাব্দে-মনীষী সেলানকথন রেজিওমনটেনাসের অনুবাদের উপর নির্ভর করে নিউরেসথান হতে জ্যোতিবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। জোহানেস অনুদিত গ্রন্থটি ১৫৪৬ খৃস্টাব্দে আনাটোল কর্তৃক পুনপ্রকাশ হয়। এই হিব্রু অনুবাদ থেকে জেকব ক্রিস্টসান পুনরায় ল্যাটিনে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই জনপ্রিয় পুস্তকটির অনেক লম্বা আরবী নাম—'জামি এলমুল নজুম ওয়াল হরকত আল সামাইয়া'।

www.pathagar.com

এই বিজ্ঞান গ্রন্থটির ইউরোপে এত ঘন ঘন অনুবাদের ও জনপ্রিয়তার কারণ ইউরোপ তখন সবেমাত্র জাগতে শুরু করেছে। শিক্ষার অভাবে আরবদের বিজ্ঞানের কঠিন গ্রন্থগুলো তারা বুঝত না। তাছাড়া বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রথম দিকে অনুবাদের যোগ্যতার অভাব ছিল এবং সাধারণ শিক্ষিত জনগণের মধ্যে আকর্ষণের অভাব ছিল। কিন্তু আল-ফ্রাগানামের গ্রন্থটির বিজ্ঞান সূত্রগুলো অতি সহজবোধ্য হওয়ায় ইউরোপে এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

ফ্রাগানাম জোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নাম হলো 'আল কামিল ফিল আসতারলাব'। অন্যটি হলো—'ফি মানাত আল আসতারলাব লিল হান্দামা'। এর অর্থ জ্যামিতির সাহায্যে আস্তারলব প্রস্তুত করা। এই দুটি গ্রন্থের আরবী অনুলিপি এখনও প্যারিস ও বার্লিনে পাওয়া যায়। টলেমির মতকে অভ্রান্ত ধরেই তিনি জ্যোতিবিজ্ঞানের গবেষণা করেন। তিনি পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করেন ৬,৫০০ মাইল। গ্রহগুলোর ব্যাস এবং ওদের মধ্যকার ব্যবধান নির্ণয়ও বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক অবদানের পরিচয় বহন করে। ৮৬১ খৃস্টাব্দে তাঁরই তত্ত্বাবধানে ফুস্তাতে নীলোমিটার স্থাপিত হয়। তাঁকে 'আল-হাসিব' (অঙ্কবিদ) আখ্যায়িত করা হতো। তিনি গণিতে যে কোন জটিল সমস্যা সহজে সমাধান করে দিতে পারতেন। তাঁর বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো ইউরোপে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়।

আল-খাওয়ারিজমী (মৃত্যু ৮৪২ খৃস্টাব্দ)। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আরব নৃপতিগণ যদি এই সভ্যতার আদি গুরু হযরত মুহাম্মদ (সা) এর অনুপ্রাণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধর্মীয় অঙ্গ হিসাবে অতিশয় পবিত্র বোধ করে, গ্রীক, আর্য প্রভৃতি সভ্যতার লুপ্ত বিজ্ঞানকে পুনরুদ্ধার এবং আরবের আনাচে-কানাচে থেকে নৃপতিরা যদি বিজ্ঞান প্রতিভা খুঁজে বের করে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে শানিত করে গড়ে না তুলতেন, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান জগতের জাঁকজমকপূর্ণ সুরম্য সৌধমালাগুলো ভিত্তির অভাবে কিছুতেই গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। বিস্ময়কর প্রতিভাধর আরব বৈজ্ঞানিকদের প্রথম জীবনের তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তাঁরা খুব সাধারণ পরিবার থেকে সমাগত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁদের কারো না কারো—রাজন্যবর্গের

www.pathagar.com

অদম্য উৎসাহের ফলেই অতি দ্রুত কৃতকার্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন।

আল-খাওয়ারিজমীও ছিলেন আল-মামুনের অন্যতম বৈজ্ঞানিক। তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে আল-মামুনের প্রেরণাই যে তাঁর জয়যাত্রার উৎস, একথা স্পষ্টই বোঝা যায়। তিনি মামুনের একান্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। আবু আলী ইবনে সিনার জ্ঞানবত্তার পিছনে যেমন রাজকীয় প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, তেমনি খাওয়ারিজমীর জ্ঞান বিকাশের পিছনে অবদান ছিল মামুনের রাজকীয় লাইব্রেরীর। এই লাইব্রেরীই তাঁকে বিজ্ঞান জগতের দিকে আকৃষ্ট করে তোলে।

পূর্বেই বলা হয়েছে হারুনুর-রশিদের সাম্রাজ্য ভারতের হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রেই মামুনের রাজ্য ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পিতার মতই মামুনও তাঁর বিরাটকায় সম্রাজ্যের দুটি বাহু দুদিকে বিস্তার করে রেখেছিলেন। একটি বাহু দিয়ে পশ্চিমে গ্রীক থেকে জ্ঞান আহরণ করে আসতেন, অন্য বাহুটি দিয়ে পূর্বের আর্য উত্তরসূরীদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে আসতেন।

আফগানিস্তানও এক সময়ে আর্য সভ্যতার লীলাভূমি ছিল। আল-মামুন আফগানিস্তান হয়ে ভারতের দিকে (হয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ সংগ্রহ অথবা তদনুরূপ উদ্দেশ্যে) যে মিশনটি প্রেরণ করেন, সেই মিশনে আল-খাওয়ারিজমী অন্যতম সদস্য ছিলেন। আল-বিরুনী ভারতে দীর্ঘদিন উদ্দেশ্যমূলকভাবে অবস্থান করেছিলেন। ফলে তাঁর রচনায় যেমন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছিল, তেমনি আল খাওয়ারিজমীও ভারতের সংশ্রবে যাওয়ার জন্যেই তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছিল।

গণিত শাস্ত্রের প্রায় সব বিভাগেই খাওয়ারিজমীর প্রতিভা প্রদীপ্ত ছিল। তন্মধ্যে বীজগণিতের উপরই ছিল তাঁর সর্বাধিক ঝোঁক। তবে আরবের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর আসক্তি কম ছিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এসব গ্রন্থ জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। এই গ্রন্থগুলো আল-ফ্রাগানামের গ্রন্থের মতই ইউরোপে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ যখন আলোকোজ্জ্বল মূল তথ্য আরবদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখবার জন্যে লালায়িত, এডিলার্ড বাথ নামে একজন ইংরেজ পাদ্রী মুসলমানের ছদ্মবেশে স্পেনের কর্ডোভায় গিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন।

আল-খাওয়ারিজমীর জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো এডিলার্ড বাথ রবার্ট চেস্টার কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপে প্রচার-প্রকাশ লাভ করে এবং এভাবে আরব সভ্যতার বিজ্ঞানালোক ইউরোপে প্রথম অনুপ্রবেশ শুরু হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছাড়াও আল-খাওয়ারিজমী অসাধারণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ-কুশলী ছিলেন। উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র খগোল তালিকা ডায়াল প্রভৃতি প্রস্তুতের মাধ্যমে তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গণিতেও খাওয়ারিজমী অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। ভারতীয় গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি শুদ্ধ গণিত সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটির নাম হলো 'কিতাবুল হিন্দ'। এ ছাড়া শুদ্ধ গণিতের উপর তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকগুলো ইউরোপের নবজাগরণ যুগে এত মূল্যবান বলে আদৃত হতো যে, তাঁর অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থই ল্যাটিনে অনুবাদ হয়ে যায়। এডিলার্ড অব বাথ এবং রবার্ট চেস্টার তাঁর গ্রন্থগুলোর অনুবাদক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। রবার্ট তাঁর বীজগণিত 'এলমুল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে কারপিনসকি নিউইয়র্ক থেকে এই অনুবাদটি পূর্ণ প্রকাশ করেন। গণিত পুস্তক 'আজজান ওয়াত তাফারিক' গ্রন্থটি রবার্টই অনুবাদ করেন। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে রোম থেকেও এই গ্রন্থটি পুন প্রকাশ হয়। ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থকারের নামও অনুবাদ হয়ে গেল। 'আল-খাওয়ারিজমী' হয়ে গেল 'আল-গরিটমি' (Algoritmi), কোথাও 'আল-গরিজম' (Algorism) অথবা 'আল-গরিথম' (Algorithm) বীজগণিতের অন্যতম অংশ Logarism খাওয়ারিজমীর নাম থেকে উদ্ভূত এবং এ থেকেই Agorism, Augrim প্রভৃতি শব্দেরও উৎপত্তি।

www.pathagar.com

মধ্যযুগে ইউরোপে রোমান সংখ্যা লিখন প্রণালী ছিল এত বিদ-ঘুটে যে, বিজ্ঞানে তা ব্যবহারের তেমন উপযোগী ছিল না। আরবদের সংখ্যা লিখন প্রণালী, প্রত্যেক অক্ষরকে সংখ্যার প্রতীকে ব্যবহার প্রথা এই রোমান প্রণালীর চেয়ে সহজতর ছিল। বড় কথা, সেকালে রোমান, আর্য প্রাচীন রাশিয়ান প্রায় সর্বত্রই সংখ্যা গণনার ব্যাপারে 'এবাকাস' পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। অঙ্কশাস্ত্রে 'শূন্য' বিহীন এবাকাস পদ্ধতি ব্যবহারে প্রায়ই জটিলতা দেখা দিত।

আল-খাওয়ারিজমীই অঙ্কশাস্ত্রে সুষম সংখ্যা প্রণালী ইউরোপে তথা পৃথিবীতে প্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর 'এলমুল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' গ্রন্থে প্রথমই এই নবপ্রবর্তিত প্রণালী 'হিন্দী প্রণালী' বলে উল্লেখ করেন। সাধারণত ভারতকেই হিন্দ বলা হতো। এজন্যে একে ভারতীয় প্রণালী বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু ভারতীয় সংখ্যা প্রণালীতে শূন্য ছিল না। শূন্যটা মূলত আরবদেরই আবিষ্কার। অঙ্ক জগতে শূন্য আবিষ্কারের ফলে এক মহাবিপ্লবী যুগান্তর দেখা গেল। 'এবাকাস'-এর ভারি বোঝা অঙ্ক-শাস্ত্রের স্কন্ধ থেকে উৎখাত হয়ে গেল। আরবের শূন্য ভারতেও আমদানী হয়ে ভারতের সুন্দর সংখ্যা লিখন প্রণালী যেন নবীন সৌকর্য লাভ করল।

কিন্তু আল-খাওয়ারিজমী যে সংখ্যা লিখন পদ্ধতিকে 'হিন্দী-পদ্ধতি' বলে উল্লেখ করেছেন, তার ফলে তার প্রণালীকে ভারতীয় প্রণালী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এতে অবশ্য ভিন্ন মতের অবকাশও রয়েছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিত কারা-দ্য ভো'র মতে আল-খাওয়ারিজমীর গ্রন্থে যে 'হিন্দী' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা আদৌ হিন্দী শব্দ কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। আরবীতে هندس হিন্দাসী, অর্থ হিসাব বা অঙ্ক। আরবীতে 'হিন্দী' ও هندس প্রায় একই অক্ষর যুক্ত। শুধু হিন্দাসীর 'س' অক্ষরটি ى-তে পরিণত হলেই 'হিন্দী' হয়ে যায়। সুতরাং হিন্দাসীর 'সিন' অক্ষরটি 'ইয়া' মনে করে ভুল করায় 'হিন্দাসী' 'হিন্দী' হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে আল-খাওয়ারিজমী হিন্দাসী বলতে কোন দেশ বোঝান নি।

www.pathagar.com

কিন্তু পরবর্তীকালের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল-বিরুনীর মতে—আরবরা সংখ্যা লিখন প্রণালী ভারতের হিন্দুদের নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করেন এবং আরবদের এই সুন্দর সংখ্যা-লিখন প্রণালী ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেই প্রবর্তিত হয়। এ অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।'[১]

সংখ্যার আবিষ্কারক যেই হোক, শূন্য আবিষ্কারের আগে অঙ্কের জগত অবৈজ্ঞানিক ছিল। জটিল 'এবাকাস' প্রণালীই ছিল গণনার একমাত্র উপায়। কিন্তু সে প্রণালী ছিল গতিশীল বিজ্ঞানের অনুপো-যোগী, ভারত, গ্রীস প্রভৃতি যে দেশেই সংখ্যার উৎপত্তি হয়ে থাকুক, আরবদের নিজস্ব হোক কিংবা অন্যদেশ থেকেই—আরবরা এই সংখ্যা প্রণালী শিখে থাকুক, প্রকৃতপক্ষে তাদের সংস্পর্শে এসেই শূন্যের আবির্ভাব ঘটেছে এবং গণিত বিজ্ঞান এবাকাসের জটিলতা থেকে মুক্তিলাভ করেছে। সংখ্যা শক্তি বর্তমান রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণেতা এম. আকবর আলী সাহেব বলেন, "... আরবদের সংখ্যা লিখন প্রণালী দেখে মনে হয় তাঁরা এ লিখন প্রণালী যেখানেই শিখে থাকুন না কেন, সংখ্যার গঠন প্রণালী তাঁদের নিজস্ব ও মৌলিক। অন্যগুলির কথা বাদ দিলেও আরব বৈজ্ঞানিকগণ যে অঙ্ক সংখ্যা লিখার মধ্যে 'শূন্য' ব্যবহার করবার নিয়ম-পদ্ধতির আবিষ্কারক এবং সর্বপ্রথম ব্যবহারকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণই দেখা যায় না। অনেকের মতে আরবরাই 'শূন্য'-রও আবিষ্কারক। তাঁদের কাছ থেকেই ভারতবর্ষেও 'শূন্যের' আমদানী হয়"।[২]

তিনি তাঁর মতটিকে সততার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে দুইজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের লিখিত গ্রন্থের সমর্থনপূর্বক মন্তব্য টীকাতে উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : এম. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ৪৭।
২. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : এম. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ৪৮।
৩. হিন্দু এরাবিক নিউমারেলস (Numerals) : স্মিথ এবং কারপিনস্কি, ১৯১১, পৃষ্ঠা ৫২, ৫৬, ১৩৮।

www.pathagar.com

কাজেই শূন্য সহ বর্তমান বিজ্ঞানে প্রচলিত সংখ্যা লিখন প্রণালী আরবদেরই আবিষ্কার। ৯টি সংখ্যা আবিষ্কার কেউ করুন, সংখ্যার ব্যবহারের আধুনিক প্রণালীর জনক আরবরা।

রোম সভ্যতা স্তিমিত হওয়ার পর এমন কি অর্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবাকাসের কথাও ইউরোপ ভুলে গিয়েছিল। দশম শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক গারবার্ট এই অর্ধ বৈজ্ঞানিক এবাকাস প্রথাটি পুনঃ প্রচলন করেন। তখন ইউরোপ Zero বা শূন্য সম্বন্ধে কোন খবরই নেয় নাই। ইউরোপে শূন্যের প্রচলন শুরু হয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। ওদিকে কিন্তু মুসলিম বিশ্বে আল-খাওয়ারিজমীর সময় থেকেই শূন্য-র ব্যবহার ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপে শূন্য-র ব্যবহার পুর্ণমাত্রায় শুরু হয়, তখন একে 'আল-গরিথম' বলে অভিহিত করা হয়। ইউরোপে খাওয়ারিজমীর নামানুসারীই প্রথাটির নাম প্রবর্তন দ্বারা বোঝায় 'শূন্য' সংখ্যা আরবদেরই আবিষ্কার।

৯৫২ খৃষ্টাব্দে দামাসকাসের অঙ্কবিদ আল-কুইলিদিমি একটি চিহ্নের সাথে 'ডেসিসিল ফ্রাকশন' বহুল ব্যবহার করেছেন। ভগ্নাংশকে পৃথক করার জন্য তিনি দশমিক বিন্দু ব্যবহার করেন।

আরব বৈজ্ঞানিক কুশায়ার বিন লাব্বান আল-জিনিন একটি অঙ্ক গ্রন্থ রচনা করেন। তার নাম 'কিতাব ফি উসুল হিসান আল-হিন্দ'। এই গ্রন্থে গণনা, যোগ-বিয়োগ, গুণ, দশমিকের স্কোয়ার রুট, কিউব রুট এবং ৬০ বা তার গুণীতক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার আগাগোড়া শূন্যভিত্তিক।

শূন্য আসার পূর্বে অঙ্ক জগত প্রায় বিকলাঙ্গ ছিল। শূন্য অঙ্ক শাস্ত্রকে নবজীবন দান করেছে এবং বিজ্ঞানে মহাবিপ্লব সৃষ্টি করেছে। আল খাওয়ারিজমীর 'আল-জামী ওয়াত-তাফারিক বি হাসিব আল-হিন্দ' গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম শূন্য এবং দশমিক চিহ্ন ব্যবহার করেন।[১]

ইউরোপের ভাষায় মধ্যযুগ যে অন্ধকার যুগই ছিল ইউরোপের জন্যে তা ছিল প্রকৃতই সত্য। নানা কারণে সেখানে বিজ্ঞান আলোচনা যে ব্যাহত ছিল, একথাও সত্য। কিন্তু মধ্যযুগে আরব ছিল বিজ্ঞানের নব

---

১. ভারত বিচিত্রা ঃ ডক্টর এম. এম. খান।

www.pathagar.com

জাগরণের জ্যোতির্ময় স্বর্ণযুগ। মধ্যযুগকে বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ বলে বর্তমান সভ্যতার জনক আরব সভ্যতাকে চাপা দেওয়ার মানসিকতা এখন আর ইউরোপে তেমন নেই। এ বিকৃতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে এখন আরবরাই। বরং ইউরোপীয়ানরা এখন আরবদের ঋণ স্বীকার করে বিনাদ্বিধায়। মৌলিক বিরোধ যা-ই থাক, এই সংখ্যা লিখন প্রণালীকে Arabic Notation বা আরবদের উদ্ভাবিত বলেই মনে করে। ইউরোপীয়রা সংখ্যা লিখনের এই অভিনব প্রণালী যে আরবদের নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন, সেই স্বীকৃতির বৈজ্ঞানিক বিকাশই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

২৫০ খৃস্টাব্দে গ্রীকদের আলেকজান্দ্রিয়ায় ডাওফেন্টের অভ্যুদয় হয়। তিনি বীজগণিতের মূল সূত্রের উপর চিন্তা-গবেষণা করেন। অন্যদিকে ভারতের শ্রীধরও অনুরূপ চিন্তা-গবেষণা করেন। চিন্তা জগতে তাঁদের এই প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

অঙ্ক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতানুসারে দেখা যায়—আল খাওয়ারিজমী ভারতীয় বা গ্রীক বীজগণিত কারো দ্বারাই প্রভাবিত নন। মিঃ বোসোর মতে, "ডাওফেণ্ট এলজাবরা নিয়ে যে সামান্য আলোচনা শুরু করেছিলেন, আরবরাই তা প্রশস্ত ও পরিস্ফুট করে তোলেন।' অঙ্ক বিশেষজ্ঞ Cardan-এর মতে, "আরবরাই বীজগণিতের উদ্ভাবক। বিখ্যাত গবেষক ওয়ালিস যুক্তি পেশ করেন যে, "মাত্রার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক (খাওয়ারিজমী) ডাওফেন্টের পন্থা অবলম্বন করেন নি। বরং সম্পূর্ণ প ন্হা অনুসরণ করেছেন। অনুরূপ ভারতেও সামান্য চর্চা ছাড়া আল-খাওয়ারিজমীর তেমন কিছু আলোচনা হয়নি। এজন্য খাওয়ারিজমী 'এলমুল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' বিশ্বের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বীজগণিত।

আরব বৈজ্ঞানিকগণ জ্যামিতিকে যেমন বীজগণিতের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করেন, তেমনি বীজগণিতকে এমন কি শুদ্ধ গণিতকেও জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করেন।

এখন বীজগণিত, গণিত এবং জ্যামিতির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। একটি ছাড়া যে অপরটি চলতে পারে না, তা সর্বজনবিদিত।

www.pathagar.com

শূন্য ছাড়াও আল-খাওয়ারিজমী দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের সমাধানে যেসব সমাধান তাঁর বীজগণিতে উল্লেখ করে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান জগতে তা এখনও অভ্রান্ত বলে চলে আসছে।

তাঁর এই বিজ্ঞান গ্রন্থটি পরবর্তী আরব বৈজ্ঞানিকদের উপর প্রভাব বিস্তার ও পথ প্রদর্শন করে। ইটালীর পণ্ডিত সিউনার্ডোর মতে-আল খাওয়ারিজমী পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের উপরও প্রভাব বিস্তার করেন। তন্মধ্যে সিনান বিন ফতেহ্, আবু আবদুল্লাহ্ বিন আল সৈয়দালি, আবুল ওয়াফা, আবু কামিল সুজা বিন আসলাম প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত খাওয়ারিজমীর ব্যবহৃত সমীকরণ, আবু কামিল, আল কারমি, ওমর খৈয়াম, গণিত শাস্ত্রবিদ তাঁদের নিজ নিজ বীজগণিতে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করেছেন।

এই গ্রন্থের মারফতেই ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ এলজাবরা সম্বন্ধে এবং গণিতের দশমিক প্রথা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। এই গণিতকে বলা হতো Algorism বা the art of Alkhwarizmi। নিজস্ব গ্রন্থ ছাড়া আল-খাওয়ারিজমী 'সিন্দহিন্দ'-এর দুইটি সংস্করণ সম্পাদন করেন এবং এর একটি সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

আল-খাওয়ারিজমী আণ্ডারলব সম্বন্ধে দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একটিতে এর যন্ত্রপাতি নির্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। অন্যটিতে এর ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। প্রথম গ্রন্থটির নাম হলো 'কিতাবুল আমল আল আণ্ডার-লব'—আণ্ডারলব প্রস্তুত করার নিয়ম। দ্বিতীয়টির নাম হলো 'কিতাবুল আমল বিল আণ্ডারলব' আণ্ডারলব ব্যবহার করবার নিয়ম-কানুন। যদিও এ দুটি পুস্তকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আল-ফাগানামের 'ফি সানাত আল আণ্ডারলব বিল হানদামা' গ্রন্থে খগোল সম্বন্ধীয় বহু সমস্যা আণ্ডারলবের সাহায্যে সমাধান করেছিলেন। এসব সমাধান প্রসঙ্গে আল-খাওয়ারিজমীর আণ্ডারলব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দুটির কথা বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। আল-খাওয়ারিজমীর জ্যোতিষ বা ফলিত বিজ্ঞানের উপরও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি নাকি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম তারিখের সঙ্গে তাঁর পয়গাম্বর হওয়ার কতটুকু সামঞ্জস্য আছে তা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ আলোচনার সুবিধার জন্যে খলীফা আল-মামুনের অনুপ্রেরণায় অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে আল-খাওয়ারিজমী আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের মানচিত্র প্রণয়ন করেন। আকাশের মানচিত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। ভূ-মণ্ডলের মানচিত্র প্রণয়নকারীর অসাধারণ ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচায়ক। কেবল এল-জাবরা নয়, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ভৌগোলিক মানচিত্র অঙ্কনেরও জনক আল-খাওয়ারিজমী। তাঁর ভূগোল গ্রন্থ 'কিতাবুস সুরাত আল-আরদ' পৃথিবীর আকার সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও স্ট্রানবার্গে সংরক্ষিত আছে। এর উপর ভিত্তি করেই এইচ. ফন, জিক প্রাচীন আফ্রিকার মানচিত্র তৈয়ার করেন।

আল-খাওয়ারিজমী সমতল এবং বৃত্তীয় অঙ্কন সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তা এখনও ইউরোপের কোন কোন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পূর্বতন জ্যামিতির জটিল প্রতিপাদকে সহজসাধ্য করে তুলেছিল বলে বোসোর মন্তব্যে উল্লেখ রয়েছে তিনি বলেন, ত্রিকোনোমিতিক অঙ্কে বর্তমানের এই সরল এবং সহজ পন্থাটি উদ্ভাবন করার জন্যে কার্যকর জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আরবদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে। রৈখিক ও বৃত্তীয় ত্রিভুজের বিশ্লেষণ করবার থিওরীকে তাঁরা ছোট ছোট প্রতিপাদ্য বিষয়ে রূপান্তরিত করেন। তা ছাড়া Chords of double ore' এর স্থানে মাইন ব্যবহার করবার নিয়ম প্রবর্তন করে যাদের অনেক ত্রিভুজ বিশ্লেষণ করতে হয়, তাদের কাজ বিশেষভাবেই সংক্ষেপিত ও সহজ করে তোলেন।"[১]

খলীফা আল-মামুনের মৃত্যুর পরও আল-খাওয়ারিজমী ১৪ বছর জীবিত ছিলেন।

আরব সভ্যতার বিজ্ঞানের অভ্যুত্থান যুগে বাগদাদের খলীফাদেরই কৃতিত্ব প্রথম ও প্রধান। তন্মধ্যে খলীফা মনসুর, হারুনুর-রশিদ ও আল-মামুন—এই তিনজন খলীফার অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান : এম. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

www.pathagar.com

মুসলিম বিজ্ঞানীবৃন্দ

আল-কিন্দি

পাশ্চাত্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত। বিজ্ঞানের সকল শাখাতে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি তখনকার প্রচলিত সমস্ত বিজ্ঞান শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ ছিল। এ ছাড়াও দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যেই তিনি ছিলেন সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তিনি কুফা নগরে এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুফা নগরে জন্মগ্রহণ করলেও জ্ঞান লাভ করেন বাগদাদে। বাগদাদের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে জ্ঞান আহরণের দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়েন। খলীফা আল-মামুনের ভ্রাতা আল-মুতাসিম বিল্লাহ্‌র রাজত্বকালেই তাঁর প্রতিভা বিকাশ লাভ করে।

আল-কিন্দির গ্রন্থাবলীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁর লেখার ভাষা দুর্বোধ্য কঠিন শব্দ দ্বারা গঠিত ছিল না। সাধারণত দর্শন বিজ্ঞানের ভাষা একটু কঠিনই হয়ে পড়ে। সহজ করে বলতে চাইলেও প্রকাশ ভঙ্গিটা দুর্বোধ্য ও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি পদার্থ, রসায়ন, দর্শন প্রভৃতির দুর্বোধ্য জটিল প্রসঙ্গও সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন। এজন্য আল-কিন্দির গ্রন্থাবলী জন-সাধারণের মধ্যে বেশী প্রচার লাভ করেছিল।

আল-কিন্দির এ পর্যন্ত ২৭০টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিজ্ঞান, জ্যামিতি এবং সংখ্যা সম্বন্ধেও তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য গ্রন্থের মত এগুলিও নানা রকম তথ্য ও ঘটনা সমাবেশে সুপাঠ্য। অঙ্কশাস্ত্রের সমস্ত শাখায় গ্রন্থ রচনা ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে পদার্থবিদ্যা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর প্রণীত বহু গ্রন্থ রয়েছে। এই

www.pathagar.com

দুই বিষয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং এই নিয়েই আল-কিন্দির মৌলিক আলোচনা তাঁর অপূর্ব প্রতিভারই পরিচায়ক। সঙ্গীতের যন্ত্র-পাতি প্রস্তুত করতে গিয়ে পরিমাপ সম্বন্ধে গণিত শাস্ত্রীয় ব্যবহার সম্পর্কে তিনি আটটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সঙ্গীত বিদ্যাকে অঙ্কের মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পন্থা উদ্ভাবন করেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে খলীফা মামুনের কল্যাণে ভারতীয় মনীষী ও প্রাচীন দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে আরব জ্ঞান মনীষার বিনিময় বিকাশের সুযোগ ঘটে। খাওয়ারিজমীর মতো প্রতিভাধরের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বের সুযোগ পান।

সেকালে জ্ঞানের দুর্ভেদ্য জটিলতা ভেদ করতে খাওয়ারিজমী, আল-বিরুনী, বাত্তানী, ইবনে সিনা প্রমুখ জাঁদরেল বৈজ্ঞানিকের মতো সৃজনী প্রতিভার যেমন অভাব ছিল না, তেমনি আল-কিন্দির বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান বিশ্বের লুপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনেই আল-কিন্দি অধিকতর কৃতিত্বাধিকারী ছিলেন। এজন্যে পাশ্চাত্য তাঁকে 'ফিলোসফার অব আরব' অর্থাৎ 'আরবদের দার্শনিক' নামে অভিহিত করত।

আল-মাহনী

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কতগুলো প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে তাঁকে প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করেছে যে গবেষণা ও সাধনা, তা হলো আর্কিমিডিসের প্রবর্তিত প্রচলিত গোলক সম্বন্ধে গবেষণা। গোলক সম্বন্ধে অধুনা প্রচলিত যত প্রকার প্রণালী আছে, তার সবগুলি সম্পর্কেই তিনি আলোচনা করেছিলেন অর্থাৎ আধুনিক গোলকে যেসব সূত্র ব্যবহৃত হয়, তার সর্বপ্রকার সূত্রেরই তিনি উদ্ভাবক। সুতরাং তাঁকে আধুনিক গোলকের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়।

আয়তনের কোন নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে গোলককে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করার কতগুলো পন্থা আর্কিমিডিস নির্দেশ করে যান। তার

www.pathagar.com

উপর ভিত্তি করে আল-মাহনীও গোলককে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং সে সম্বন্ধে অনেকগুলো নতুন পন্থাও উদ্ভাবন করেন। মাহনীর আবিষ্কৃত এসব পন্থা এখনও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মাহনীর বিজ্ঞান সম্পর্কিত অন্য কোন পরিচয় না থাকলেও শুধু গোলক সম্বন্ধে গবেষণামূলক উদ্ভাবনী প্রতিভার দ্বারাই তিনি বিজ্ঞান জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু তা নয়। অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সম্পাদ্যে ত্রিকোনমিতির সাহায্য নেওয়া তখনকার অঙ্ক-বিদদের কল্পনাতীত ছিল। আল-মাহনী এর প্রথম পথ প্রদর্শক।

গোলক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে বীজগাণিতিক সমীকরণের উদ্ভব হয়েছে, তার সমাধানে তিনি ত্রৈমাত্রিক কোণের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। ত্রিকোনমিতি ব্যবহারের কথা যখন কেউ কল্পনাই করত না, সেই যুগে ত্রিকোনমিতির এরূপ ব্যবহার তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

এখন আল-খাওয়ারিজমীও বীজগণিতে দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের মধ্যেই তাঁর বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ত্রিমাত্রিক সমীকরণ আলোচনার হয়ত তখন আবশ্যকতাও দেখা দেয়নি। আর্কিমিডিসের গোলক খণ্ড করার মধ্যেই এরূপ ত্রিমাত্রিক সমীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি কনিকের সাহায্যে এর সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। আল-মাহনীর গোলক গবেষণা থেকেই এরূপ ত্রিমাত্রিক সমীকরণ উদ্ভব হয় এবং তিনিই এর সর্বপ্রথম উদ্ভাবক এবং সমাধানের গৌরবও তাঁরই।

খলীফা হারুনুর-রশিদের বিশেষ অনুপ্রেরণায় ইউক্লিডের জ্যামিতির ষষ্ঠ খণ্ড আল-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অনুবাদ সমাপ্ত করেন। এবার আল-মাহনী সর্বপ্রথম ইউক্লিডের পঞ্চম ও দশম খণ্ডের ভাষ্য লিখেন। আর্কিমিডিসের গোলক ও স্তম্ভক সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীও তিনি অনুবাদ করেন।

এ কথায় আরবী ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদের দ্বারা লুপ্ত আর্কি-মিডিসকে আল-মাহনীই সর্বপ্রথম বিশ্ব সভ্যতার উচ্চ স্তরে আসন দান করেন।

www.pathagar.com

মূসা বিন শাকীর

তিনি ছিলেন ভয়ঙ্কর দস্যু। অর্থের জন্যে লুটতরাজ, নরহত্যা, অসহায় পথিকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও অমানুষিক নির্যাতনই ছিল তাঁর কর্ম-জীবন। ঘটনাক্রমে আল-খাওয়ারিজমীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায় এবং খাওয়ারিজমীর পরামর্শে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তাঁর মারফতেই তিনি আল-মামুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। আল-মামুনের উৎসাহে মূসা বিন শাকীর বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। খলীফার প্রেরণায় তাঁর দস্যুবৃত্তির ভয়ঙ্কর প্রতিভা বিশ্ব মানব কল্যাণ সাধনায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিভা সব সময় শানিত হাতিয়ারের মত। যেখানেই ব্যবহার করা যায়, সেখানেই সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়। মূসা বিন শাকীর বিজ্ঞানের শুধু পাঠকই রয়ে গেলেন না, অঙ্কশাস্ত্রের জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রেও ইতিহাসে জীবিত হয়ে রইলেন। বিজ্ঞান জগতে তাঁরপুণ্য অবদান হলো তিনি বিশ্ববিখ্যাত 'বনি মূসা ভ্রাতৃদ্বয়ের জনক।

বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়

মূসা বিন শাকীর তিনটি শিশুপুত্র রেখে জান্নাতবাসী হন। এই তিন পুত্রের নাম হলো—আবূ জাফর, মুহাম্মদ, আবুল কাসিম আহমদ এবং আল-হাসান ইবনে মূসা বিন শাকীর। খলীফা আল-মামুন তাঁর বিজ্ঞান সভার ইয়াহ্‌হিয়া বিন আবি মনসুরের হাতে তাঁদের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। শৈশবকাল থেকেই রাজকীয় জ্ঞানী পরিবেশে বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয় সময়কালে বিজ্ঞানের শীর্ষস্তরে আসন লাভ করেন।

উন্নত বৈজ্ঞানিকদের সংস্রবে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের ভাগ্য এমনি সুপ্রসন্ন ছিল যে, বলতে গেলে যে সুযোগ সাধারণত রাজপুত্রগণ পেয়ে থাকেন, শৈশব থেকেই তাঁরা প্রায় অনুরূপ রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন। জ্ঞান সাধনায় যেমন তাঁরা চরম বিকাশ লাভ করে-ছিলেন, তেমনি পর্যাপ্ত ধন-সম্পদেও তাঁদের কোন অভাব ছিল না।

তাঁদের বড় ভাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী ছিলেন। বিজ্ঞানের সর্ব শাখাতেই তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। মধ্যম ভাই ছিলেন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুতে সুনিপুণ কুশলী ও যন্ত্র ব্যবহার বিশেষজ্ঞ। ছোট

www.pathagar.com

ভাই আল-হাসান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। অর্থাৎ বিজ্ঞান গবেষণা সাধনায় তাঁরা তিন ভাই-ই-পরস্পর সম্পূরক, স্বয়ং-সম্পূর্ণ সোনায় সোহাগা। বিজ্ঞান এ জগতে এই ভাবে ত্রয়ী ভ্রাতার শীর্ষ আধিপত্য ও সমন্বয়ের এত বাস্তব নজীর দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাঁরা তিন ভাই আল-বিরুনীর মতই বৈজ্ঞানিক ও পর্যটক ছিলেন। জ্ঞান আহরণে তাঁরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়োজিত করেন। নিজেরাও বেরিয়ে পড়েন পূর্বতন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করার জন্যে। তাঁরা গ্রীক, রোম প্রভৃতি সভ্যতার পীঠস্থানগুলো ঘুরে ঘুরে বিপুল গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এরপরও লোক মারফত প্রচুর অর্থব্যয়ে বহু প্রাচীন জ্ঞান-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। বাগদাদে ফিরবার পথে হাররানে ভাগ্যান্বেষী বৈজ্ঞানিক সাবিত ইবনে ফোরার সঙ্গে দেখা হয়।

দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার কেন্দ্রস্থল গ্রীনউইচ তৎকালীন পৃথিবীতে অজ্ঞাত ছিলেন। বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার কল্পনা করে লোহিত সাগরের তীরে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর আকার ও আয়তন সঠিকভাবে নির্ণয় করেন।

আরব বৈজ্ঞানিকগণ যখন পৃথিবীর সঠিক পরিধি ও আয়তন আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তখন অনারব বৈজ্ঞানিকগণ এত পিছনে যে, পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত সমতল না চেষ্টা তাই নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি এর শতাধিক বছর পরে ১৪৯২ সালে ইটালীর শাসক গোষ্ঠী, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে—বিজ্ঞানের এমন শুদ্ধ সত্য কথাটি বলায় বৈজ্ঞানিক ব্রুনোকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন। পৃথিবী ঘূর্ণনের মতবাদ সমর্থন করায় গ্যালিলিওকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৬৩৭ খৃস্টাব্দে তিনি কারাগারেই অন্ধ হয়ে যান। তারপর ১৬৪২ খৃস্টাব্দে জেলখানাতেই হতভাগ্য বন্দীর জীবন প্রদীপও চিরতরে নিভে যায়। বর্তমান যুগেও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শাখারভ সোভিয়েত কারাগারে গ্যালিলিওর ভূমিকাই পালন করেছেন। বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় পৃথিবীর আকার, আয়তন ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করায় এবং পৃথিবী গতিশীল বলায় আল-মামুন তাঁদের ফাঁসি দেন নি।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ইসলাম এবং তার সভ্যতা এমনি যে, শাকীর নামক দস্যুসরদারকে মনীষী বৈজ্ঞানিক আসনে সসম্মানে স্থান দিয়েছিল। তাঁর তিন পুত্রকে অতি উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় তুলে ধরেছিল। অতি কুৎসিৎ কদাকার ক্রীতদাসী হযরত রাবেয়া বসরীকে মহিলা আউলিয়ার সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিতে কারও উদার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা স্থানের অভাব পড়েনি। নিগ্রো ক্রীতদাস বিলালকে তখন মুয়াযযিনের মর্যাদা দিয়েছিল ইসলামী সভ্যতা। একান্ত হালে মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলীকে সম্মানে বুকে জড়িয়ে নিতে বা মসজিদে স্থান দিতে বা একপাতে বসে খেতেও ইসলাম বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবক

পাশ্চাত্য শাসকবর্গ যদি আধুনিক সভ্যতার গোড়ার দিকে গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের রাজকীয় উৎসাহ না হোক অমানুষিক নির্যাতন থেকে রেহাই দিতেন, তা হলেও বিশ্ব সভ্যতা তাঁদের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু আশা করতে পারত।

বস্তুত নিউটন, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাসের জন্মের শত শত বছর আগে আরব বৈজ্ঞানিকগণ জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ইউরোপের গোড়ার দিকে যখন বিজ্ঞান তেমন কোন সূত্র ছিল না, তখন আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সকল সূত্রের মোটামুটি উৎস তো ছিল আরব বিজ্ঞানের সাধনা। অনুসরণ-অনুকরণ নিউটন করতে পারেন ওমর খৈয়ামকে। ওমর খৈয়ামের তো নিউটনকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

ইউরোপ এলজাবরা শিখেছিল আল-খাওয়ারিজমীর নিকট। গুরুকে অস্বীকার করার জন্যে ইউরোপে তাঁর নাম রাখা হলো 'আল-গরিটমি'। সুতরাং মূল কথাতেই আসা যাক।

ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা এখন সবারই জানা কথা। কিন্তু এই জানা কথাটাই আবিষ্কার করতে বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের দীর্ঘ দিন ধরে সাধনা করতে হয়েছিল।

বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয় চক্রবান থেকে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেন। বছরে দুইদিন দিন-রাত সমান থাকে। এই দুই দিনই পৃথিবী তার বিষুব রেখা ও আয়নমণ্ডলীর সংযোগ-স্থলে অবস্থান করে। পৃথিবীর চলন্ত অবস্থায় এই সংযোগস্থলের পরিবর্তন হয়। এই অতি পরীক্ষিত আধুনিক সহজ কথাটা এক সময় কেউ জানতেন না।

বনি মূসারাই এই তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের একটি মস্তবড় কথা বনি মূসাদের দ্বারা বিশ্বজনগণ প্রথম

www.pathagar.com

জানতে পেরেছে। অপভূ (Apoge) এবং অনুভূ (Parigec) পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অবস্থান। শত শত বছর পূর্বে এক সময় এই অপভূ এবং অনুভূ স্থির নিশ্চল বলে মনে করা হতো। এমনকি এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদেরও ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। সে সময় বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয় সঠিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সর্বপ্রথম অপভূ-অনুভূ-র সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেন। অথচ এই সঠিক আবিষ্কার ঘোষণার পরেও এবং বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের কমবেশী সাড়ে ৬ শত বছর পরে কোপানিকাস ভ্রাতৃ মতবাদ প্রচার করে গেছেন।

কোপানিকাসের মতে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরে। বনি মূসাদের মত হলো, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে বটে, কিন্তু অপভূ ও অনুভূ-র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ানুযায়ী তার ঘূর্ণনের গতিপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়।

সেকালে খৃস্টান জগতে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, সূর্য ঘুরে আর পৃথিবী স্থির থাকে। তখন কোপানিকাস বলেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে। এর কয়েক বছর পর গ্যালিলিও এবং ব্রুনো এ কথারই প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে ইটালীর রাজকীয় ধর্মোন্মাদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন।

কিন্তু এর সাড়ে ৬ শত বছর পূর্বে বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয় প্রথম ঘোষণা করেন, সূর্য নয়, পৃথিবীই গতিশীল। এমন কি, কি আকারে ঘুরে সেই গতিপথও তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেন। বনি মূসাদের মতবাদ-ই বর্তমানে সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত। অথচ কোপানিকাস বলেছিলেন—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে। এই ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হয়ত অপভূ-অনুভূ তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট। সুতরাং কোপার্নিকাসের জন্মের বহু শত বছর পূর্বে পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে গতিশীল একথা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়। পৃথিবীর গতিপথে সূর্যের অপভূ-অনুভূও তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেন।

বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের প্রথম কার্যালয় ছিল সামরাফে। পরবর্তী বৈজ্ঞানিক ইবনে ইউনুসের গ্রন্থে বনি মূসাদের রচিত জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা থেকে সূর্য সম্বন্ধে বহু তথ্য উল্লিখিত হয়।

www.pathagar.com

বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় চিকিৎসা, জ্যামিতি, কণিক, পরিমিতি প্রভৃতি সম্পর্কে কতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার একটি গ্রন্থ মিঃ জিরার্ড "Liber Trium Eratrum" নাম দিয়ে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিতে পরিমাপ সম্বন্ধে লেখকদের উচ্চস্তরের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বলবিজ্ঞান ও সাবেক প্রচলিত কার্যবিধির বাইরে নবতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৌশলগত উৎকর্ষমূলক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের গ্রন্থগুলো নব অবদানে সমৃদ্ধ।

গ্রীক বৈজ্ঞানিক হীরোই ছিলেন বলবিজ্ঞানের উদ্ভাবক। এই সময় 'কুস্তাবিন-লুকা আল বালবেকী' নামে হীরোর একটি বল-বিজ্ঞান গ্রন্থ 'ওরয়' আরবীতে অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থটি হয়ত ইউরোপের প্রেরণার উৎস হতে পারে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ-গবেষণার দ্বারা তারা এ সম্পর্কে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও উদ্ভাবন করেন।

জ্যামিতি পূর্ব হতেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিষয় হিসাবেই চলে আসছিল এবং নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনে সমৃদ্ধ হয়ে চলছিল। কোণকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন ইউক্লিড। এই দ্বিখণ্ডন হতে চতুর্থ খণ্ড করা বা তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ করা সম্ভব, কিন্তু কোণকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করার জটিলতা ভেদ করতে উচ্চাঙ্গের জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন। Conchoid ব্যবহার করে কোণকে ত্রিখণ্ডিত করা সম্ভব কিনা, এ বিষয়েও এই বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়-ই হয়ত প্রথম পথ প্রদর্শক। বাহুর পরিমাপ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার ফরমুলারও তাঁরাই আবিষ্কারক। তাঁদের রচিত জ্যামিতি গ্রন্থে এই ফরমুলাটি রয়েছে।

তাঁরা 'করাস্তুন' নামক একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গোলকের পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অঙ্ক-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় এবং জ্যোতিবিজ্ঞানেও তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁদের সমুদয় গ্রন্থের সন্ধান আমরা জানি না। তবে প্রত্যেক আরব বৈজ্ঞানিকের হাতে যেসব প্রাচীন সূত্র পড়েছিল, সেই সব সূত্রকে কেন্দ্র করে, নিজস্ব নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছিলেন। ইউরোপ

www.pathagar.com

তার নব জাগরণের প্রয়োজনে কিছু কিছু গ্রন্থ বাছাই করে অনুবাদের মারফত সেগুলি পুনরুদ্ধার করে বটে, কিন্তু তাঁদের সমগ্র অবদানের ছিটাফোঁটাই মাত্র আমরা জানতে পেরেছি। এর বাইরে আমরা কিছুই জানি না।

বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয় আল-মামুন ও তৎপরবর্তী খলীফাদের রাজত্বকালে ছিলেন রাজ-জ্যোতিবিদ। আল-মামুনের দ্বারাই তাঁরা প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এই ধন তাঁরা ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেন নি। জ্ঞান সংগ্রহের জন্যে দেশ পর্যটন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে সদ্ব্যয় করেছিলেন। সেকালে রাজকীয় মানমন্দির থাকা সত্ত্বেও বাগদাদে টাইগ্রীস নদীর তীরে নিজেদের বাসভবনে তাঁরা 'বাবেল তাকে' নামক একটি নিজস্ব মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৮৫০ খৃস্টাব্দ থেকে ৮৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের মানমন্দিরে ইচ্ছামত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ কার্য সম্পাদনা করেন।

বনি মূসাদের জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ বলা যায় না। তবে বড় ভাই আবু জাফর মুহাম্মদ ৮৭২-৭৩ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সাবিত ইবনে কোরা (৮২৬-৯০১)

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত হাররানে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সেতিনি বাগদাদে দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবনে তিনি টাকা ভাঙিয়ে মুনাফা আদায়ের ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু তখন তাঁর দর্শনের মতবাদ বেশ পরিচিত হয়ে মানুষের ধর্মোন্মাদনার জন্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এ নিয়ে আদালতে অভিযোগ উঠে। আদালত তাঁর সমস্ত মত ও দর্শন পরিবর্তনের জন্যে রায় দেন। সাবিত ইবনে কোরা তাঁর আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে আদালতের এলাকার বাইরে, সুদূরবর্তী কাফারতুমায় পালিয়ে যান। সেখানে জীবিকার জন্যে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন।

এই সময়ে বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের প্রধান আবু জাফর মুহাম্মদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মূসা ভ্রাতৃত্রয় পূর্বোল্লিখিত গ্রীক পণ্ডিতদের বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করে বাইজান্টাইন পরিভ্রমণ করে বাগদাদের দিকে ফিরছিলেন। সাবিতকে দেখা মাত্রই বনি-

www.pathagar.com

মূসাগণ অল্প পরিচয়েই তাঁর অনন্য প্রতিভা বুঝতে পারেন। তাঁরা তাঁকে নিয়ে বাগদাদ চলে আসেন।

বাগদাদের নতুন খলীফা মুতাজিদ বিল্লাহ্ মূসা ভ্রাতৃদের প্রধান আবু জাফর মুহাম্মদের সুপারিশে বৈজ্ঞানিক সাবিতের জন্যে রাজকীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণভাবে অঙ্ক ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। সুতরাং বিজ্ঞানে যারা পরিশেষে বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলেন, তাঁরা সাধারণত গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সাবিত ইবনে কোরা গ্রীক এবং সিরিয়ান ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এ জন্যে অঙ্ক—বিশেষভাবে—জ্যামিতিতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অঙ্ক ও জ্যামিতিতে তিনি এত সুখ্যাতি লাভ করেন যে, সাধারণভাবে তাঁকে মনে হতো যে, তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিবিদ।

তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অন্যতম পারদর্শী বৈজ্ঞানিক ইসহাক ইবনে হুনায়ন ইউক্লিডের জ্যামিতির আরবী অনুবাদ করেন। সাবিত অনুবাদটি সংশোধন করে দিয়ে এর একটি উপক্রমণিকা লিখে দেন। এই উপক্রমণিকাতেই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর জ্যামিতি গ্রন্থ বহু নব উপাদানে সমৃদ্ধ করেন। তিনি তাঁর এই জ্যামিতি গ্রন্থে প্রাচীন মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক অবদানের বিশদ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও প্রত্যেক বিষয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা করে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারাও তাঁর জ্যামিতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল। আল-মাজেস্ট জ্যোতিবিজ্ঞান, কনিক ম্যাজিক, স্কোয়ার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর কতগুলো গ্রন্থ রচিত ছিল। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম অঙ্ক শাস্ত্রের ম্যাজিক স্কোয়ার আলোচনা করেন। অতি প্রাচীন কালে চীন এবং ভারতে ম্যাজিক স্কোয়ার সম্বন্ধে কিছুটা অ-বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা ছিল। তিনি তাঁদের সেই সূত্র থেকে আলোচনা শুরু করেছিলেন না কি তা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজের আবিষ্কৃত, বলা যায় না। কিন্তু তাঁর পর্যালোচনা ছিল অঙ্কশাস্ত্রের একটি নবতম শাখার বিজ্ঞান, সুতরাং এ অবদান তাঁরই।

www.pathagar.com

আল-খাওয়ারিজমী যেমন বীজগণিতের সমীকরণকে উত্তম রূপে সহজ সুন্দর করে প্রমাণ ও বিকশিত করার জন্যে জ্যামিতিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন, তেমনি সাবিতও বীজ গাণিতিক সমস্য জ্যামিতিতে ব্যবহার করে জ্যামিতির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে কেউ এমনভাবে জ্যামিতির প্রতিপাদ্যের সমাধানে বীজ গণিতকে ব্যবহার করেন নি।

জ্যোতিবিজ্ঞানে সাবিত সূর্যের তুঙ্গত্ব, সৌর বছর সূর্য ঘড়ি বা ছায়াঘড়ি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ত্রিকোনমিতি সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। বিশেষভাবে পরবর্তী সময়ে আল-বাত্তানীর হাতে ত্রিকোনমিতির যে উন্নতি সাধিত হয়, তাঁর সূত্রপাত করেন সাবিত ইবনে কোরা। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর অবদানও কম নয়।

সূর্যঘড়ি দিয়ে সময় নিরূপণ প্রথম আবিষ্কার হয় মিসরে। মিসরীয় সভ্যতা বিলুপ্ত হওয়ার পর গ্রীক সভ্যতায়ও এই সূর্য-ঘড়ির কিছুটা প্রচলনও দেখা যায়। কিন্তু মিসর ও গ্রীক সূর্যঘড়ির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। অনুরূপ মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত ছায়াঘড়ি ছিল। মিসর গ্রীকদের চেয়ে আরো উন্নত ও অভিনব। আল-ফ্রাগানাম ও আল-খাওয়ারিজমীর ছায়াঘড়ি অনুসরণ করেই সাবিত সূর্যঘড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করলেও এতে তাঁর কিছুটা নিজস্ব মৌলিক অবদানও ছিল। সাবিত এপোলো নিয়মের কণিক-এর পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ করেন ও ভাষ্য লেখেন। আর্কিমিডিস, ইউক্লিড, থিওডেসিস ও টলেমির গ্রন্থসমূহেরও তিনি অনুবাদ করেন।

মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সাবিতই প্রথম তুলাদন্ড সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং এই সম্বন্ধে তিনি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই সময় বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ও তুলাদণ্ড সম্বন্ধে বই লিখেন। সাবিতের তুলাদণ্ড সংক্রান্ত বইটি জিরার্ড ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। জিরার্ড জোহানেস সাবিতের বহু পুস্তক ল্যাটিনে অনুবাদ করেন।

আবুল মাশার (৭৮৬-৮৮৬)

আবুল মাশার ছিলেন একজন অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক। তাঁকে বিজ্ঞানের যাদুকর বলাই সঙ্গত। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আরব

www.pathagar.com

সভ্যতায় প্রায়ই দেখা যেত। যেমন আল-বিরুনী, ইবনে সিনা, নাসিরউদ্দীন তুসী প্রমুখ। আবুল মাশারের মত এমন এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আধুনিক সভ্যতায় একজনও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বাগদাদের খলীফা হারুনুর-রশীদ যখন সিংহাসনারোহণ করেন, তখন বৈজ্ঞানিক আবুল মাশার জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ আব্বাসীয় বংশের পরিপূর্ণ গৌরবময় যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর আমলে আব্বাসীয় বংশের বহু অনুল্লেখযোগ্য অযোগ্য খলীফার ঘন ঘন উত্থান-পতনের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ মাশারের শতবর্ষ ব্যাপী দীর্ঘ জীবন ছিল আব্বাসীয় বংশের উন্নতি ও পতনের সাক্ষী।

জীবনের শেষ ২৩ বছরে তিনি কোন একজন আব্বাসীয় নৃপতির প্রিয়পাত্র ছিলেন। খলীফা হারুনুর-রশীদ থেকে আল-মামুন পর্যন্ত খলীফাদের উৎসাহও প্রেরণায় তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই অযোগ্য নৃপতি সেই সাধনাকে আসামী ধরার কাজে ব্যবহার করতেন। উচ্চস্তরের রাজকীয় আসামীগুলোকে বৈজ্ঞানিক মাশার তা অঙ্ক কষে গুণে আসামী কোন্ জায়গায় পালিয়ে আছে বলে দিতেন। তদনুসারে রাজ-কর্মচারীরা তাকে ধরে নিয়ে আসত। তখনকার রাজদ্রোহীরা জানত যে, সরকারের চোখে ধুলি দেওয়া যায়, কিন্তু মাশারের গণনার কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

যা হোক, রাজরোষে পতিত জনৈক উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক মাশারের গণনার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আত্মগোপনের এমন এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করলেন যে, জ্যোতিবিদ কোন অবস্থাতেই তাকে ধরতে পারলেন না। জ্যোতির্বিজ্ঞানী গুণে দেখলেন, আসামী এক রক্তের সাগরের মধ্যে অবস্থিত সোনার পাহাড়ে বসে আছেন। বারবার গুণে দেখলেন, গণনার নির্ভুল ফল এছাড়া আর কিছুই হয় না। তখন খলীফা এমন অদ্ভুত আত্মগোপনের রহস্য উদঘাটনের জন্যে আসামীকে ক্ষমা ঘোষণা করে তাঁকে অচিরেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। আসামী খলীফার নিকট উপস্থিত হলে খলীফা কৌতূহলী হয়ে তাঁর আত্মগোপনের বিবরণ জানতে চাইলেন।

আসামী জানালেন যে, তিনি জানতেন, মাটির উপরে নীচে যেখানেই

www.pathagar.com

থাকা যাক, মাশারের গণনায় তিনি ধরা পড়বেনই। তখন তিনি একটি সুবৃহৎ টবকে কানায় কানায় রক্ত দ্বারা ভর্তি করে তার মাঝখানে একটি স্বর্ণখণ্ডিত আসনে বসে থাকতেন। এমন নির্ভুল জ্যোতিষ বিজ্ঞানী বর্তমান সভ্যতায় বিরল। বিশেষ করে জ্যোতিষ বিজ্ঞানটা প্রায় লুপ্ত হওয়ার পথেই চলছে। অধ্যাত্ম ও জ্যোতিষবিজ্ঞান এখন কতগুলো ভণ্ড প্রতারকের প্রতারণা ও ভণ্ডামীর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জ্যোতিবিজ্ঞানের উন্নত স্তরটিই হলো জ্যোতিষবিজ্ঞান। আমরা জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়েই আত্মসন্তুষ্ট আছি, জ্যোতিষ বা ফলিত বিজ্ঞান যে আমাদের কোন কাজে লাগে—এমন মনে হয় না।

অথচ ঠিকমত আয়ত্তে আনতে পারলে মানব জাতির প্রয়োজনে জ্যোতিবিজ্ঞানের মতই জ্যোতিষবিজ্ঞানও প্রচুর অবদান রাখতে পারে।

দেখা যেত যিনি সেকালে মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞানের সকল শাখায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, পর্যটক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং উৎকৃষ্ট গায়ক ও সঙ্গীত বিজ্ঞানী। দিনে যিনি মুসলিম সম্রাট, রাত্রে সাধারণ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলেমিশে সুবোধ শান্ত জ্যোতিবিজ্ঞানী। আকাশের তারকা নিয়ে নিবিষ্ট গবেষণায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন।

আবুল মাশার প্রথমত ধর্মশাস্ত্রের পর্যালোচক ছিলেন। তার পর হাদীস শরীফের টীকা লিখে তিনি পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হন। ৪৭ বছর বয়সে তিনি বিজ্ঞান সাধনা শুরু করেন। সাধারণত মানুষ তরুণ বয়সে ধর্ম সাধনা না করে পরিপক্ক বয়সে ধর্ম সাধনা করে। তিনি তাঁর বিপরীতভাবে প্রথম বয়সে ধর্ম সাধনা করে, পরিপক্ক বয়সে বিজ্ঞান সাধনা শুরু করেন। আল-কিন্দির অনুপ্রেরণাই তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় মনোযোগের প্রধান কারণ। তিনি আল-কিন্দির শিষ্য ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে তাঁর জ্যোতিষবিজ্ঞানেই অনুরাগ ছিল বেশী। বিশেষভাবে জ্যোতিষবিজ্ঞানে তিনি অধিকতর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর প্রভাবের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ব্যাপারে তিনি অঙ্কশাস্ত্রকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করে অসাধারণ

www.pathagar.com

কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর সাধনার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'জিজ আবি মাশার' গ্রন্থে। বর্তমান জগতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের এত যান্ত্রিক উন্নতির যুগেও মাশারের জিজের (তালিকার) মৌলিক তথ্যাদির বিবরণ প্রায় নির্ভুল প্রমাণিত হওয়ায় সে যুগের জন্যে তা বিস্ময়করই বলা যেতে পারে। 'জিজ'-এ জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনাকালে তিনি ত্রিকোনমিতিরও আলোচনা করেন।

আবুল মাশার বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সব গ্রন্থের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা হলো ঃ

১. 'কিতাবুল মদখল আল-কবির' বা 'কিতাবুল মদখবুল ইলা ইলম আহকাম আন-নজুম' (জোতিষ উপক্রমণিকার বৃহৎ পুস্তক)। গ্রন্থটি জোহানেস দ্য-লুনা ও হারমানাগ ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। অক্সফোর্ডে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ১৩৮৯ খৃস্টাব্দে অগসবাগ এবং ১৪৯৫ ও ১৫০৯ খৃস্টাব্দে ভেনিস থেকে পুনঃ প্রকাশিত হয়। তখন ইউরোপে এ গ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। কারণ এতে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা সংক্রান্ত জ্যোতিষ সূত্রগুলি ছিল খুবই নির্ভুল।

২. 'কিতাবুল কিফানাত' (নক্ষত্রাদির অবস্থান সম্পর্কিত পুস্তিকা) প্যারিস ও অক্সফোর্ডে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

৩. 'কিতাবুল আহকামে সিনিল মাওয়ালিদ'। (জন্ম বছরের পরিবর্তনমূলক পুস্তিকা) এ গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হয়।

৪. 'কিতাবুল উলুফ কি বায়তুল ইবাদাত' (ধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধীয় সহস্র কাহিনী। পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রন্থ ও সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা। আল-বিরুনীর প্রাচীন বিজ্ঞান গ্রন্থাবলীতে এ পুস্তকের উল্লেখ আছে।

৫. 'কিতাবুল মাওয়ালিদ আর-রিজাল ওয়ান-নিসা'। বার্লিন, ভিয়েনা ও ফ্লোরেন্স থেকে প্রকাশিত 'জন্ম পুস্তক' গ্রন্থটি মাশারেরই অবদান বলে মনে করা হয়।

৬. অগস্বার্গ থেকে প্রকাশিত 'The Flores Albomasaris' নামক একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এর আরবী নাম পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আল-খাওয়ারিজমী। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য আরব বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে 'হাবাশ আল-হাসিব' নামে অভিহিত করতেন। তিনি তিনটি খগোল তালিকা প্রস্তুত করেন। প্রথমটি প্রণীত হয় ভারতীয় পদ্ধতিতে। দ্বিতীয়টি নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা। এটি সর্বোন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আল-মামুনের সময়কার তালিকার সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যশীল। তৃতীয়টিকে বলা হতো 'শাহী তালিকা'।

ত্রিকোনমিতি সম্পর্কে হাবাশের আলোচনা পরবর্তী মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতদ্ব্যতীত ট্যানজেন্ট ও কো-ট্যানজেন্ট সম্বন্ধেও তিনি একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাঁর এই তালিকাটিই বিশ্বে ত্রিকোনমিতির সর্বপ্রথম তালিকা। তিনিই সর্বপ্রথম কোসেকন্ট ও সেকন্ট-এর প্রচলন করেন।

আবু জাফর

তিনি পিতার মতই জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশেষভাবে এর অনুকূলে যন্ত্রপাতি নির্মাণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

যেসব আরব বৈজ্ঞানিক বিখ্যাত বলে ইউরোপে সুপরিচিত, তাঁদের চেয়ে কম পরিচিত কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

আহমদ ইবনে আল-তাইয়েব ঃ বীজগণিত, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে কতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আল-দীনওয়ারী : তাঁর জন্ম নাম ছিল দীনওয়ার। আজীবন গ্রামে বাস করেও তিনি বিজ্ঞানের সাধনায় যে অবদান রেখে গেছেন, শহর বা নগর সভ্যতার উন্নত সুযোগ সংস্পর্শে বা রাজকীয় সহায়তা পেলে হয়ত তাঁর বিজ্ঞান সাধনা আরো বিস্ময়করভাবে বিকাশ লাভ করতে পারত। তিনি বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও হিন্দু গণনা প্রণালী সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সহল ইবনে বিশর ঃ তিনি য়াহূদী হয়েও নিজ প্রতিভা বলে বাগদাদের রাজসভায় মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের সমপদমর্যাদা লাভ করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বীজগণিত সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন

www.pathagar.com

করেন। তিনি খুরাসানে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন।

সহল ইবনে তারারী ঃ তিনিও একজন য়াহুদী বৈজ্ঞানিক, জ্যোতি-বিজ্ঞান সাধনা করেন এবং আল-মাজেস্টের আরবী অনুবাদ করেন।

সনদ ইবনে আলী (মৃত্যু ৮৬৪ খৃস্টাব্দ) ঃ তিনি প্রথমে য়াহুদী ছিলেন। পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর কতগুলো মূল্যবান প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। ত্রিকোনমিতি প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্র ছাড়াও তিনি পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন।

আল-হাজ্জাজ (মৃত্যু ৮৩৫ খৃস্টাব্দ) : তিনি সর্বপ্রথম ইউক্লিডের সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদ কর্ম প্রথমত খলীফা হারুনুর-রশীদ এবং দ্বিতীয়বারে খলীফা আল-মামুনের আনু-কূল্যে কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়। বিশেষভাবে তাঁরই অনুবাদের মার-ফত আরব বৈজ্ঞানিকগণ শুদ্ধ জ্যামিতির সংস্পর্শে আসেন। ৮২৯-৩০ খৃস্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথম টলেমির আল-মাজেস্ট 'কিতাব আল-সাজিগতি' নাম দিয়ে আবরী ভাষায় অনুবাদ করেন। বর্তমান পৃথিবীতে 'আল-মাজেস্ট' নামক আরবী নামটি তাঁরই প্রবর্তিত।

আল-আব্বাস ঃ ৮২৯ থেকে ৮৩৩ খৃস্টাব্দে বাগদাদের মানমন্দিরে আস্তারলবী প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে গবেষণা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতির তিনি ভাষ্য রচনা করেন। জ্যামিতিতে যে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল, এই ভাষ্য রচনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

আল-জুরজানি ঃ অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরেই জ্যামিতির প্রতি তিনি বেশী আকৃষ্ট হন এবং জ্যামিতির বিভিন্ন সমস্যার উপর ব্যাপক আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মূল মধ্য রেখা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর জিজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলেও তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। তিনি সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

হুসায়ন ইবনে ইসহাক (৮০৯-৮৭৩) ঃ ইরাকের হীরা নগরীতে তিনি এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্যে অতি

www.pathagar.com

অল্প বয়সেই শিক্ষার ও প্রতিভা বিকাশের রাজকীয় সুযোগ পান। আরবের তৎকালীন অনুবাদকারী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর, তখনই তিনি কতগুলো গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্থ সিরিয়ান ও আরবী ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেন।

যদিও তিনি পেশায় ছিলেন চিকিৎসক, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনেও তাঁর সাধনা ও অনুরাগ ছিল অসাধারণ। বিশেষভাবে দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সুধী মহলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর জীবনের পরম সৌভাগ্য এই যে, অতি অল্প বয়সে তিনি বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের নির্দেশে তিনি প্রথম জীবনেই প্রাচীন বিজ্ঞান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হন। এই থেকেই তাঁর অনুবাদ কার্যের অসাধারণ অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

খলীফা হারুনুর-রশীদ যে বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই বছর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীফা আল-মামুন যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন বৈজ্ঞানিক হুসায়নের বয়স ২৪ বছর। সুতরাং তাঁর জীবনোন্মেষের প্রাক্কালেই তিনি একজন বিজ্ঞানব্রতী খলীফার সংশ্রবে আসেন। বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় ও খলীফা আল-মামুনের আনুকূল্যে তাঁর বিজ্ঞানী জীবনের ১৪ বছর অতিবাহিত হওয়াটা তাঁর জন্যে সৌভাগ্যই ছিল বলতে হবে।

আবার তাঁর জীবনের উপর দিয়ে রাষ্ট্রীয় বিষয়টাও কম দেখা দেয়নি। কিন্তু এতে তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা তেমন ব্যাহত হয়নি। অন্যদিকে মামুনের পর মুতাসিমের ৯ বছর রাজ্য শাসনকালে বিশেষভাবে মুতাসিমের পরবর্তী উদার খলীফা ওয়াসিকের ৪ বছরেব রাজত্বকালে তাঁর সাধনায় রাজকীয় উৎসাহের অভাব ছিল না।

আমরা এখন এমন একজন আব্বাসীয় খলীফার নাম বলব, যার নিষ্ঠুর শাসনে আব্বাসীয় বংশের পতনের সূচনা ঘটে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর খলীফা মুতাওয়াক্কিলও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতিশয় মহান ও উদার ভূমিকা পালন করে গেছেন।

রাজ্য শাসনে নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি য়াহূদী, খৃস্টান, হিন্দু বিজ্ঞানীদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং

www.pathagar.com

তাঁদের খুঁজে এনে তাঁর রাজদরবারে স্থান দিতেন। বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করে জনগণের মধ্যে সহজবোধ্য করে তোলার জন্যে তিনি একটি অনুবাদ কার্যালয় স্থাপন করেন এবং এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বৈজ্ঞানিক হুসায়নের উপর। হুসায়ন যথাসাধ্য যত্ন সহকারে তাঁর বৈজ্ঞানিক সততা রক্ষার চেষ্টা করেন। খুব ভাল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা, মূল বই-এর সাথে যাতে অনৈক্য না থাকে, এজন্যে অনূদিত পুস্তক স্বয়ং সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখে দেওয়া ইত্যাদি কার্যে তিনি তাঁর কর্তব্য বিশেষ-ভাবে সম্পাদন করতেন। তিনি অন্যের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতেন না। নিজেও অসাধারণ কর্মতৎপর ছিলেন। তাঁর অনুবাদ আন্দোলন আরব বিজ্ঞান জগতে অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

তিনি নিজে ৯৫টি গ্রন্থ সিরিয়ান এবং ৩৯টি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্যালেন, এরিস্টটল, ডিস কোরাইডিস, টলেমি প্রমুখের অনূদিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; চিকিৎসক হিসাবে তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রীয় অনুবাদ গ্রন্থগুলিও ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

অনুবাদ বাদে তাঁর নিজস্ব অবদানও ছিল অনন্য। চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিবিজ্ঞান জোয়ার ভাটা, উল্কাপাত, রংধনু নিয়ে তিনি ব্যাপক পর্যালোচনা করেন।

ইসহাক ইবনে হুসায়ন (মৃত্যু ৯১০ খৃস্টাব্দ): হুসায়নের পুত্র দ্বিতীয় হুসায়ন। তিনি পিতার মতই বিজ্ঞানানুরাগী ছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি, ড্যাটা, আল-মাজেস্ট, আর্কিমিডিসের গোলক, ম্যানিলসের Spheries আরবীতে অনুবাদ করেন। এরিস্টটল প্রমুখের কয়েকটি গ্রীক দার্শনিক গ্রন্থও আরবীতে অনুবাদ করেন। গ্রীক এবং আরবী এই দু'টি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ও জটিল ভাষায় তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য।

আল-আরজানি (মৃত্যু ৮৫২—৫৩ খৃস্টাব্দ): খলীফা মুতাজিদের মন্ত্রী ওবায়দুল্লাহর অধীনে কর্মরত থেকেও তিনি সেকালে জ্ঞানী-গুণী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ওমর খৈয়ামের স্ব-গ্রাম নিশাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দ্বারাই নিশাপুরের প্রথম প্রসিদ্ধির সূত্রপাত হয় এবং হয়ত পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা থেকেই ওমর

www.pathagar.com

খৈয়াম বৈজ্ঞানিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। আল-আরজানি ইউক্লিডের দশম পুস্তিকার একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যই তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।

আল-সিফসি (মৃত্যু ৮৮৩ খৃস্টাব্দ): তিনি এপোলোনিয়াসের প্রথম চারটি পুস্তকের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের উৎস ছিল আবু জাফর মুহাম্মদের অনুপ্রেরণা।

আল-ফজল (মৃত্যু ৮১৫—১৬ খৃস্টাব্দ): রাজ-জ্যোতিষী নও-বখতের পুত্র। এক সময় তিনি খলীফা হারুনুর-রশীদের লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। সেখানে থেকেই তিনি বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। খলীফার আদেশে বহু পারসী বিজ্ঞান গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি কতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর একটি জ্যোতিষ গ্রন্থ জিরার্ড ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। এই অনূদিত গ্রন্থের ল্যাটিন নাম হলো, 'Liber Alfadhal-i-est arabe de bechi'।

আহমদ ইবনে ইউসুফ (মৃত্যু ৯১২ খৃস্টাব্দ): তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান, Proportion সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই বইটি ইউরোপের রেনেসাঁয় খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইটালীর পণ্ডিত লিউনার্দো ও জউপাসের ল্যাটিন অনুবাদের মারফতেই ইউরোপে এটি ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। তিনি ম্যানিলসের ত্রিভুজ খণ্ডন সম্পর্কিত উপপাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। টলেমির একটি পুস্তকের ভাষ্যও তিনি লিখেন।

www.pathagar.com

মুসলিম মনীষার অবদান

আল-বাত্তানী

জন্ম ৮৩৮ খৃস্টাব্দ, হি. ২৪৪, মৃত্যু ৯২৯ খৃস্টাব্দ, হি. ৩১৭)।

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত বাত্তানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি বাত্তানী নাম ধারণ করেন। শৈশবেই আল-বাত্তানীর শিক্ষা কার্য নিখুঁতভাবে শুরু হয়। মাত্র ২০ বছর বয়সেই তিনি জ্যোতিবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসাবে সুধীমহলে স্থান লাভ করতে সক্ষম হন।

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ৫ বছর। এর পরই ঘন ঘন ক্ষমতার উত্থান-পতন ও খলীফা রদ-বদলের মধ্য দিয়ে আব্বাসীয় বংশের পতন-যুগ শুরু হয়। তা সত্ত্বেও কোন খলীফাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। জ্ঞান সংগ্রহ ও জ্ঞানী-গুণীদের কদর দান তাঁদের নেশায় পরিণত হয়ে পড়েছিল।

বাত্তানীকে অতি তরুণ বয়সেই খলীফা কর্তৃক সিরিয়ার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হতে হয়। তবু তিনি রাজকার্যে ব্যাপৃত থেকেও বিজ্ঞান সাধনার ক্ষতি করেন নি এবং জ্যোতিবিজ্ঞান ও ত্রিকোন-মিতির ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবনীর স্বাক্ষর রাখেন এবং রাজধানী এন্টিয়োক ও য়াক্কা থেকে জ্যোতিবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ কার্য চালাতেন। তিনি অক্ষরমালাকে সংখ্যার প্রতীক হিসাবে ব্যবহারমূলক একটি 'জিজ' তালিকা তৈরী করেন। এটি ইউরোপীয় পণ্ডিতের দ্বারা অনূদিত হয়ে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

জ্যোতিবিজ্ঞান তালিকা, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি-প্রকৃতি, গ্রহণ ও সৌরজগত সম্বন্ধে তাঁর সঠিক তথ্য কেবল অভিনবই নয়, জ্যোতিবিজ্ঞানে পূর্বতন বৈজ্ঞানিকদের বহু ভুলও তিনি সংশোধন

www.pathagar.com

করেন। টলেমি ও হিপারকাশ নক্ষত্রের Longitudinal motion সম্পর্কে যে ভুল করেছেন, তা দেখিয়ে দেন।

বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ই সর্বপ্রথম সূর্যের অক্ষগতি (অপভু-অনুভূ) সম্পর্কে সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেন। বাত্তানী নতুনতর যন্ত্রপাতির সহায়তায় পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করেন যে, সূর্যের অক্ষগতি সম রাত্রি দিনের প্রাগায়নের উপর এতে মুসা ভ্রাতৃ মতবাদ আরো অভ্রান্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এতদিনকার সূর্য সম্পর্কে টলেমির প্রতিষ্ঠিত মতবাদ নস্যাৎ হয়ে যায়।

বাত্তানী তাঁর নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্র দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, সূর্য স্থির নিশ্চয় স্থবির বলে উল্লিখিত এতদিনকার প্রচলিত টলেমির মতবাদটি সত্য নয়। সূর্য তার নিজস্ব কক্ষে গতিশীল। বাত্তানী যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, টলেমির সময় থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত সূর্যের তুঙ্গত্ব ১৬'৪৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সূর্য স্থির নিশ্চল নয় এবং তার নিজস্ব কক্ষে গতিশীল।

টলেমির প্রচারিত আরও কয়েকটি মতবাদ বাত্তানী ভুল প্রমাণ করেন। তন্মধ্যে সূর্যের আপাত কৌণিক ব্যাসরেখা পরিবর্তন অন্যতম।

সূর্যের অপভু সম্বন্ধে টলেমির মতবাদে ভুল ধরা পড়ায় বাত্তানী অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেরও গতির অসমতা সম্পর্কে নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এর ফলে টলেমির তালিকার পরিবর্তে তিনি নতুন-ভাবে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন।

সহজ সুন্দর নবতর নিয়ম অনুসারে অমাবস্যার সঠিক গণনা প্রচলনকারী হিসাবে বাত্তানী জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত।

৮৮০—৮১ খৃস্টাব্দে বাত্তানীর পর্যবেক্ষণের ফলে যেসব নক্ষত্র স্থির বলে প্রমাণিত হয়, তার একটি তালিকা দেখতে পাওয়া যায় তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকায়।

এ পর্যন্ত ত্রিকোনমিতি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যকারী পর-নির্ভরশীল পরগাছা বিশেষ। এর স্বাধীন স্বরূপ দানের চিন্তা ইতি-পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। বাত্তানীই প্রথম ত্রিকোনমিতির সম্পূর্ণ স্বাধীন

www.pathagar.com

স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্তও হন। এ যে একটি স্বয়ং স্বাধীন বিজ্ঞান— একথা প্রথম আবিষ্কার করেন আল-বাত্তানী। বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন এর প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। বাত্তানীর অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে নির্জীব ত্রিকোনমিতি সজীব হয়ে ফুঠে উঠে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণও বাত্তানীর নব অবদান প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এদিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়তে থাকেন।

সাইন, কোসাইন ট্যানজেন্ট, কো-ট্যানজেন্ট প্রভৃতি ত্রিকোনমিতির সহজ সুন্দর সাংকেতিক নিয়মগুলো ব্যবহার উপযোগী বৈশিষ্ট্যময় করে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারটা বাত্তানীর পূর্বে কেউ ভাবতেও পারেন নি। ত্রিকোনমিতির সমস্যা সমাধানে টলেমি Chords ব্যবহারে যে উপপাদ্যের সাহায্য নিয়েছিলেন, তা এমন জটিল ও দুর্বোধ্য ছিল যে, মানুষ তা অর্থহীন মনে করে এর ধারে কাছেও আসতে চাইত না। বাত্তানী ত্রিকোনমিতিতে আরবী শব্দ 'জাইব' (বক্র) ব্যবহার করেন। জাইবের ল্যাটিন অনূদিত অর্থ 'Sinus' থেকেই 'Sine' (সাইন) শব্দের উৎপত্তি হয়। আরবদের আবিষ্কৃত ছায়াঘড়ির উপরের সমতলস্থ ছায়ার ধারণা থেকে কোট্যানজেন্ট এবং উপরস্থ ছায়ার ধারণা থেকে ট্যানজেন্টের শাব্দিক অবয়বের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ত্রিকোনমিতির এই শব্দগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের গোড়ায় রয়েছেন আল-বাত্তানী। সাইন, কোসাইনের সঙ্গে ট্যানজেন্টের সম্পর্ক বাত্তানীই প্রথম আবিষ্কার করেন। ত্রিভুজের বাহুর সঙ্গে কোণের ত্রিকোনমিতিক সম্বন্ধও তাঁরই আবিষ্কার।

বাত্তানীর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অন্যান্য পুস্তকের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। যে ৪টি গ্রন্থ তাঁর পরিচয় বহন করে, তাও শুধু জ্যোতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত। তবু বাত্তানীর পুস্তক গ্রন্থাবলী নিম্নে সংক্ষেপাকারে উল্লিখিত হলো ঃ

১. "কিতাব মারেফাতে মাতালী আল-বুরুজ ফি মা বায়না আরবা আল ফালাক" অংকের সাহায্যে জ্যোতিবিজ্ঞানের সমাধান।

২. 'রিসালা ফি তাহকিক আবদার আল-ইত্তিসালাত'-এ গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি সম্পর্কে ত্রিকোনমিতিক সমাধান।

www.pathagar.com

৩. 'সাবাহ আল-মাকালাত আল-আরবা নিকাতমিয়াম' টলেমির টেট্রাবিবলসের ভাষ্য।

৪. 'আজ-জিজ' জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ ও তালিকা। উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে এই বইটিই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থটি প্লেটো টিবারটিনুজ ও রেজিওমণ্টেনাস কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। বাত্তানী আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্তের ত্রিকোনমিতির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। এতে তাঁর নিজস্ব অবদান বৈশিষ্ট্য ছিল সমধিক।

এই গ্রন্থটি শুধু যে আরব বৈজ্ঞানিকদেরকেই অনুপ্রাণিত করেছিল তাই নয়, ইউরোপের নবজাগরণে এই পুস্তকটি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর প্রমাণ হিসাবে বলা যেতে পারে—ক্যাস্টাইলেব দশম আলফানসো এর ল্যাটিন অনুবাদে তুষ্ট না হয়ে মূল আরবী থেকে স্পেনীয় ভাষায় পুনরানুবাদ করেন।

ইউরোপে বিকৃত নামে যে কয়েকটি পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলোও বাত্তানীর বলে মনে করা হয়। যেমন প্রণেতাদের ল্যাটিন নাম বেথেস কোয়েলিয়েন বেরেনী প্রভৃতি।

আল-বাত্তানীর পিতা বা পূর্বপুরুষ জাবির ইবনে সিনান আল-হাররানী জ্যোতির্বিজ্ঞানের কুশলী যন্ত্রবিদ ছিলেন। আল-বিরুনীর মতে জাবিরই সর্বপ্রথম গোলাকার আস্তারলব প্রস্তুত করেন।

আর-রাযী

(জন্ম ৮৬৪ খৃস্টাব্দ, হিজরী ২৫০; মৃত্যু ৯২৫ খৃস্টাব্দ, হিজরী ৩১৩)।

পারস্যের রাই নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তখন অযোগ্য নেতৃত্বের জন্যে সাম্রাজ্য বহু ভাগে বিভক্ত। যেমন ঘন ঘন খলীফা বদল হতো তেমনি যথাতথা স্বাধীন রাজ্যও গড়ে উঠত। পারস্যের রাই অঞ্চলেও একজন এমনি ধরনের স্বাধীন সুলতান ছিলেন।

'রাই' নগরীতে আর-রাযী অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদিতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন কার্য সমাপ্ত করেন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তাঁর প্রথম ছিল না। ঘটনা বৈচিত্র্যে প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমান্বয়ে তিনি এদিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রথমত চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দান করে, দেশ-বিদেশে তরুণ বয়সেই অতি দ্রুত সুবিখ্যাত হয়ে পড়েন। চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকেই তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্তি শুরু হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগের কারণ মূলে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। তৎকালে বাগদাদে এক অভিনব রোগ দেখা দিলে বাগদাদ হাসপাতালের চিকিৎসকগণ সেই রোগের এক অদ্ভুত নিরাময় পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

এতে তিনি চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ডাক্তারদের নিকট সবিস্তারে তা জেনে নেন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে উৎসাহিত হন। দ্বিতীয়ত একবার রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস শরীরে প্রবেশ করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে তিনি তখন জনৈক অভিজ্ঞ হেকিমের শরণাপন্ন হন। তাঁর আরোগ্যলাভ দ্রুত হয় বটে, কিন্তু হেকিম সাহেব তাঁর নিকট সাড়ে ৩ হজার টাকা পারিশ্রমিক দাবি করেন। বিষয়টি তার মনে ভাবান্তর ঘটায়। অতঃপর তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে এত খ্যাতি অর্জন করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্‌র চিকিৎসার জন্যে সদাসর্বদাই তাঁকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো।

প্রথমেই তিনি রাইর সুলতানের রাজকীয় চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং তাঁর হাসপাতালের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

রাযী তখনকার মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে সুবিখ্যাত ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর উদ্ভাবিত অনেক অবদান এখনও সযত্নে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর বহু গ্রন্থ প্রামাণ্য হিসেবে সমাদৃত হয়। রসায়নশাস্ত্রে তিনি অনেক নতুন বিষয় প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে প্রতীক চিহ্নাদি অন্যতম। তাঁকে বর্তমান রসায়নশাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্তকও বলা যেতে পারে। অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। জ্যোতিবিজ্ঞান, জ্যামিতির উপরেও কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বল-বিজ্ঞানে, ওজন সম্বন্ধীয়

www.pathagar.com

একমাত্র 'মিজান তাবিই' ছাড়া তাঁর আর কোন গ্রন্থেরই সন্ধান পাওয়া যায় না।

এছাড়াও পদার্থবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর অনেকগুলোই বর্তমানে বিলুপ্ত। তিনি মোট একশত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মিনাস ইবনে সাবিত (মৃত্যু ৯৪৩ খৃস্টাব্দে)

পূর্বোল্লিখিত সাবিত ইবনে কোরার বিজ্ঞান প্রতিভা বংশানুক্রমিকভাবেই চলছিল। মিনাস ইবনে সাবিত ছিলেন সাবিত ইবনে কোরার পুত্র। ইবনে সাবিতও পিতার ন্যায় চিকিৎসা বিদ ছিলেন। অতি অল্পকালেই তিনি উচ্চস্তরের চিকিৎসক বিখ্যাত হয়ে পড়েন। এজন্য খলীফা আল-মুতাকিদ তাঁকে আল-কাহির ও আর-রাযীর চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। প্রয়াসে এবং খলীফার আনুকূল্যে দেশে হাতুড়ে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়। তৎকালীন মেডিকেল বোর্ডের এক কঠোর পরীক্ষায় চিকিৎসকদের পাস করতে হতো। তিনি তাঁর যোগ্য সদস্য হিসাবে প্রায় ৮০০ শত চিকিৎসককে ডিপ্লোমা প্রদান করেন। পিতার ন্যায় তিনি জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছিলেন। আর্কিমিডিসের কতগুলো পুস্তক তিনি সিরিয়ান ও আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইবরাহিম ইবনে সিনান (৯০৮—৯৪৬)

মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। তিনি সাবিত ইবনে সিনানের পুত্র এবং সাবিত ইবনে কোরার পৌত্র। পিতা ও দাদার ন্যায় তিনিও ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। এতদসত্ত্বেও তিনি বিজ্ঞান নিয়ে সদা নিমগ্ন থাকতেন। কণিক ও সূর্যঘড়ি প্রস্তুত সম্বন্ধে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কণিকে প্রথম পুস্তকের এবং আল-মাজেস্টের ভাষ্য লিখেন। জ্যামিতি ও ত্রিকোনমিতি সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন।

অধিবৃত্তের সমপরিমাণ বিশিষ্ট বর্গ ক্ষেত্রফল বের করতে তিনি যে প্রণালী আবিষ্কার করেন, অঙ্কশাস্ত্রে তা উচ্চস্তরের অবদান।

www.pathagar.com

আর্কিমিডিসের প্রচলিত প্রণালী থেকেও তা সহজ ও নানা দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল।

আল-ফারাবী (৮৭০—৯৫০)

তখনকার দিনে দর্শন ও ঔপপত্তিক বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আল-কিন্দির ন্যায় তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান তাঁকে মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে প্রশংসা করেন। বিশেষভাবে দর্শনের জন্যই তিনি পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে দ্বিতীয় এরিস্টটল বলা হতো। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সপ্তগ্রামের সুরের মধ্যে ভগ্নাংশের আধিপত্যের অনুসন্ধিৎসা তাঁকে অঙ্কশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করে। আরব সঙ্গীতের নিয়মাবলী ভগ্নাংশে প্রচলিত। তিনি আল-কিন্দির মত বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সঙ্গীত-বিদ্যা গ্রন্থের নাম 'কিতাবু আল-মুনিকি'। উচ্চস্তরের সঙ্গীত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনাই এর বৈশিষ্ট্য।

তিনি এরিস্টটলের বহু গ্রন্থের ভাষ্য লিখেন। তন্মধ্যে পদার্থ-বিদ্যা, ভূ বিদ্যা, জ্যোতিবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো সুপ্রসিদ্ধ। টলেমির আল-মাজেস্টেরও তিনি ভাষ্য লিখেন। ভিটিরিয়াসের মতে, তিনি আরো আট-দশটি গ্রন্থ-লিখেন। তন্মধ্যে 'বিজ্ঞান রত্ন' (রিসালা ফুমাস আল-হিকাম) 'আদর্শ নগরী' (রিসালা ফি সাবাদি আরা আহ্‌লোন মদীনা ওয়া আল-ফাজিনা) 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' (কিতাব ইহ্‌ইয়া আল উলুম বা Encyclopaedia of Science সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

তুর্কীস্তানের ফারাবের নিকট জন্মগ্রহণ করায় তাঁর নাম ফারাবী। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। বাগদাদে ইবনে ইউনুস নামক জনৈক বিখ্যাত দার্শনিকের নিকট লজিক শিখেন। তিনি জাতিতে তুর্কী থাকায় প্রথমত আরবী জানতেন না, পরে শিখেন।

এই সময় আলেপ্পোর বাদশাহ্ সাইফুদ্দৌলা তাঁর গুণগান শুনে রাজ দরবারে ডেকে এনে আজীবন সভাসদ হিসাবে গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

প্রথম সাক্ষৎকারেই ফারাবী তাঁর নিজ গুণ বলে বাদশাহ্‌কে গুণমুগ্ধ করে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। এই দিনই প্রকাশ পায় যে, তিনি ৭০টি ভাষা জানেন এবং পরিশেষে বাদশাহ্‌র উস্তাদগণ তাঁকে যখন সঙ্গীত শোনাতে থাকেন, তখন তিনি তাঁদের সেই সঙ্গীতের ত্রুটি নির্দেশ করেন। তিনি গানও জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় ফারাবী কোমরবন্ধ থেকে একটি ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র বের করে একটি গান শুরু করেন তাঁর সে গান শুনে সবাই উৎফুল্ল হয়ে হাসতে থাকেন। দ্বিতীয় রাগিনীটি এমন করুণ সুরে গান যে, সবাই বেদনা-বিধুর হয়ে কাঁদতে থাকেন। তৃতীয় গানটি এমন উদাস কণ্ঠে গান যে, তা শুনে সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভা ছিল এমনি অসাধারণ।

আল-নাইরেজী (মৃত্যু ৯২৩ খৃস্টাব্দ)

অঙ্কশাস্ত্রের জ্যামিতির প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি আল-বাত্তানীর সমসাময়িক ছিলেন। বাত্তানীর প্রভাবে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার দিকেও ঝুঁকে পড়েন।

তিনি জ্যামিতির উপরে মৌলিক অবদানমূলক বহু প্রবন্ধ লিখেন এবং ইউক্লিডের ভাষ্য, গ্রন্থ রচনায় তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জিরার্ড এই গ্রন্থটির ল্যাটিন অনুবাদ করেন এবং ইউরোপের জ্যামিতি জগতে এই গ্রন্থটি ইউরোপের নব জাগরণে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। টলেমির ভাষ্য গ্রন্থ প্রণয়নও এই মনীষীর অন্যতম কীর্তি। খলীফা আল-মুতাজিদের উৎসাহে তিনি নৈসর্গিক ঘটনা বিচিত্র বর্ণনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর একটি চমৎ-কার গ্রন্থ অচনা করেন। সূর্যঘড়ি ও ত্রিকোনমিতি নিয়েও আল-ফারাবী গবেষণা করেন এবং গোলাকার আস্তারলব সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান ৪ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। আরবী ভাষায় এই গ্রন্থটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি কিছুদিন পূর্বে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদ গ্রন্থটির নাম Schoy Abhaudlung von al Nairizi uber die Richtungder gibla uberstytun dealantart.

www.pathagar.com

তিনি পারস্যের সিরাজের নিকটবর্তী নাইরেজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করায় 'নাইরেজী' উপাধি গ্রহণ করেন।

আবুল ওয়াফা

(জন্ম ১০ জুন, ৯৪০ খৃস্টাব্দ, হিজরী ৩২৮, রমযান ১লা ; মৃত্যু জুলাই, ৯৯৮ খৃস্টাব্দ, রজব, হিজরী ৩৮৮)

তিনি অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিবিজ্ঞান ও ত্রিকোনমিতিতে পারদর্শী ছিলেন। শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের উপর বেশী জোর দেওয়ায় তিনি এক্ষেত্রে বেশী সাফল্য লাভ করেছিলেন। আল-বাত্তানীর পরে যে বিজ্ঞান ৪০ বছর পর্যন্ত মৃতপ্রায় ছিল, তা তাঁর দ্বারা পুনরুজ্জীবন লাভ করে। বাত্তানীর অসমাপ্ত কার্য এবং মঁসিয়ে মেডিলোর মতে টলেমির চন্দ্র সম্বন্ধীয় গণনার অসম্পূর্ণতা পুরণের উদ্দেশ্যে তিনি নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা শুরু করেন। কেন্দ্র ও স্থানচ্যুতির সমীকরণ তাঁরই অবদান। এর পূর্বে কেউ তা জানতেন না। গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অসমতা জানতেন কিন্তু চন্দ্রের তৃতীয় অসমতা তাঁরই আবিষ্কার। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। এমন কি তাঁর মৃত্যুর পর ৬ শত বছর পর্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের তা উপলব্ধিরও বাইরে ছিল।

আধুনিক Astronomy-তে এই অসমতা Variation নামে উল্লেখ করা হয়। মঁসিয়ে মেডিলোর মতে আবুল ওয়াফাই এর সর্বপ্রথম আবিষ্কারক। আল-বাত্তানীর স্বপ্ন আবুল ওয়াফার দ্বারাই বাস্তবায়িত হতে থাকে। পূর্বেকার অস্ফুট ত্রিকোনমিতি ক্রমশ পূর্ণায়নের দিকে এগিয়ে চলে। এর উপপাদ্য, প্রমাণ, প্রমাণিত বিষয়াদি সুষ্ঠু নিয়মে প্রচলন করেন আবুল ওয়াফা। দুই কোণের সাইনের সমষ্টি যে সাইন ও কোসাইন দ্বারা নির্ণয় করা যায়, তা প্রথম উদ্ভাবন করেন তিনি। বর্তমান ত্রিকোনমিতির ফরমূলা—

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

ত্রিকোনমিতির প্রায় প্রাথমিক শিক্ষা—কিন্তু আবুল ওয়াফার পূর্ব সম্বন্ধে পর্যন্ত অঙ্কশাস্ত্রবিদদের এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাসও যে এই সহজ ফরমূলাটি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন, তা তাঁর রচনা থেকেই বোঝা যায়। ওয়াফা গোলকীয় ত্রিভুজের সঙ্গে কোণের সাইন প্রভৃতির সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপন করে ত্রিকোনমিতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন। তিনি সাইনের তালিকা প্রস্তুতের এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। বাত্তানীর অসমাপ্ত কাজ তিনি দুই কোণের সমষ্টির সাইন কোণের অর্ধাংশের সাইনের বর্গের সঙ্গে কোসাইনের সম্বন্ধ কোণের সাইনের সঙ্গে সেই কোণের অর্ধেকের সাইনের ও কোসাইনের সম্বন্ধ যুক্ত প্রথম ত্রিকোনমিতিরও তিনিই প্রবর্তক। ত্রিকোনমিতিতে প্রচলিত ছয়টি সংখ্যায় পরস্পরের মধ্যে যে সাধারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তিনি সেটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রচলন করেন। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ফরমূলা এই সাধারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

তিনি ইউক্লিডের একটি ভাষ্য লিখেন জ্যামিতিতে নানা উপপাদ্য ও সম্পাদ্যের অভূতপূর্ব সমাধানে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয়ের মধ্যে এ-ও অতি বিস্ময়কর যে, তিনি কোথাও ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি।

গ্রীক ভারতীয় অনুকরণের দরুন এতকাল বিশুদ্ধ জ্যামিতিক আলোচনার অবসর মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের হয়ে উঠেনি। বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় ও আবুল ওয়াফাই প্রথম বিশুদ্ধ জ্যামিতির গবেষণায় ব্রতী হন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর হস্তলিখিত আরবী ভাষার গ্রন্থটি অধুনা লুপ্ত। তাঁর ছাত্রের রচিত এর পারসী অনুবাদ গ্রন্থটিই তাঁর প্রমাণ পুস্তক হয়ে আছে। এই গ্রন্থে জ্যামিতির অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলো অতি সহজতর করে প্রকাশের নবতম পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে।

কণিকে অধিবৃত্তের অঙ্কন ক্ষেত্রফল স্থিতিকরণ ও ঘনফল নির্ণয় সম্বন্ধে তিনি অনেক উন্নত আলোচনা করেন। বীজগণিতে ডাওফেন্টের অনুবাদের মধ্যে তার অসাধারণত্বের প্রমাণ রয়েছে। ঐতিহাসিক ত্যাজোরীর মতে তিনিই গ্রীক গ্রন্থের সর্বশেষ অনুবাদক। তাঁর পরে আর গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ হয়নি।

তিনি আল-খাওয়ারিজমীর বীজগণিতের একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রার সমীকরণের কিছুটা আলোচনা করেন।

www.pathagar.com

অন্যান্য আরব বৈজ্ঞানিকের মতো আবুল ওয়াফারও লিখিত বহু মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল আবুল ফারদাসের ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ ছাড়া তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর যে যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, তা হলো ঃ

১ অঙ্কশাস্ত্রীয় পুস্তক 'কিতাব ফি মাইয়াহ্তাজ ইলায়হি আল-কুত্তাব ওয়াল ওম্মান ইলমুল হিসাব' ব্যবসা সংক্রান্ত পুস্তক।

২. 'আল কিতাবুল কামিল'। এই গ্রন্থের কতকাংশ ক্যারা দ্য গে কতৃর্ক ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছে।

৩. 'কিতাবুল হান্দামা' ব্যবহারিক জ্যামিতি।

৪. 'কিতাবুল মানাজিল ফিল হিসাব'অঙ্কের ক্রমিক স্তরের পুস্তক।

৫. 'কিতাবুল মাদখিল' অঙ্কশাস্ত্র।

৬. 'কিতাবুল বারাহিন ফিল কাদায়া ফি মা স্তামখাস্ত দাওয়ো-ফালতোম ফি কিতাবিহ্'।

৭. 'কিতাবুল ইমতিখরাজ··· '।

৮. আল-মাজেস্ত।

৯. Sexagesimal-এর তালিকা গ্রন্থ।

দশম শতাব্দীতে বাত্তানী ও ওফাই যুগস্রষ্টা। তাঁদের প্রভাব কাটিয়ে উঠে কেউ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেন নি। এই শতককে ত্রিকোনমিতির যুগও বলা যেতে পারে। কারণ এই যুগে ত্রিকোনমিতির যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল, পূর্ববর্তী সময়ে তা হয়নি।

আল-খাজিম (মৃত্যু ৯৭১ খৃস্টাব্দ)

তিনি আবিষ্কার কিছু না করলেও বীজগণিতের মধ্যে তাঁর কৃতিত্ব হলো ত্রৈয়োমাত্রিক সমীকরণ বা আল-মাহানীর সমীকরণটির সমাধান। তিনি যেভাবে সমাধান করেছেন তাতে তাঁর মৌলিকত্বের প্রমাণ রয়েছে। তিনি যে যুগ-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি জ্যামিতির আলোচনা করেন এবং ইউক্লিডের দশম গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। অঙ্কের অন্যান্য বিভাগেও নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়নও তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তি।

www.pathagar.com

ইউসুফ আল-ঘুরী

তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী প্রধানত শুদ্ধ অনুবাদেই সিদ্ধ। আর্কিমিডিসের অধুনা-লুপ্ত ত্রিভুজ সম্বন্ধীয় ও গ্যালেনের গ্রন্থ অনুবাদ করেন। প্রথম অনুবাদ গ্রন্থটি মিনাল ইবনে সাবিত ইবনে কোরা এবং দ্বিতীয়টি হুসায়ন ইবনে ইসহাক পুনসংস্কার করেন। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বই তিনি অনুবাদ করেন।

হামিদ ইবনে আলী

ইবনে ইউনুসের মতে আলী ইবনে ঈসা এবং হামিদ ইবনে আলী এই দুই জন আস্তারলব ইত্যাদি যন্ত্র নির্মাণ কার্যে গ্যালেন এবং টলেমির সমতুল্য ছিলেন। এতে প্রমাণ হয়—এঁদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ কুশলতা খুবই উন্নত ধরনের ছিল।

আল-খাসিব

তিনি আরবী এবং পারসী ভাষাতে কয়েকটি বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ও হিব্রুতে অনূদিত হয়ে বইগুলো ইউরোপে খুবই সমাদৃত হয়।

ইবনুল আদামী

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ঔপপত্তিক উপক্রমণিকা লিখেন। কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্য তিনি তা সমাপ্ত ও প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। পরে ছাত্র হিকাম আল-মাদানী পুস্তকটিকে 'নজমুল ইক্দ' (পরিমার্জিত মুক্তার হার) নাম দিয়ে ৯২০—২১ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

ইবনে আমাজুর (জন্ম ৮৮৫— খৃস্টাব্দ)

তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে উচ্চস্তরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন, তা পরবর্তী বৈজ্ঞানিক কর্তৃক তাঁর পর্যবেক্ষণের নির্ণয় ফলের দৃষ্টান্ত ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইবনে ইউনুস তাঁর পুস্তকে ইবনে আমাজুরের নির্ণীত অনেক তথ্য উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

আমাজুর তুর্কীস্তানের ফারগানা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে উদাসীন থেকে পরিণত বয়সে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণায় এত ঝোঁক চাপে যে, তাঁর উপযুক্ত পুত্র আবুল হাসান আলীকেও এ পথে টেনে নিয়ে আসেন। এমনকি তাঁর পুত্রের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ক্রীতদাস মুফ-লিহকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেদের সহকারী হিসাবে নিয়োজিত করেন। পিতা, পুত্র ও ক্রীতদাসের এই বৈজ্ঞানিক গ্রুপকে 'বনি আমাজুর' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদের প্রণীত অনেকগুলো জ্যোতিবিজ্ঞান, সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও তালিকার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'আল-খালিস' (বিশুদ্ধ 'আল-মুজন্নর' (পরিবেষ্টিত), 'আল-বদি' (আশ্চর্যজনক) এবং মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধীয় তালিকাগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এগুলোতে পারসী কাল গণনার নিয়ম ব্যবহৃত হয়।

আবু উসমান

খলীফা মুকতাদিরের (৯০৮—৯৩২) রাজত্বকালে তিনি যোগ্য চিকিৎসক হিসাবে মক্কা-মদীনার হাসপাতালগুলোর চিকিৎসক ও পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তিনি উৎকৃষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও অনুবাদক ছিলেন। প্যাপাসের ভাষ্য ও ইউক্লিডের দশম পুস্তকের অনুবাদই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

আবু জাইদ (মৃত্যু ৯৩৪ খৃস্টাব্দ)

তিনি আল-কিন্দির শিষ্য। 'ফিহরিস্ত' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাঁর বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায়। অন্যটি হল 'মুয়ারুল আকালিস' নামক একটি আবহাওয়া সংক্রান্ত পুস্তক বহু ভৌগোলিক মানচিত্র দিয়ে রচিত।

আল-ইমরানী (মৃত্যু ৯৫৪ খৃস্টাব্দ)

তিনি মিসরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবু কামিলের বীজগণিতের ভাষ্য লিখে যশস্বী হন। তাঁর জ্যোতিবিজ্ঞানী গবেষণার কতগুলো

www.pathagar.com

গ্রন্থের মধ্যে একটি দ্বাদশ শতকে বার্সিলোনার মাভা মোউন কর্তৃক 'On the choosing of auspicious days' বা 'শুভ দিবস নির্ণয় বিষয়ক পুস্তক' নামে অনূদিত হয়।

নাজিফ ইবনে ইয়ামন (মৃত্যু ৯৯০ খৃস্টাব্দ)

তিনি ধর্মীয় ইমাম ছিলেন। তাঁর দ্বারা কতগুলো বিজ্ঞান পুস্তক অনূদিত হয়। তিনি আজীবন বিজ্ঞান গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন।

আবুল ফাতেহ

তিনি পারস্যবাসী মনীষী বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম। ইস্পাহানের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি হিমসী ও সাবিত ইবনে কোরার বিজ্ঞান গ্রন্থগুলোর ভাষ্য লিখেন এবং এপোলোনিয়াসের কনিক-এর আরবী অনুবাদ করেন। কনিকের আরবী অনুবাদগুলো সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তাঁর ভাষ্যগুলো এখনও প্রকাশ হয়নি।

আবদুর রহমান সূফী (৯০৩ — ৯৮৬)

অঙ্কবিদ, জ্যোতিবিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বুয়াইদের বাদশাহ্ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী আজদ্দৌলার বন্ধু ও শিক্ষক ছিলেন।

মুসলিম সভ্যতার আব্বাসীয় বংশের পতন যুগে আত্মকলহ ও শাসন ক্ষমতার অস্থিতিশীলতার বা শাসন অযোগ্যতার সূত্রপাত ঘটে। সেই সুযোগে বুয়াইয়া বংশ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগ্যতার বলে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বংশ প্রতিষ্ঠার চার বছর পরেই সুযোগ্য সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক বাদশাহ্ আজদ্দৌলার আবির্ভাব ঘটে। মুসলিম জ্যোতিবিদদের মধ্যে স্থির নক্ষত্রাদি বিষয়ে ও নানা সমস্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি প্রসিদ্ধ হন। গ্রন্থটির নাম হলো 'কিতাবুল কাওয়াকিব আস-সাবিতা আল-মুছাওয়ার' বা স্থির নক্ষত্রাদি বিষয়ক পুস্তক। অনেকে মনে করেন—মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জ্যোতি-র্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে যে তিনটি সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। অন্য দুইটির লেখক হলেন ইবনে ইউনুস ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উগুল বেগ।

www.pathagar.com

আবুল কাশেম (মৃত্যু ৯৮৫ খৃস্টাব্দ)

খলীফা আজদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর বিজ্ঞান সাধনা সাফল্য লাভ করে। জ্যোতিবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক সততাই ছিল তাঁর প্রশংসীয় কার্য। তিনি একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকা পরবর্তী ২ শত বৎসর পর্যন্ত সমাদৃত থাকে।

আল-মাগানি (মৃত্যু ৯৯০ খৃস্টাব্দ)

খলীফার মানমন্দিরে বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ঔপপত্তিক বহুবিদ অবদানের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণ দ্বারা তিনি বিজ্ঞান জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মারভ নগরীর সন্নিকটে মাগানিতে তিনি একটি আস্তারলব প্রতিষ্ঠা করেন। খলীফার মানমন্দিরে জ্যোতিবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো, তার প্রায় সমস্তই তাঁর আবিষ্কার। ঔপপত্তিকতার বিষয়াদির মধ্যে কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করার উপায় উদ্ভাবন তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

আল-কোয়াবিসি

হামদানীর সুলতান সায়ফুদ্দৌলার উৎসাহ ও সহায়তায় তাঁর বিজ্ঞান সাধনা সাফল্য লাভ করে। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল-মাদখাল ইলামিনাত আহকাম আন নজুম' বা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপক্রমণিকা এবং গ্রহসমূহের সর্ব-সূত্রে অবস্থান বিষয়ক Treatise on the Conjunction of the Planets) দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জোহানেস এই দুটি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বৈজ্ঞানিকের প্রথম গ্রন্থ দুটি হিসপালেনসি কর্তৃক অন্যরূপ ইংরেজী নামে অনুদিত হয়। এই অনুবাদটি জোহানেসের ভাষ্যসহ ১৪৭৩ খৃস্টাব্দে বোলোগনায় প্রকাশিত হয় এবং ১৪৮১, ১৪৮২, ১৪৮৫, ১৪৯৯, ১৫২১ খৃস্টাব্দে ভেনিসে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থটিকে ফ্রান্সের গণিতবিদ Dronce five

www.pathagar.com

(১৪৯৪-১৫৫৫) Traite des conjunction de planetes নাম দিয়ে ১৫৫৭ খৃস্টাব্দে প্যারিসে পুনঃ প্রকাশ করেন।

আল-কুহী

বয়াইদ সুলতান জ্ঞানী আজদ্দৌলা (৯৪৯-৯৮৩)-র পরবর্তী সুলতান শরফুদ্দৌলা (৯৮৯-৯৯৮)-র জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দিরে অধ্যক্ষ অথবা গবেষণাকার্য পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত হন।

এই বংশের সুলতান আজদ্দৌলার মৃত্যুর পর শামস-উদ-দৌলা (৯৮৬—৯৮৯) সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই তাঁর ভ্রাতা শরফুদ্দৌলা কর্তৃক বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত হন। ৯ বছর রাজ্য শাসনের পর তাঁর ভ্রাতা বাহা-উদ-দৌলা (৯৯৮—১০১২) শরফ-উদ-দৌলাকেও শাসন মক্ষতা থেকে বিতাড়িত করে ক্ষমতাসীন হন।

উল্লেখ্য যে, রাজ্য ব্যাপী এত যুদ্ধ, ঝগড়া-ঝাঁটি, ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসের মধ্যেও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল আশ্চর্যজনকভাবে সবার ঊর্ধ্বে। এভাবেই বুয়াইয়া বা বুয়াইদ বংশের শাসন ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় আরব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বহু অবদান গড়ে উঠেছিল। এই সাম্রাজ্যে যেসব বিজ্ঞান মনীষী অভ্যুদয় লাভ করেছিলেন, তন্মধ্যে আবদুর রহমান সুফী আল-কুহী আবুল ওয়াফা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ বৈজ্ঞানিকগণ, যাদের 'ইখওয়ানুস সাফাহ' নামে অভিহিত করা হয়, যাঁরা কোন দিন বিজ্ঞান সাধনায় রাজাশ্রয় গ্রহণ করেন নি, তাঁদের অভ্যুদয়ও বুয়াইদ বংশের রাজত্বকালেই হয়েছিল।

বুয়াইদ সুলতান শরফ-উদ-দৌলা ৯৮৯ খৃস্টাব্দে ক্ষমতাসীন হয়ে জ্যোতিবিজ্ঞান গবেষণার জন্যে যে মানমন্দির নির্মাণ করেন, সেই মানমন্দিরের আল-কুহী অধ্যক্ষ বা পরিচালক নিয়োজিত হন।

গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আল-কুহী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জ্যামিতির উপরই তাঁর অনুরাগ বেশি ছিল। আকিমিডিস ও এপোলোনিয়াসের জ্যামিতিক সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর জ্যামিতিক গবেষণায় নিমগ্ন হন। এই গবেষণা থেকেই তৃতীয় ও

www.pathagar.com

চতুর্থ মাত্রা সমীকরণের সমাধানের সমস্যা দেখা দেয়। এর কতকগুলোর অনেকগুলোরই সমাধানে তিনি সাফল্য লাভ করেন এবং সমাধানের পদ্ধতি বের করেন। এর একটি হলো কোন নির্দিষ্ট গোলকের কোন অংশের সমান—Volume অন্য একটি অংশ অঙ্কন করার পদ্ধতি।

মারটনের মতে, আল-কুহীর জ্যামিতিই আরব জ্যামিতির মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ।

বুয়াইদ বংশের উত্থান-পতনে রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রমাণ যা-ই থাক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় শাসকগণ ছিলেন খুবই উৎসাহী।

বিশেষভাবে তাঁদের মধ্যে আজদ-দৌলাই ছিলেন স্বয়ং উচ্চ শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক। ৭৫০ খৃস্টাব্দের পর থেকেই ভারতের সঙ্গে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোগ বিনিময় চলছিল।

৮০৯ খৃস্টাব্দের পূর্বেকার বাগদাদের খিলাফতের মুদ্রা বাংলার একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপের আবিষ্কারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং যে কোন সূত্রে বাংলার সঙ্গে আরবের যোগসূত্র ছিল।

তখন বাংলায়ও জ্ঞানের চর্চা পূর্ণমাত্রায় চলছিল। এতে আরব সভ্যতারও সংস্পর্শ-সংযোগ ছিল কিনা, তা ঐতিহাসিকদের বিবেচ্য বিষয়। বিশেষ শিক্ষাবিদ পণ্ডিত সতীশ দীপঙ্কর (৯৮২—১০৫৪) বাংলার সোনারগাঁয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর তিব্বতে গিয়েও আজীবন জ্ঞানের সাধনা করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

www.pathagar.com

মুসলিম বিজ্ঞানের বেনামীকরণ

আম-মিচ্ছি (৯৫১—১০২৪)

কণিকের বৃত্তের ছেদ-নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা করেন। কোণ ত্রিখণ্ডিত করার পূর্বেকার Kinematical পন্থা বাদ দিয়ে শুদ্ধ জ্যামিতিক সমাধান প্রবর্তন করেন। একটি বৃত্ত এবং সমভুজ হাইপারবোলার অন্তঃছেদ দিয়ে। তিনি এই সমাধানটির যে নাম দেন, তার ইংরেজী দাঁড়ায় 'Mobile Geometry'।

সুলতান আজাদ-উদ-দৌলাহ (৯৩৬ ৯৮৩)

তিনি ছিলেন বুয়াইদ বংশের আমীর। এটাই তাঁর প্রকৃত পরিচয় নয়। তিনি অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যোতিবিজ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি—এটাই তাঁর মূল পরিচয়। বিখ্যাত পদার্থবিদ আবদুর রহমান সুফী ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সুলতান আজদ-উদ-দৌলাহ প্রতি বছর একটি ব্যাপক বিজ্ঞান সভা ডাকতেন। দেশের সর্বস্তরের জ্ঞানী-গুণীগণ এই কনফারেন্সে যোগদান করতেন। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মনোজ্ঞ আলোচনা হতো। সুলতান পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে আলোচনায় যোগ দিতেন।

মুকতাদির বিল্লাহ্ (আবুল ফজর জাফর) নাম ধারণ করে খলীফা হিসাবে ক্ষমতাসীন হন। তিনি যে কেবল বিজ্ঞান সম্মিলনীতেই যোগদান করতেন তা-ই নয়, সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের সাথে মিলেমিশে মানমন্দিরে বসে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ কাজেই তাঁর অনেক সময় কেটে যেত। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞানেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। ধূমকেতুর প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। ধূমকেতু সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

www.pathagar.com

সুলতান শরফ-উদ-দৌলা (৯৮৯—৯৯৮)

তিনি ৯৯৮ খৃস্টাব্দে ভ্রাতা বাহা-উদ-দৌলা কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। পিতা আজদ-উদ-দৌলার মতো তিনিও একদিকে যেমন সমর-নিপুণ সেনাপতি ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক বৈজ্ঞানিক।

শরফ-উদ-দৌলার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি এত আগ্রহ ছিল যে তাঁর রাজপ্রাসাদের উদ্যানে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মানমন্দির থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির পর্যবেক্ষণ কার্য চলত। অনেক সময়ই আমীর স্বয়ং এই পর্যবেক্ষণ কার্যে যোগদান করতেন। বিখ্যাত গণিত শাস্ত্রবিদ আল-কুহী ছিলেন এর অধ্যক্ষ। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যাঁরা এই মানমন্দিরে কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আল-আস্তারলবী, আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবনে হিলাল, আবুল ওয়াফা প্রমুখ।

আল-হামদানি

জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও ভূগোল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইয়েমেন প্রদেশের জন্যে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি নিজের প্রদেশ ও অন্যান্য তথ্য সমন্বয়ে 'আল-ইখিল' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে পূর্বেকার আরবদের জ্যোতির্জ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, সৃষ্টিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করে।

ইখওয়ানুস সাফাহ্

কতিপয় উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা। এঁরা ছিলেন রাজাশ্রয়ের বাইরে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন বিজ্ঞান-সাধক দল। বাইরে এঁদের কোন জাঁকজমক ছিল না। কাউকেই জানতে না দিয়ে নীরবে কাজ করে যাওয়াই ছিল ওঁদের নীতি।

পরবর্তীকালে ফ্রাগেল ও ডিটিরিসির বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে ওঁদের সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায়। ওঁদের দলে ছিলেন ৬ জন

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ঐতিহাসিক মাহারজুরি মাত্র ৫ জন বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করেন। যথা—

১. ……আল মুকাদ্দমী, ২ এ…… আল জানজানি, ৩. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মাহারজুরি, ৪. আল-আওফি ৫. জায়েদ বিন রাফ'আ।

এই প্রতিষ্ঠান ৯৮১ খৃস্টাব্দে গঠিত হয় বলে মনে করা হয়। ফ্লুগের মতে এঁদের 'রাসয়ায়নে ইখওয়ানুস সাফাহ্ প্রকাশ হয় ৯৭০ খৃস্টাব্দে।

এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ইসলামিক আইন-কানুনের সামঞ্জস্য বিধান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর এঁরা ৫২টি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

এই ৫২টি গ্রন্থের ১৪টি গণিত ও ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র। ১৭টি প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ববিদ্যা। ১০টি মনোবিজ্ঞান এবং ১১টি ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতিষবিজ্ঞান ইত্যাদি।

বইগুলো যদিও নীরস বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তবু ভাষার মাধুর্যে এমন সরস করে তোলা হয়েছে, যা পাঠকের জন্যে ছিল হৃদয়গ্রাহী। রচনার সাহিত্য সৃজনী শিল্পেও বিজ্ঞানসুলভ অভিনব সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলো বোম্বাই থেকে ১৮৮৭-৮৯ খৃস্টাব্দে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এইগুলো পারসী, হিন্দী এবং তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। এই ৫২টি পুস্তকে তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। ডিটিরিসির মতে এগুলো ভালভাবে বুঝতে হলে প্রারম্ভে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন।

১. লেখাপড়া ২. ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সঙ্কলন ৩. গণনা ও হিসাব ৪. ছন্দ প্রকরণ ও কাব্যকলা ৫. প্রতীক বিজ্ঞান ৬. রসায়ন, ম্যাজিক, ভোজবাজি সম্বন্ধে জ্ঞান ৭. ব্যবসা-বাণিজ্য ৮. ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্য নীতি, কৃষি-কার্য ও পশু পালন সম্বন্ধে জ্ঞান ৯. জীবন বৃত্তান্ত।

www.pathagar.com

প্রকৃতি বিজ্ঞানের তাঁরা জোয়ার ভাটা, ভূমিকম্প, গ্রহণ, বায়ু কম্পনে শব্দের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। দুটি বিভিন্ন প্রকারের শব্দ তরঙ্গের মিশ্রণের কথা তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। রসায়ন বিজ্ঞানে ধাতুর গঠন সম্বন্ধে জাবির ইবনে হাইয়ানের মতানুসরণ করেন। এরিস্টটলের চারটি মূল পদার্থের কথাও উল্লেখ করেন। শুদ্ধ-অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে ম্যাজিক স্কোয়ার ও অন্যান্য গণিত তত্ত্ব এবং জ্যোতিষ বিদ্যা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। এমনকি জ্যোতিষ শাস্ত্রটিকে রসায়ন বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে।

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ১. কুরআন শরীফ ২. কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা তফসির জ্ঞান ৩. হাদীস শরীফ ৪. ফিক্‌হ ৫. আধ্যাত্মিক বা সূফীতত্ত্ব।

ইখওয়ানুস সাফাহ্‌র মনীষিগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব সভ্যতায় যাবতীয় সঙ্গীত জ্ঞান-বিজ্ঞান একত্রিভূত করে তুলে ধরে ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা, এজন্যে তাঁদের কার্যপদ্ধতি ছিল সমাবেশিক এবং সর্বব্যাপক। এই সাধক মনীষীদের সম্বন্ধে ডিটিরিসি বলেন, "এতদিন পর্যন্ত যে পরিমাণ জ্ঞান মানুষের আয়ত্তে এসেছে, তাকে একত্রিত করে সম্বন্ধীভূত এবং বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক জগতের জন্যে একটি সমাবেশিক মত তৈরী করা, যাতে তদানীন্তন কৃষি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সমস্ত প্রকার প্রশ্নের সহজ উত্তর দেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।"[১]

আবু আবদুল্লাহ্ খাওয়ারিজমী

খাওয়ারিজমী মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র একটি রাজ্য। প্রত্যেক শতাব্দীতেই এই রাজ্যের মনীষিগণ বিশ্ব সভ্যতায় বহু মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। এই স্থানেই বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম নিউটন মুহাম্মদ বিন মুসা আল-খাওয়ারিজমী জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় মনসুরের পুত্র খলীফা দ্বিতীয় নূহের মন্ত্রী আবুল ওতাব ছিলেন আবদুল্লাহ্‌র পৃষ্ঠপোষক। তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম এবং সর্ব প্রাচীন 'মাফাতাহিল উলুম' নামক এক বৃহদাকার বিশ্বকোষ বা

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান: এম. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ১৫৭।

www.pathagar.com

এনসাইক্লোপিডিয়া প্রণয়ন করেন। এই বিশ্বকোষটি তিনি মন্ত্রীর নামে উৎসর্গ করেন।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ফনফ্লুটেন লিডে এটি পুনপ্রকাশ পায়।

এই বিশ্বকোষে স্থান পেয়েছে ঃ ১. ব্যবহার তত্ত্ব, ২. দর্শন, মুসলমানদের বিভিন্ন মতবাদ। খৃস্টান, য়াহূদী, পারসী এবং ভারতীয় পৌত্তলিক, কেলেডোনিয়াম পৌত্তলিক, আরব পৌত্তলিকদের ধর্মীয় তত্ত্বালোচনা। ৩. ব্যাকরণ, ৪. অফিস কার্যনির্বাহক বিধি, ৫. ছন্দ প্রকরণ, ৬. ইতিহাস, ৭, দর্শন, শব্দের উৎপত্তি ন্যায় শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি, ৮. ন্যায়শাস্ত্র, ৯. চিকিৎসাশাস্ত্র, ১০. অঙ্ক, ১১. জ্যামিতি, ১২. জ্যোতিবিজ্ঞান ১৩. গান, ১৪. বলবিজ্ঞান, ১৫. রসায়ন।

আবুল ফারাজ আল-নাজিম (আনু. ৯২৫—৯৮৫)

তিনি পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন। সমাজ ছিল উচ্চস্তরের শিক্ষিত লোকের সঙ্গে। তিনি নিজেও উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'ফিহরিস্ত' নামক একটি প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়। এর ৯টি খণ্ড ৩২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রকেলম্যান 'ফিহরিস্ত'. সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'আবুল-ফারাজ' এই ফিহরিস্তে বা তালিকায় তখনকার দিনের সমস্ত আরবী পুস্তকের, তা মৌলিক রচনাই হোক বা অনুবাদই হোক—একটি তালিকা দিয়েছেন। এতে তিনি প্রথম বিভিন্ন প্রকারের লিখন পদ্ধতির কথা বর্ণনা করেন, বিভিন্ন ধর্মের প্রেরিত পুস্তকের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এর পর রয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আলোচনা। কুরআন শরীফ থেকে গুপ্ত বিদ্যা পর্যন্ত কোন বিষয়ই তাঁর নজর এড়াইনি। তিনি প্রত্যেক সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখাকে ভাগ ভাগ করে সেই ভাগে ভাগে লেখকদের নাম সন্নিবেশ করার পর যথাসম্ভব পর্যায়ক্রমে তাঁদের জীবন ও কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের দিক থেকে গ্রন্থখানা অমূল্য। সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

www.pathagar.com

কৃষ্টির ইতিহাসের জন্যে এতে শুধু আরব-পারস্যের নয়, প্রায় সমস্ত প্রাচ্য দেশের বহু মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ হয়েছে।"[১]

মুতাহার ইবনে তাহির

তাঁর রচিত 'কিতাবুল-বাদওয়াত' গ্রন্থে তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। শুধু মুসলিম মনীষীদের নিয়েই তিনি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি, য়াহূদী ও ইরানী সভ্যতা নিয়েও আলোচনা করেন।

কুস্তা বিন-লুকা (মৃত্যু ৯১২ খৃস্টাব্দ)

যদিও তিনি খৃস্টান বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তবু বহু গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে থিওডোনিয়াম, এরিস্টারকাম, অটোলাইকাম, হিপসিকলম এবং ডাওফেন্টের গ্রন্থাবলীর আরবী অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা, জ্যোতিবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েরউপরই অনুবাদে দক্ষতা প্রকাশ করেন। লুকার গুণন পদ্ধতিতে আরবরা '০' শূন্য কি ভাবে ব্যবহার করতেন, তাঁর সুন্দর নিদর্শন রয়েছে।

খলীফা হাকাম

স্পেনের খলীফা আবদুর রহমানের পুত্র। যদিও তিনি খলীফা ছিলেন তবু তাঁকে 'গ্রন্থকীট' বলা হতো। তাঁর কর্ডোভার লাইব্রেরীতে ৪ লক্ষাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। প্রত্যেক গ্রন্থ তিনি যত্ন সহকারে পাঠ করে পার্শ্বে টীকা লিখে রাখতেন। এতে পরবর্তী পণ্ডিত সমাজ তাঁর পাণ্ডিত্য দৃষ্টি বিস্ময়ে অভিভূত হন।

মাহিবুল কুবল (মৃত্যু ৯০৭ খৃস্টাব্দ)

কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। অঙ্ক ও জ্যোতিবিজ্ঞানের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : এম. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ১৬৪।

www.pathagar.com

আল-মাজরিতি

খাওয়ারিজমীর জ্যোতিবিজ্ঞান পুনঃসংস্কার করেন এবং পূর্বতন পারসী গণনা আরবী করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও এমিক্যাবল নাম্বারের উপর গবেষণামূলক কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আস্তারলব সম্বন্ধেও তিনি একটি গ্রন্থ লিখেন। টলেমির প্লেনিসফেরিয়াম-এর ভাষ্য ও ব্যবসায়ী গণিত বিষয়েও গ্রন্থ লিখেন। গণিত পুস্তকটির নাম হলো 'আল-মুয়ামালাত'। তাঁর আস্তারলব সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি জোহানেস কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। টলেমি-ভাষ্যটি রুডোলফ কর্তৃক অনূদিত হয়। তিনি 'রুতবাতুল হাকিম' এবং 'গায়ানুল হাকিম' নামে রসায়ন শাস্ত্রের উপর দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল-ফানসোর আদেশে ল্যাটিনে অনূদিত হয়।

আবু কামিল

মিসরের অধিবাসী ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি ও বীজগণিতের উপর মৌলিক আলোচনা করেন। জ্যামিতির পঞ্চভুজ ও দশভুজে তাঁর অবদান রয়েছে। ইতিপূর্বে জ্যামিতি ত্রিভুজ পার হয়ে বহু ভুজে এসেছিল। তিনি তার সীমাকে সম্প্রসারিত করে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন। তিনি সাবিত ইবনে কোরার আদর্শ অনুসরণে জ্যামিতির প্রতিপাদ্য ও উপপাদ্যের মীমাংসায় সমীকরণ প্রয়োগ করেন। বিশেষভাবে সমীকরণের সাহায্যে জ্যামিতির সমস্যাগুলোর সমাধান করেন। এভাবে সমীকরণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে জ্যামিতিক মীমাংসা সম্ভব করাই ছিল তাঁর নিজস্ব অবদান। এজন্যে তাঁকে দশম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ বলা চলে। অঙ্কের এই দুই শাখায় তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অঙ্কের সাঙ্কেতিক নিয়মগুলো সুশৃঙ্খল এবং ভগ্নাংশের বর্তমান লিখন প্রণালী তারই আবিষ্কার। অনির্দিষ্ট সংখ্যা লিখন প্রণালীতে অভিনবত্ব থাকলেও তিনি খাওয়ারিজমীর পন্থা অনুসরণ করেন। মূলত চিহ্নগুলোর যোগ-বিয়োগের নিয়ম-পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেন। আল-চারখিও আবু কামিলের বীজগণিত অনেক স্থানে ব্যবহার ও অনুসরণ করেছিল।

www.pathagar.com

সাদিয়া বিন য়োসেফ

য়াহুদী বৈজ্ঞানিক। তিনি এই সময় কায়রোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করে, পরে ব্যাবিলনে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে রত হন।

উল্লেখ্য যে, আলোচনা প্রসঙ্গে এসব বৈজ্ঞানিক এবং মনীষীর পরিচয় প্রকাশের মধ্যে আমাদের একটি বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। আবু কামিল, সাবিত ইবনে কোরা প্রমুখ বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিত্য নতুন আবিষ্কার-অবদান দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন। অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ তাদের সেই বিজ্ঞান সাধনারই পরিণতি।

মুসলমানদের আবিষ্কৃত একটি অতি ক্ষুদ্র '০' কে যদি প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে বিজ্ঞানের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাবে বললে অযৌক্তিক হবে না। একটি '০'-এর অভাবে সমগ্র বিজ্ঞান জগতটাই মহা অন্ধকারে ডুবে যাবে। শুধু তাই নয়, মুসলিম সভ্যতার সৃষ্ট অবদান যদি একটি একটি করে আধুনিক বিজ্ঞানের বুনিয়াদ থেকে প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান দেউলিয়া হয়ে যাবে। একটি দালান যত প্রকান্ডই হউক, তার ভিত্তি বাদ দিলে যেমন দালানটির অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞান থেকে মুসলিম অবদান বাদ দিলে আধুনিক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে না।

পূর্বেও আমরা এ সম্পর্কে বেশ কিছু নজীর উপস্থাপন করেছি, আল মাক্‌কারী তাঁর 'নাফে আত-তিব' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, বিন ফিরনিস নামক জনৈক ব্যক্তি ৮৮৮ খৃস্টাব্দে মানুষ পরিচালিত একটি উড়োজাহাজ নির্মাণ করে আকাশে উড্ডয়ন করে অবতরণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১]

তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরভিল রাইট ও উইলবার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ১৯০৩ খৃস্টাব্দে উড়োজাহাজ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এটাই একমাত্র সত্য নয়। আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিলের পতনের ২৫ বছর পরে বিন ফিরনিস স্বীয় নির্মিত বিমানযোগে আকাশে উঠেছিলেন। হয়ত সেই বিমানটি অতিশয় অনুন্নত ছিল। কিন্তু আকাশে উড্ডয়নের বৈজ্ঞানিক স্বপ্নটিও আরব বিজ্ঞান থেকেই বিংশ শতাব্দীর

১. মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা : পৃষ্ঠা ২৭৪।

www.pathagar.com

গোড়ায় ভেসে এসেছিল। সমর-বিজ্ঞানের মারণাস্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য আছে।

বলা হয় যে, ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ম্যানুয়ের কাল্ট পিস্তল আবিষ্কার করেন। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে কাল্ট রিভলভার আবিষ্কার করেন। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে বৃটেনের লর্ড অর্মস্ট্রং বন্দুক আবিষ্কার করেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে আমেরিকার প্যাটলিং ম্যাশিনগান আবিষ্কার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৃটেনের রোজার বেকন বারুদ আবিষ্কার করেন।

আমরা আধুনিক মারণাস্ত্রের কথা বলছি না। আধুনিক জগতের গোড়ার দিকে মৌলিক মারণাস্ত্র আর তার উপাদানের কথা বলছি। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে চেঙ্গিস খান যখন চীন দখল করেন, তখন চীন সম্রাটের গোলা-বারুদ ব্যবহার উপযোগী কামান জাতীয় মারণাস্ত্র ছিল। ১৬০৫ খৃস্টাব্দের পূর্বে দিল্লীর সম্রাট আকবর বন্দুক ব্যবহার করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ঈসা খান যে কামান ব্যবহার করতেন, সেই কামানের ঐতিহাসিক নিদর্শন ঢাকার গুলিস্তানের কাছে এখনও পরিদৃশ্যমান। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বন্দুক কামান ব্যবহার করা হয়েছিল। সুতরাং ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে বৃটেনের লর্ড আর্মস্ট্রং বন্দুকের প্রথম আবিষ্কারক, এ কথা কি করে সত্য হতে পারে? আর্মস্ট্রং-এর জন্মের প্রায় একশত বছর পূর্বে পলাশীর যুদ্ধে যে বন্দুক কামান ব্যবহার করা হয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। বলা হয় ১২৮৫ খৃস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডি স্পিনা চশমা আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে ত্রয়োদশ শতকের রোজার বেকনকেও চশমা আবিষ্কারক বলা হয়। জার্মানীর গুটেনবার্গ ১৪৪০ খৃস্টাব্দে ছাপাখানা আবিষ্কার করেন। অথচ ঐতিহাসিক মায়ার্শের মতে খৃস্ট জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলনীয়রা 'কুইনী ফরম' নামক এক ধরনের ছাপা যন্ত্র ব্যবহার করতেন। অন্ততঃ চীন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে উন্নত ছাপাখানার আবিষ্কারক একথা বিশ্ববিদিত। সুতরাং গুটেনবার্গ ছাপাখানার প্রথম আবিষ্কারক নন। ১৫৯২ খৃস্টাব্দে থারমোমিটার ও ১৬০৯ খৃস্টাব্দে টেলিস্কোপ যে গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন, তারও পূর্ববর্তীকালে এসবের কোন আবিষ্কারক ছিলেন কিনা—অনুসন্ধিৎসুদের খুঁজে দেখা দরকার। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের উড়োজাহাজ আবিষ্কারের ১০১৫ বছর পূর্বে ৮৮৮ খৃস্টাব্দে

www.pathagar.com

বিন ফিরনিস উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন। দূরবীক্ষণের আধুনিক আবিষ্কর্তা গ্যালিলিও জন্মের ৭৩১ বছর পূর্বে আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৪৪০ খৃস্টাব্দে জার্মানীর গুটেনবার্গের বহুশত বছর পূর্বে চীনে অনেকটা উন্নতমানের ছাপাখানা আবিষ্কার হয়।

আধুনিক ইউরোপীয় আবিষ্কারকদের বহু শত বছর পূর্বে আরব, মোগল ও পাঠানেরা গোলা-বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করেন।

১৩৩৮ খৃস্টাব্দে বৃটেনের ফাউলটন ও লিভিংস্টোন জাহাজ আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সভ্যতার জনক ইউরোপ বিশ্বজনতাকে বোকা বুঝতে চায়। তা না হলে এত বড় একটা অসত্য কথাও ইতিহাসের পাতায় কি করে সত্যরূপ ধারণ করতে পারে?

'নৌবহর' শব্দটাই আরবদের। আরবী অর্থে 'বহর' অর্থ সমুদ্র বা সামুদ্রিক জাহাজ। 'মাল্লা' আরবী শব্দ। অর্থ নাবিক। 'নাও' আরবী শব্দ। অর্থ নৌকা। 'দাড়ি' নৌচালক, আরবী শব্দ। 'বন্দর' ফারসী শব্দ। এ-ও মুসলিম সভ্যতারই অবদান। তারপর আরবরা যাকে বলত 'আমিরুল বহর', পর্তুগালরা তাঁকে বলত 'আমিরাহ্', ফরাসীরা বলত 'আমিরাল', ইংরেজরা বলত 'অ্যাডমিরাল'। এসব শব্দ আবিষ্কারেও আরবরা অগ্রনায়ক। কুরআনেও জাহাজের উল্লেখ রয়েছে।[১] '৪৯ হিজরীতে রোমানরা যখন সিরিয়ার উপকূল আক্রমণ করেন, তখন মিসরে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। হযরত মাবিয়া দামিশকেও আর একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি আরব নৌবহরের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলো দখল করে নেন। খলীফা আবদুল মালেক তিউনিসে একটি বিশাল জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন।[২]

হারুনুর-রশীদের পিতা খলীফা আল-মেহেদীর নৌবহর বা নৌ-সৈন্যগণ ৭৮৫ খৃস্টাব্দের পূর্বে ১৪৯ হিজরীতে ভারতবর্ষের গুজরাটের উপকূল এলাকা বারবুদ দখল করে।[৩]

---

১. 'আল-কুরআন : ২৮ নং সূরায় জাহাজ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।
২. আল মুকাদ্দামা : ইবনে খালদূন, পৃষ্ঠা ২১০।
৩. আল-মুকাদ্দামা : ইবনে খালদূন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৮।

www.pathagar.com

৬৬৯ খৃস্টাব্দে হযরত মাবিয়ার যুদ্ধ জাহাজগুলো (নৌবহর) সাফল্যের সঙ্গে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে।[১] এখানে আমরা আরও একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতে চাই। তা নিম্নরূপঃ 'মুসলমানরা অর্থাৎ (হযরত) মাবিয়া তাঁর নৌ-অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতেন। ক্রুসেডকালে মুসলমানরা কামানের অনুরূপ অস্ত্র ব্যবহার করতেন। এন. পি. স্কট উল্লেখ করেছেন, "হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে স্পেনের মুসলমানগণ কামানের অনুরূপ কিছু ব্যবহার করতেন।"[২]

১৪৯২ খৃস্টাব্দে স্পেনে আরব সভ্যতার পতনের ভিত্তির উপরই ইউরোপের জাগরণ যুগ শুরু হয়। অন্যদিকে মুসলমানগণ হীনবল হতে শুরু করে। যদিও ১৫১২ খৃস্টাব্দে সেলিম তুরস্কের খলীফা পদে সমাসীন হয়ে ১৫১৭ খৃস্টাব্দে মিসরকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং ভারতে ১৫২৬ খৃস্টাব্দে বাবরের দিল্লী দখল ও মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তবু আরব সভ্যতার পতন ও ইউরোপের উত্থানই জয়-পরাজয়ের সূচক, এসব মুসলিম অঙ্গ সভ্যতার ইউরোপের নবজাগরণের আগ্রাসনের মুখে ছিল অতিশয় অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু রোজার কেবল যে গোলা-বারুদের প্রথম আবিষ্কর্তা হয়ে গেলেন, হযরত আলী ও ইবনে সিনা প্রমুখের গন্ধক নিয়ে এত বাক্য ব্যয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা না হয় বাদ দিলাম, আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত জনক জাবির ইবনে হাইয়ানও কি গন্ধকের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় সৃষ্ট বারুদ সম্বন্ধে কিছুই বুঝতেন না? এতদূর যেতে হয় না। কারবালার ঘাতক খলীফা ইয়াযীদের পুত্র রসায়ন বিজ্ঞানী খালিদ রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে আজীবন বিজ্ঞান-সাধনায় কাটিয়ে দিতে গিয়ে স্বর্ণ প্রস্তুত পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারলেন, শুধু গন্ধক দ্বারা বারুদ প্রস্তুতের কথাটাই তাঁর মনে ছিল না।

---

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরীঃ অধ্যক্ষ কে. এ. রহমান, পৃষ্ঠা ১৬১।

২. মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থাঃ পৃষ্ঠা ২৭১।

www.pathagar.com

অথচ উম্মিয়া বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে শেষ পর্যন্ত চিরশত্রু রোমান (আধুনিক ইউরোপের পূর্বপুরুষ)-দের প্রতি নৌ-যুদ্ধে বিতাড়ন করার সময় কামান জাতীয় অস্ত্রের মুখে যে অগ্নি উদ্গীরণ করত, তখন বারুদ আবিষ্কার না হলে কি করে তা সম্ভব হতো ?

একদিন হয়ত ঘড়ি আবিষ্কারক হিসাবে কোন একজনের গালভরা বিলাতী নাম শোনা যাবে। আর সারাটা বিশ্বজনতা তা নির্বিচারে মেনে নেবে, স্বীকার করবে। বর্তমান সভ্যতার মূল কথা হলো একটা মিথ্যা বারবার বলতে থাকলে নাকি সত্যে পরিণত হয়। ইউরোপের বিস্ময় শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের মুখে একটা কেন, একশত মিথ্যা তুলে ধরলেও ফিরায় কে! সূর্যঘড়ি, ছায়াঘড়ির উপর এত অঙ্ক, এত বিজ্ঞান প্রক্রিয়া নিয়ে আরব বৈজ্ঞানিকগণ যে প্রায় ৫ শত বছর সাধনা করলেন এবং সেই সাধনার ফলে বাদশাহ্ হারুনুর-রশীদ ফরাসী সম্রাট শার্লিমেনকে এক অদ্ভুত ঘড়ি উপহার দিলেন (যে ঘড়ি আধুনিক বিজ্ঞান জগতেও হয়ত নির্মাণ করা সম্ভব নয়) যা দেখে সমগ্র ইউরোপ মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিল, তা রূপান্তরিত হয়ে হয়ত একদিন পাশ্চাত্যের কারো আবিষ্কার-সম্পত্তিতে পরিণত হবে!

এখন আরব বা ইসলামী সভ্যতা নেই, তার কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউরোপের প্রভাবাধীন। ইউরোপ তো আরব সভ্যতার অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যত জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল, তা ইচ্ছামত গ্রহণ ও রূপান্তরিত করে ফেলেছে। বাদ বাকী যা ছিল কবর দিয়ে ফেলেছে। হুকুম দিয়েছে, এই অন্ধকার যুগের দিকে কেউ ফিরে চেয়ো না। আমরাও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।

অথচ ইতিহাসের সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ছিল সম্পূর্ণ অমানিশার অন্ধকার যুগ। আর আরব সভ্যতার ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল যুগ। আরব সভ্যতার ইতিহাসের প্রায় সবগুলো পাতাই তাদের কালি দিয়ে ঢেকে ও বেনামী করেও তারা যেন তৃপ্ত নয়, সন্তুষ্টও নয়।

www.pathagar.com

ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান

মুসলমানরা যখন টলেমির আল-মাজেস্টের ভুলত্রুটি প্রমাণ পর্যালোচনায় ব্যস্ত, তখন ইউরোপ আরবদের আরবী অনূদিত গ্রন্থ-গুলো থেকে আল-মাজেস্টের মাত্র প্রাথমিক নিতে শুরু করেছে। অনুন্নত ভারতের ভাস্করাচার্য ছাড়া আর কোন বৈজ্ঞানিকের পাত্তা ছিল না অর্থাৎ মুসলিম সভ্যতা ছাড়া সারা বিশ্বই জ্ঞান-বিজ্ঞানে অন্ধ-কার ছিল।

মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের প্রথম দিককার গ্রন্থগুলোকে সহজ-সরল মনে করে ইউরোপ অনুবাদ কার্যে হাত দিয়েছিল। পরবর্তীকালের জটিল ও কঠিন বিষয়ের পুস্তকসমূহ তাঁদের বোধগম্যের বাইরে থাকায় অনুবাদ করতে সাহস পায়নি। পরে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান পুস্তকসমূহ ক্রমান্বয়ে পরিপক্কতা লাভ করে। ইউরোপীয়ানরা অনুবাদ কার্যে হাত দিতে সাহস পান।

চীনের বীজগণিত ও ত্রিকোনমিতি প্রভৃতিতে আরবদের সংখ্যা বিজ্ঞানের প্রতিফলন ঘটে।

১২৫৮ খৃস্টাব্দে মঙ্গোল সম্রাট মাঙ্গো খানের নির্দেশে হালাকু খান বাগদাদ দখল করেন। এরপর নাসিরুদ্দীন তুসীর সহায়তায় হালাকু খান মারাঘার মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মানমন্দিরে তুসীর অধীনে কয়েকজন চীনা বৈজ্ঞানিকও কাজ করতেন। ওঁদের দ্বারা বা কুশো চিং-এর আরব অনুকরণীয় ত্রিকোনমিতি থেকে চীনদেশ প্রভাবিত হয়।

ষোড়শ শতকে অধ্যাপক রাসুম নামক খৃস্টান বিজ্ঞানী ইবনুল হায়সামের 'কিতাবুল মানাজির'-এর পাণ্ডুলিপি মধ্যপ্রাচ্যের বাজারের আনাচে-কানাচে খুঁজে হয়রান হয়ে অবশেষে এক দোকানদারের

www.pathagar.com

পুটলি বাঁধার ছেঁড়া কাগজের মধ্যে খুঁজে পান। এতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। মধ্যপ্রাচ্যে যখন মুসলিম য়াহূদীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ উত্তেজনা চলছে, তখনও য়াহূদী বৈজ্ঞানিক মার্টিলেভী আরব বৈজ্ঞানিকদের বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না বলে মর্মাহত হয়েছেন, জ্ঞানী জ্ঞানকেই ভালবাসেন।

১৪৯২ খৃস্টাব্দে স্পেনে মুসলমনাদের পরাজিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে এই বছরই সম্রাট ফার্টিনাণ্ড রানী ইসাবেলাকে বিবাহ করেন। ইসাবেলার গুরু জিমনজেজের পরামর্শে রানী ইসাবেলা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইগুলো অগ্নিদগ্ধ করেন। মুসলমানদের আরবী ভাষা ও বই-পুস্তক স্পেনের রাজাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করে জ্ঞান গ্রন্থগুলো দজলা নদীতে ডুবিয়ে দেন। ভারত থেকে পারস্য পর্যন্ত পারসিক লুপ্ত সভ্যতার প্রভাবিত মুসলমানরাও বিজ্ঞানের ভাষা আরবীকে বাদ দিয়ে তদস্থলে ফারসীকে রাজভাষা করেন। মোল্লারা বিজ্ঞানকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়ে জোরদার প্রচার শুরু করে দেয়। ইমাম গাযালী (১০৫৮-১১১১) স্বয়ং অঙ্কবিদ ও জ্যোতিবিজ্ঞানী হয়েও জ্যোতিবিজ্ঞান শরীয়ত বিরোধী বলে ফতোয়া প্রচার শুরু করেন। 'আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃতির অবস্থা ও তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব জানা' ধর্মবিরোধী বলে তিনি প্রচার করেন। অথচ আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকে জানার জন্যেই মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলেন বলে তিনিই বারবার কুরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এই শ্রেণীর প্রচারের ফলে বাগদাদ মসজিদের ইমাম, ইবনুল হায়সামের বিজ্ঞান গ্রন্থ সংগ্রহ করে, গ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে প্রকাশ্য রাজপথে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল।

মুসলমানদের এই পতন ও গোড়ামীর যুগে ইউরোপীয়রা মুসলমানদের বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো অনুবাদ করে জ্ঞান সঞ্চয় করা শুরু করেন। অন্যদিকে আরব প্রতিভাগুলোকে বিজ্ঞান-বিমুখ গোড়া করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত শুরু করে দেয়। এই ধরনের বহু মোল্লাই জানা-অজানায় ইউরোপীয় ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে ক্রীড়নকে পর্যবসিত হন।

www.pathagar.com

আল-কারখী (মৃত্যু ১০১৯—২৯)

কারখের অধিবাসী হিসাবে তাঁকে কারখী বলা হয়। কারখ খলীফা হারুনুর-রশীদের স্ত্রী জুবায়দার গোরস্থান থাকার জন্যও বিশেষ-ভাবে প্রসিদ্ধ। খলীফা আবদুল্লাহ্‌র মন্ত্রী খালাফ ফখরুল মুলকের উৎসাহেই হয়ত আল-কারখী বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ পেয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর বীজগণিত গ্রন্থটির নাম রাখেন 'আল-ফাখরি'। তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ব্রকলম্যান তাঁর ৪ খানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

১. আল-কফিফিল হিসাব, ২. কিতাবুল কাখরি, ৩. কিতাবুল ইনবাত আলমিয়া আল-খফিয়া, ৪. আল বদিফিল হিসাব। এই ৪টি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র আল-কাফিফিল হিসাব ও আল-ফাখরি এই দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়! তাও মূল আরবী নয়। বাকীগুলোর খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি!

এ হোচিয়েন নামক জনৈক জার্মান পণ্ডিত ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আল কাফিফিল হিসাব-এর জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ৩ খণ্ডে প্রকাশ করেন। সঁনিয়ে এফ উপেক প্যারিস থেকে ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে 'আল-ফাখরি'-র একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করেন।

আল-কারখের 'আল কাফিফিল হিসাব' অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এতে অঙ্কের বিভিন্ন উদাহরণ সন্নিবেশ করে নিজের উদ্ভাবিত পন্থাগুলোও যোগ করা হয়েছে। এই নব উদ্ভাবিত পন্থাগুলোই কারখের অসাধারণত্বের পরিচয় দেয়। তিনি অঙ্কের সহজতর স্তর থেকে ক্রমশ জটিলতার দিকে এগিয়ে যান এবং অঙ্কের সাথে বীজগণিতের সংমিশ্রণ ঘটান।

আবু ওয়াফার ন্যায় কারখিও কোথাও ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। সব সংখ্যা ও অঙ্ক অক্ষরে ব্যবহার করেন। এ সত্য বিস্ময়কর সৃজনী প্রতিভা। ভারতীয় ও গ্রীক সংখ্যাবিজ্ঞান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আল-কারখি অঙ্কশাস্ত্রে নিজস্ব সৃজনী শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এ তাঁর সৃজনী প্রতিভারই পরিচায়ক।

www.pathagar.com

আবুল জুদ (মৃত্যু ১০০৯ খৃস্টাব্দ)

তিনিই সর্বপ্রথম একটি সমীকরণের সমাধান দ্বারা সুষম সপ্তভুজের বাহুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন। ওমর খৈয়ামের বীজগণিতে আবুল জুদ্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। খৈয়ামের আলোচনার দ্বারাও জুদ যে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল-খুজান্দি (মৃত্যু ১০০০ খৃস্টাব্দ)

জুয়াইদ নৃপতি ফখর-উদ-দৌলার উৎসাহে তিনি বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। Sextant নামক সূর্যের উচ্চতার পরিমাপক যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন, শাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে যন্ত্রের নাম রাখেন 'আস সুদ আল ফাখরী'। এই যন্ত্রের দ্বারা সূর্যের উচ্চতা ঠিক করা হয়েছিল। ৯৯৪ খৃস্টাব্দে এই Sextant দ্বারাই রাইতে আল-খুজান্দি সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় করেন। অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে এই জটিল সমস্যার সমাধানে তিনি কৃতকার্য হন। সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় সাপেক্ষে তিনি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

এ ছাড়া 'আল আলা-আস সামিল্লা' নামে তিনি আর একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। এদ্বারা আস্তারলব ও কোয়াড্রান্ট—উভয়েরই কাজ চলত। প্রথমে এই যন্ত্রটিকে শুধু একই অক্ষরেখাতে ব্যবহার করা হতো। পরে আল-আস্তারলবী একে সমস্ত অক্ষরেখাতেই ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। খুজান্দির অসাধারণ বিজ্ঞান সাধনা ও অভিনব যন্ত্রাবিষ্কারের ফলে কিছুটা স্তিমিত মুসলিম বিজ্ঞান জগতে নব প্রেরণার সঞ্চার করে।

বীজগণিতেও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তা হলো ত্রৈয়োমাত্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, মূলদ সংখ্যার প্রকল্প অনুসারে দুটি ত্রৈয়োমাত্রিক সংখ্যার যোগফল অন্য একটি ত্রয়োমাত্রিক হতে পারে না। তিনি অঙ্ক দিয়ে তা প্রমাণ করে দেন। মিঃ ফিঙ্ক তাঁর ফর্মুলাকে নির্ভুল বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

ত্রিকোনমিতিতেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ বেল, মিঃ মারটন প্রমুখ পাশচাত্য পণ্ডিত তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণা নিয়ে আলোচনা করেন। মিঃ ব্রফ্লম্যান তাঁর ৪টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

করেন। ১টি হলো জ্যামিতি সম্বন্ধে। এর আরবী নাম জানা যায় না অন্য ৩টি হলো ঃ ১. 'কিতাবুল আলা আস-শামিলা' ২. 'রিসালাতুন ফি তাসহিহ আল-মালায়েল'… …৩. ফি আমালি আল-আলা আল আম্মাতে'।

আবু নাসির

খাওয়ারিজমের রাজবংশ শাহ মুহাম্মাদ বিন ইরাকের পিতৃব্য পুত্র। তিনি বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত আল-বেরুনীর শিক্ষক। তিনি ১০০৭—৮ খৃস্টাব্দে ম্যানিলসের Spherica-কে নানাভাবে সংশোধিত করে এর একটি উন্নত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ত্রিকোনমিতি, টলেমির আল-মাজেস্ট, জ্যোতিবিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৈজ্ঞানিক ম্যানিলসের প্রণালীকে পরিহার করে, মন্ডলাকার ত্রিভুজের সঙ্গে সাইন প্রভৃতির সম্বন্ধ প্রথম কে স্থাপন করেন, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে যে তিনজন বৈজ্ঞানিকের উল্লেখ করা হয়, তন্মধ্যে প্রথম দুজন হলেন আবু ওয়াফা ও আল-খুজান্দি এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলেন তিনি। নাসির তুসী তাঁর 'আশ শাফ কুল বাত্তা' গ্রন্থে বলেছেন ঃ আল-বেরুনী উল্লেখ করেন এই সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন আমির আবু নাসির। ইটালীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ C. A. Nallin এই অবিষ্কারকে আরবদের গণিত বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ আবিষ্কার বলে উল্লেখ করেন।

আল-বেরুনীর পত্রে তাঁর ১২টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ আছে। ব্রকলম্যান তাঁর ১৮টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে ১৫টি গ্রন্থের আরবী নামের তালিকা প্রকাশ করেন।

আল নামাতী (মৃত্যু ১০৩১ খৃস্টাব্দ)

তখন দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কার হলেও তা তত সমাদৃত ছিল না। তা ছিল এলোমেলো, কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম ষষ্ঠ ভিত্তিক গণনার পরিবর্তে দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার প্রচলন করে বৈজ্ঞানিক জগতে সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি ১৭৩ ডিগ্রীর বর্গমূল বের করতে যে ভাবে দশমিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করেছেন, এদ্বারা

www.pathagar.com

তার অঙ্কে সৃজনী পাণ্ডিত্য ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পরবর্তী বিপ্লবী সাহসিকতার পরিচয় হলো, বিজ্ঞানে আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠিত আধিপত্য অগ্রাহ্য করে, মাতৃভাষা পারসীতে তাঁর প্রথম গণিত গ্রন্থটি রচনা করা। এতে হয়ত তাকে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের ভ্রুকুটি সহ্য করতে হয়েছে। হয়ত রাজনৈতিক চাপে তাঁর অঙ্ক গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করতে বাধ্য হন। গ্রন্থটির নাম হলো 'আল-মকনী ফিল হিসাব আল-হিন্দী' ভারতীয় গণনা বিধির সৌন্দর্য।

ত্রয়োদশ শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু বকর আল-কারিমি তাঁর গণিতের একটি জিজে আনানাসাভীর একটি জিজের কথা উল্লেখ করেছেন। এ জিজের নাম হলো 'আজ-জিজ আল ফাখির, জ্যোতি-বিজ্ঞানী কুশায়ারও তাঁর জিজে আননাসাভীর জিজ থেকে তথ্য সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আর্কিমিডিসের তত্ত্ব ও ম্যানিলসের উপপাদ্য এবং গ্রীক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা-মূলক একটি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'কিতাবুল ইশাবা' গ্রন্থে তাঁর ৩টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ১. আল-মকনি ফিল হিসাব আল-হিন্দী' ২. 'কিতাবুল ইশাবা' ৩. 'আজ-জিজ আল ফাখির'।

www.pathagar.com

মহাজ্ঞানী আল-বেরুনী

আল-বেরুনী (জন্ম ৯৭৩ খৃস্টাব্দ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ৩৬১ হিজরী, ৩রা জিলহজ্জ, বৃহস্পতিবার, মৃত্যু ১০৪৮ খৃস্টাব্দ ১২ ডিসেম্বর ৪৪০ হিজরী ২রা রজব, শুক্রবার, বয়স ৭৫ বছর। তার পূর্ণ নাম হলো আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনী। ৩৯০-৯১ হিজরীতে তিনি তাঁর 'আছারুল বাকিয়া' গ্রন্থটি সমাপ্ত করে শাসক কাবুসের নামে উৎসর্গ করেন। এখানে থাকাকালেই তিনি ভূগোলের অক্ষরেখার পরিমাণ নির্ণয় করেন। ৪০০—৪০৭ হিজরীতে মামুন বিন মাহমুদের দরবারে অন্যতম সভ্য হিসাবে খাওয়ারিজমে অবস্থান করেন। তাঁর আমল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেনি। শুধু নৃপতিদের দরবারকক্ষ ও রুচির উপরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নির্ভরশীল ছিল।

আব্বাসীয় খলীফাদের শেষ দিককার অযোগ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগে তাঁদের সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু স্বাধীন রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এতে আরবী এবং পারসী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামের প্লাবনে যদিও একাকার হয়ে গিয়েছিল, তবু এই দুটি সর্ব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা একত্রীভূত সভ্যতার অভ্যন্তরে ফল্গুস্রোতের মতো একটি নিয়মিত অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। উম্মিয়া আব্বাসীয়দের মধ্যে যত ঝগড়া-বিরোধই থাক, উভয় বংশের শাসকগণই পারসিকদের বাঁকা চোখেই দেখতেন। আব্বাসীয়দের পতন যুগে পারসিক আধিপত্য বৃদ্ধির ফলেই বুয়াইদ বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। আব্বাসীয় বংশের দুর্বলতার সুযোগে খাওয়ারিজমী প্রদেশের দুইজন সুলতান মস্তকোত্তলন করেন। এর উত্তরাংশের সুলতান হলেন মামুন বিন মাহমুদ, দক্ষিণাংশের আল-ইয়াতী বংশের সুলতান আশ্রয়পুষ্ট ছিলেন আল-বেরুনী ৯৯৪-৯৫ খৃস্টাব্দে মামুন বিন মাহমুদ আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করে তাঁর রাজ্য দখল করে নিয়ে নিজকে খাওয়ারিজমের স্বাধীন সুলতান

www.pathagar.com

বলে ঘোষণা করেন। এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ে আল-বেরুনী জন্ম ভূমি ত্যাগ করে জুরজানে চলে যান। নিঃস্ব ও নিঃসহায় অবস্থায় যখন জুরজানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। অভাব-অভিযোগের কারণে দুর্দশাগ্রস্ত, মানুষের প্রতি গণ্যমান্য মানুষেরা যে অপমানজনক ব্যবহার করতেন, এতে মর্মাহত হয়ে তিনি মানুষের দারিদ্র্য জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, "দারিদ্র্য মানুষের গুণকেও দোষে পরিণত করে' এই অবস্থায়ও এই সময়ে তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শীঘ্রই তিনি জুরজানের সুলতান কাবুসের সুনজরে পড়েন এবং এই বিদ্যুৎসাহী সুলতানের বন্ধুতে পরিণত হন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সদ্য লিখিত 'আল আছারুল বাকিয়া' ও 'তাজরী দুশ শুয়াত' নামক দুটি মূল্যবান পুস্তক তিনি কাবুসের নামে উৎসর্গ করেন। তবু তাঁর তরুণ মন জন্মভূমি খাওয়ারিজমের প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

খাওয়ারিজমের সুলতান মামুন বিন মাহমুদও একান্ত বিদ্যুৎসাহী ছিলেন। তিনি স্বদেশত্যাগী আল-বেরুনীর গুণগান শুনে মুগ্ধ হয়ে 800 হিজরীতে দেশে ফিরে আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। আল-বেরুনী সানন্দে এই রাজকীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে এসে প্রকৃতপক্ষে তিনি সুলতান মামুনের প্রধান মন্ত্রীরূপেই কাজ করতেন এবং মানমন্দির স্থাপন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ কার্য চালনা করতেন। ৭ বছর শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পর গযনীর দিগ্বিজয়ী সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজমের সুলতানের নিকট একটি রাজকীয় পত্র দ্বারা মর্যাদানুকূল মার্জিত ভাষায় পরোক্ষ আদেশ করেন খাওয়ারিজমী সুলতানের দরবারে পণ্ডিতমণ্ডলীকে গযনীতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

আল-বেরুনী তাঁর দু'এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি সঙ্গী নিয়ে সুলতান মাহমুদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে গযনীতে ১০১৬ খৃস্টাব্দে চলে আসেন এবং মামুনের দরবারের অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবু আলী ইবনে সিনা এই অমর্যাদাকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দু'এক জন

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক সঙ্গী নিয়ে গযনীর সুলতান মাহমুদের ভয়ে খাওয়ারিজমের রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেন।

ইবনে সিনার বিদ্রোহের অজুহাতে সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম রাজ্য দখল করেন, মামুন বিন মাহমুদকে হত্যা করেন।

আল-বেরুনীর পাণ্ডিত্যে সুলতান মাহমুদ মুগ্ধ থাকলেও খাওয়ারিজম রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থাকায় তাঁর প্রতি সুলতান মাহমুদের দৃষ্টি চিরকাল বাঁকা ছিল। গযনীতে অবস্থানকালীন কোন একটা বিপজ্জনক সময় সম্পর্কে তাঁর ভাষাতেই আতঙ্কের প্রমাণ ফুটে উঠে। আল-বেরুনী বলেন, "মাহমুদ আমাকে অনুগ্রহ করতে কার্পণ্য করতেন না। তিনি আমাকে প্রচুর ধন দান করেছেন, যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন, আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করেছেন, প্রচুর সম্মান করেছেন এবং মর্যাদা-দানে আমার গৌরব ও পোশাক উজ্জ্বল করেছেন।"[১]

সুলতান মাহমুদের মত সুলতানের পক্ষে বিশ্ববিখ্যাত মহাজ্ঞানী আল-বেরুনীর 'অজ্ঞতার দোষ ধরার ও ক্ষমা করার বিষয়টি এখানে লক্ষণীয়।

যদ্দুর মনে হয়, ১০১৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১০১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আল-বেরুনী গযনীতে ছিলেন। এরপর রাজসমর্থন নিয়ে জ্ঞানানুশীলনে তিনি ১০১৯ খৃস্টাব্দ থেকে ১০২৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছর ভারতে অবস্থান করেন। ভারত থেকে গযনীতে তিনি ফিরে আসার কিছুদিন পরে সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাসউদ ও মুহাম্মদের মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সামরিক বিরোধে পরিণত হয়। কিন্তু সৈনিকগণ মাসউদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করায় মাসউদ নির্বিঘ্নে ১০৩১ খৃস্টাব্দ সিংহাসনারোহণ করেন।

সুলতান মাসউদ বিদ্যুৎসাহী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেও

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান : এম. আকবর আলী, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৭।

www.pathagar.com

তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। আল-বেরুনীকে বিশেষ মর্যাদা দিতে তাঁর কোন কথা ছিল না।

আল বেরুনীও তাঁর অনুরক্ত হয়ে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম সুলতানের নামানুসারে রাখেন 'কানুনে মাসউদী' এবং সেই গ্রন্থটি উৎসর্গও করেন সুলতানের নামেই।

বিজ্ঞানানুরাগী সুলতান মাসউদ গ্রন্থটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, অত্যন্ত খুশী হয়ে একটি হাতির ওজনের পরিমাণ রৌপ্য বৈজ্ঞানিক আল-বেরুনীকে উপহার প্রদান করেন। আল-বেরুনী গরীব ছিলেন। রাজানুগ্রহ ছাড়া তাঁর কোন আর্থিক অবলম্বন ছিল না।

সেই দরিদ্র বৈজ্ঞানিক আল-বেরুনীকে সুলতান মাসউদ খুশী হয়ে এক হাতী পরিমাণ ওজনের রৌপ্য দান করেন।

তাতে আল-বেরুনীর মহাখুশী হয়ে সাগ্রহে দান গ্রহণ করার কথা। কিন্তু তা না করে বাহ্যিক সন্তোষ প্রকাশ করে সবটা রৌপ্যই তিনি রাজকোষে ফিরিয়ে দেন। মন্তব্য করেন যে, তাঁর এত ধন-সম্পদে কোন প্রয়োজন নেই।

১০৩৭ খৃস্টাব্দে তুরস্কের সেলজুক-বিন-তুকাক নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি সেলজুক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। দুই বছর পর সেলজুকরা সুলতান মাসউদের রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। ১০২৯ খৃস্টাব্দে দন্দান কান নামক স্থানের যুদ্ধে মাসউদের সেনাবাহিনী সেলজুকদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এর ফলে মাসউদকে পিতৃরাজ্যের অনেক অঞ্চলই তুর্কীদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়।

এই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই ১০৪০ খৃস্টাব্দে জনৈক ক্রীতদাস কর্তৃক মাসউদ নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গেই মাসউদের অন্ধ ভ্রাতা মুহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪ মাস যেতে না যেতেই সুলতান মাসউদের ছেলে মাওদুদ তাঁর চাচা অন্ধ সুলতান মুহাম্মদকে যুদ্ধে পরাজিত ও পুত্র সহ হত্যা করে সিংহাসনারোহণ করেন। মাওদুদও ৯ বছর রাজত্ব করার পর নিহত হন। সুলতান মাওদুদও পিতা সুলতান মাসউদের ন্যায় তাঁর রাজদরবারে আল-বেরুনীকে

www.pathagar.com

অত্যন্ত মর্যাদা দান করতেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আল-বেরুনী সুলতান মওদুদের উদ্দেশ্যে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং অন্য একটি বই লিখে তাঁর নামে উৎসর্গ করেন।

সুলতান মওদুদ তুর্কী সেলজুকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও বৈজ্ঞানিকদের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না।

মহাজ্ঞানী আল-বেরুনী তাঁর বয়সের পরিচয় দেবার সময়ও অঙ্কের নিয়মেই দেন। চান্দ্র বছরের হিসাবে তাঁর বয়স যখন ৬৫ বছর, তখন সৌর বছরের হিসাবে তাঁর বয়স ৬৩ বছর।

মওদুদের রাজত্বকালে তাঁর খুবই স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তাঁর ভাষাতেই তা প্রকাশ করা গেল। তিনি একটি পত্রে উল্লেখ করেন, "এখন নানা সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। কতকগুলো রোগ একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে। কতগুলো বা পর পর দেখা দিয়েছে, ফলে। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমি দৈহিক শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। হাড়ঘোড় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। শরীর জরাজীর্ণ।"[১]

এতে বোঝা যায় ৬৩ বছর বয়সে তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। এরপরও তিনি ১২ বছর বেঁচেছিলেন। ফকীহ আবুল হুসেনের মতে আল-বেরুনী শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত স্থির বীর জ্ঞানী ছিলেন।

আল-বেরুনী বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান, বহু সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস, আকাশ তত্ত্ব মৃত্তিকা তত্ত্ব, সাগরতত্ত্ব, উত্তর আটলান্টিক সাগরের তত্ত্ব মানব জাতির জন্য অবদান হিসাবে রেখে গেছেন, কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই রেখে যান নি। তাঁর সংসার জীবন, তাঁর সন্তানাদি ছিল কিনা বা আদৌ বিবাহই করেছিলেন কিনা, আমরা কিছুই জানি না। অথচ-নিদ্রা ছাড়া তাঁর চোখের পাতা বই এর পাতা ছাড়া যেমন কখনও অন্যত্র থাকত না, তেমনি তাঁর

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান ঃ এম. আকবর আলী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯।

www.pathagar.com

কখনও লেখার খাতার পাতা ছাড়া অন্যত্র থাকার অবসর পেত না। প্রফেসর মাপাও বলেন, আল-বেরুনী ছিলেন পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি"। তাঁর এই অগাধ পাণ্ডিত্যের মূল কারণ ছিল, তখনকার পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ভাষায় তাঁর অগাধ দখল।

আল-বেরুনীর মত প্রতিভাবান জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের উন্নত গবেষণাই আরবী ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত করেছিল। সাধারণত অসামান্য প্রতিভাই ভাষাকে উত্তরোত্তর উন্নততর স্তরে উত্তোলন করতে থাকে। তিনি আরবী, পারসী, গ্রীক, হিব্রু, সিরীয় সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাতে লেখা, গবেষণা ও বক্তব্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, সভ্যতার ইতিহাস, দিনপঞ্জীর তালিকা ও ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ, পর্যালোচনা ও গবেষণায় তিনি ছিলেন অসাধারণ মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি।

জ্ঞানকে তিনি এত ভালবাসতেন যে, তিনি তাঁর কৃত গ্রন্থগুলোকে সন্তানের মত ভালবাসতেন।

ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক অবদান সংগ্রহের জন্য প্রায় এক যুগ সাধনা সম্বন্ধে তিনি বলেন,......"এই সমস্ত বিষয়ের সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো বুঝিয়ে দেবার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে পণ্ডিতদের আনিয়ে নিয়েছি। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সততার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সাধারণ্যে প্রচলিত কুসংস্কারগুলো জড়িয়ে নিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে তুলেছেন। আমি তাঁদের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যাকে একসঙ্গে মুক্তা ও গোবর, বহুমূল্য প্রস্তর ও সাধারণ পাথরের সংমিশ্রণ মনে করি। এই সবই তাঁদের চোখে সমান কেননা বৈজ্ঞানিক সততাকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়িয়ে সাধারণের মধ্যকার ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠবার মত সৎসাহস তাঁদের কারুরই নেই।.....

হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর মতামত হলো এই, "তাঁরা বিদেশী-দেরকে (বা অন্য ধর্মীয়গণকে) ম্লেচ্ছ বা অপবিত্র (যবন) বলে জ্ঞান

www.pathagar.com

করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব দূরের কথা, তাদের সঙ্গে খাওয়া বসা বা পান করা পর্যন্ত ঘৃণা করেন। যদি তাঁদের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ এবং অন্য লোকের সঙ্গে মিশবার অভ্যাস থাকত, তা হলে তাঁরা এমন সঙ্কীর্ণমনা হতেন না। বরং তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতই উদার হতেন।"[১]

এরূপ শত্রুমনোভাব সম্পন্ন দেশে, স্তূপীকৃত ঘৃণা বিদ্বেষের আবর্জনার মধ্যে বছরের পর বছর প্রায় এক যুগ ধরে ধ্যাননিমগ্ন থেকে অক্লান্ত-ভাবে জ্ঞান আহরণ প্রচেষ্টা জ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচা-য়ক ছাড়া আর কি হতে পারে?

তিনি টলেমি ও ইয়াকুবের দশমিক অঙ্কের গণনায় ভুল ধরে দিয়ে তার শুদ্ধ সমাধাণ দিয়েছেন। তিনি বহুভুজের বাহুসমূহের পরিমাণ খাওয়ারিজমি প্রমুখের পন্থা অনুসরণ করে-সমাধান করেন।

সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ গণনায় আল-বেরুনী একটি অভিনব ও বিস্ময়কর পন্থা উদ্ভাবন করেন। পন্থাটির বর্তমান নাম হলো, "The Formula of Intarpolation"। এটিকে নিউটনের আবিষ্কার বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে বোঝানোর জন্য সচেষ্ট আছেন। অথচ নিউটনের জন্মের ৫৯২ বছর পূর্বে আল-বেরুনী এই ফর্মুলা শুধু আবিষ্কারই করেন নি, বরং একে ব্যবহার করে বিশুদ্ধ সাইন তালিকা (জিজ)ও প্রস্তুত করেন। অতঃপর এই ফর্মুলাকে পূর্ণতা দান করে তিনি একটি ট্যানজেন্ট তালিকাও প্রস্তুত করেন।

তাঁর সাইন তালিকা ও ট্যানজেন্ট তালিকায় তিনি Sin O° এবং Tan 90° মূল্য একই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন-এই চিহ্নটি হলো Z।

ত্রিকোনমিতির নবজীবনদানকারী নাসিরউদ্দীন তুসী ছিলেন ২৫০ বছরের পরবর্তী মারাঘার শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক ত্রিকোনমিতির জন্য তিনি যে বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে আছেন, তিনিও আল-বেরুনীকেই অনুসরণ করেছিলেন। কোপার্নিকাস বলেছিলেন, পৃথিবী সহ-গ্রহগুলো

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান: এম. আকবর আলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭।

www.pathagar.com

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। একথার জন্য তাঁকে খৃস্টধর্মের গুরুদের হাতে কম নাজেহাল হতে হয়নি। অধুনা পাশ্চাত্য জগত থেকে তাঁকে এই মতবাদের আবিষ্কর্তা হিসাবে প্রচার করা হয়। কিন্তু কোপারনিকাস জন্মের ৪২৮ বছর পূর্বে আল-বেরুনী বলেছিলেন, 'বৃত্তিক গতিতে পৃথিবী ঘুরে'।

আমরা এও দেখেছি যে, আল-বেরুনীর জন্মের ১৪০ বছর পূর্বে বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় সর্বপ্রথম সুনিপুণ তাত্ত্বিক ভিত্তিতে পৃথিবী যে গতিশীল, তা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁরা 'বৃত্তাকারে' ঘুরে কথাটা বলেন নি, সূর্যের অপভু-অনুভু থাকার জন্য একটু অগ্রপশ্চাৎ হয়ে ঘুরে বলে বলেছেন। কিন্তু পৃথিবী ঘূর্ণনে বৃত্তাকার' কথাটা আল-বেরুনী নিজস্ব চিন্তাধারার প্রকাশ নয়, অন্য একজন অখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অভিমত প্রসঙ্গেই তিনি একথা বলেছিলেন মাত্র। তবে পৃথিবী যে স্থির নিশ্চল নয়, ঘূর্ণায়মান একথা তখন আরব বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত ছিল। পৃথিবী যে ঘুরে, এ মতটি কোপানিকাস বা গ্যালিলিওর নয়—আরব বৈজ্ঞানিকদের। একথাটি প্রমাণের জন্য আল-বেরুনীর কানুনে মাসউদী লিখিত দলীলটি এখানে পেশ করা হলো।

"اما انا مشاهدت احة من مال الى نصرة
حذا الراى من المنثورين فى علم الدهنة يلتزم
نزول الفضل الى الارض على القطر عمودا على وجها
بل مسحدرنا على زوايا مختلفة لانضط به لا نحنظ غير
المسامة لان الرجل راى الثقل من الارض حركتن
احدا هما دورية ملبعة اسلم من نقول الكذحو
امة و الاحرى مستنبها لاغذابة ال معدنا الما
يا تذبل اذا من اجصلض الارض تتحدركة يزجب
ذالهوا لادام السامة الراجة واما لايعرف

www.pathagar.com

عن المسامة و الخط الذى ينزل علية ليس عمود
على الارض بالحقيقة بل مايل الى المشرق"

'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' গ্রন্থ থেকে গৃহীত

অর্থ "আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদকে জানি। তাঁর মতে যখন কোন জিনিস উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে, তখন সে জিনিসটি তাঁর পতনের ধারা অনুযায়ী লম্বরেখা ধরেই পড়ে না, বরং একটু বেঁকে যায় এবং বিভিন্ন কোণ করে পতিত হয়। তিনি বলেন যখন পৃথিবীর এক অংশ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এই ছিন্ন অংশটির দুই প্রকার গতি হয়ঃ এক হলো বৃত্তিক গতি, পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যই এর উদ্ভবঃ আর একটি হলো সরল গতি। পৃথিবীর কেন্দ্রে সরাসরিভাবে পতিত হওয়ার জন্য এ গতির উদ্ভব। প্রথমটির জন্য এর পরিবর্তন হয়, দ্বিতীয়টি এর অবস্থানকে ঠিক রাখে। যদি এর সরল গতি থাকত তাহলে এ লম্বরেখার পশ্চিমে পড়ত। কিন্তু সঙ্গে এই দুই গতিই কার্যকরী হওয়ায় এ পশ্চিম-দিকেও পড়ে না কিম্বা ঠিক লম্বরেখাতেও পড়ে না বরং একটু পূর্বের দিকে বেঁকে পড়ে।"

'কানুনে মাসউদী' ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। এসব খণ্ডের মধ্য থেকে কোন কোন খণ্ড বিক্ষিপ্তভাবে অনূদিত হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত অনূদিত না হওয়ায় তার জ্ঞান-গ্রহ থেকে পৃথিবী এখনও বঞ্চিত। কানুনে মাসউদীর ১ম ও ২য় খণ্ড জ্যোতিবিজ্ঞানের মূল সূত্র নিয়ে রচিত। ৩য় খণ্ড ত্রিকোনমিতির উপর রচিত। এতে দুটি তালিকা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ খণ্ডে Spherical Astronomy সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ৫ম খণ্ড গ্রহ, দ্রাঘিমা, চন্দ্র সূর্যের মাপ প্রভৃতি আকাশ তত্ত্বের ও ভূ-তত্ত্বের উপর অক্ষরেখা ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ খণ্ডে সূর্যের গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ৭ম খণ্ডে চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। ৮ম খণ্ডে গ্রহণ ও চন্দ্রের দৃশ্যমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৯ম খণ্ড স্থির নক্ষত্র নিয়ে রচিত হয়েছে। ১০ম খণ্ডে মাত্র ৫টি গ্রহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একাদশ খণ্ডটি শুধু

www.pathagar.com

জ্যোতিষ বিজ্ঞান নিয়েই রচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে দুটি পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। একটি প্রচলিত পদ্ধতি, অন্যটি আল-বেরুনীর নিজস্ব আবিষ্কৃত পদ্ধতি।

আল-বেরুনী জ্যোতিষশাস্ত্রটিকে শুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে উচ্চস্তরের অঙ্ক ও গণিতবিদ, আকাশ ও ভূতত্ত্ব এবং জ্যোতিষবিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী ছাড়া কেউ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ হতে পারে না। তিনি যে কত বড় ফলিত বিজ্ঞানী ছিলেন এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানে তিনি যে কত উচ্চস্তরে স্থানলাভ করেছিলেন, এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। একদিন সুলতান মাহমুদ গযনীতে তাঁর হাজার বৃক্ষের বাগানে গ্রীষ্মাবাসের ছাদে বসে আল-বেরুনীকে বললেন—এই বাড়ির ৪ দরজার কোন্ দরজাটি দিয়ে আমি বের হব, আপনি তা গুণে ঠিক করে একটি কাগজে লিখে আমার কম্বলের নিচে রেখে দিন।

আল-বেরুনী তাঁর আস্তারলব যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষে গণনা করে তাঁর অভিমত একটি কাগজে লিখে সুলতান মাহমুদের কম্বলের নিচে রেখে দিলেন।

তখন সুলতান রাজমিস্ত্রীর সাহায্যে একটি নতুন দরজা সৃষ্টি করে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে দেখেন আল-বেরুনীর কাগজে অনুরূপ কথাই লেখা ঃ "আপনি পূর্ব দিকের দেয়াল কেটে একটি নতুন দরজা করে বেরিয়ে যাবেন।"

কাগজের লেখা পাঠ করে সুলতান রেগে গিয়ে ছাদ থেকে আল-বেরুনীকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। নিচে মশামাছি প্রতিরোধের জন্য জাল পাতা ছিল। সুলতানের আদেশ কার্যকর হওয়ার পর আল-বেরুনী সেই জালে আটকে গিয়ে মাটিতে আস্তে পড়ার ফলে বেশি আঘাত পেলেন না। সুলতান আল-বেরুনীকে পুনরায় ডেকে আনলেন এবং তাঁর চাকরের কাছ থেকে আল-বেরুনীর দৈনিক ভাগ্য গণনার ডায়েরীটা নিয়ে সুলতান দেখলেন, তাতে লেখা আছে, "আমি আজ উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে গেলেও বিশেষ আঘাত পাব না।"

www.pathagar.com

এ দেখে সুলতান আরো রেগে গিয়ে আল-বেরুনীকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর আল-বেরুনীকে কারাগার থেকে মুক্তির সুপারিশ করতে কেউ সাহস পেলেন না। ছয় মাস পরে সুলতানের মনমর্জি বুঝে প্রধান মন্ত্রী আহমদ হাসান একদিন আল-বেরুনীর প্রতি সুলতানের নেক নজর আকর্ষণ করলেন। সুলতান মাহমুদের একথা স্মরণই ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্তি দিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে আল-বেরুনী ছিলেন স্বয়ং বিশ্বকোষ। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থ ছিল জ্ঞানের আধার। কোন অবস্থাতেই এসব অমূল্য গ্রন্থের পরিচয় কম কথায় দেওয়া সম্ভব নয়।

যেমন তাঁর লেখা 'কানুনে মাসউদী' সম্বন্ধে আমরা উপরে যা কিছু তুলে ধরেছি, তা সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র মাত্র। তেমনি তাঁর রচিত 'আছারুল বাকিয়া'……সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে যদি আমরা বলি, এটি প্রাচীন ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সভ্যতার পরিচয় তাহলে তদ্দ্বারা এই পুস্তক সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। তবু কর্তব্য হিসাবেই যতটুকু সম্ভব বল্তে হয়।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই—একথা অসত্য প্রমাণের জন্য য়াহুদীদের তেকুফা পঞ্জিকা গণনা যে টলেমির গণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা আল-বেরুনীই বিশদভাবে প্রমাণ করেন অর্থাৎ ধর্মের অন্তর্নিহিত আচার-অনুষ্ঠানের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক সত্য সৌন্দর্যকেই এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁর বিজ্ঞানালোচনার ১৪০ বছরের পূর্বেকার বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলাফল নির্ভুল বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ধর্মের সঙ্গে ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত এমন নিখুঁত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনা তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি। নিম্নে এই পুস্তকের দু-একটি পরিচ্ছেদের সারমর্ম আলোচনা করা হলো।

৫ম পরিচ্ছেদের পারসী, মাগদিয়াম, খাওয়ারিজমি, মিসরী, পশ্চিমী (স্পেন?) গ্রীক, য়াহুদী, আরব ও সামুদ জাতির দিন ও

www.pathagar.com

মাস গণনা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক (আল-বেরুনী) মন্তব্য করেন, "আমরা হিন্দু, চীনা, তিব্বতীয়, তুর্কী, খাজার, ইথিওপীয় ও নিগ্রো জাতির মাস ও নামগুলো অনুসন্ধান করে জেনে নিয়েছি। কিন্তু ভালমতে না জেনে এখানে আলোচনা করা হবে না।" অর্থাৎ সত্যের বিন্দুমাত্র অমর্যাদাও তিনি মানতে রাযী না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একবর্ষ গণনা পদ্ধতি থেকে অন্য এক বর্ষ গণনার পদ্ধতিতে রূপান্তর এবং কিংবদন্তী অনুসারে বিভিন্ন শাসকদের আমল সম্বন্ধে সময়ানুক্রমিক তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের সময়কাল ।

নিজের 'কিতাবুত্-তাফহিম' গ্রন্থ সম্পর্কে আল-বেরুনী নিজেই বলছেন,......"আমি রায়হানা বিনতে হাসানের অনুরোধে প্রশ্নোত্তর-রূপে সরলভাবে এ গ্রন্থখানি রচনা করেছি। এতে বুঝবার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হবে আমি জ্যামিতি থেকে শুরু করে অঙ্ক, সাইন্স অব নাম্বার, বিশ্বের গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে সর্ব শেষে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।" এই রায়হানা মনে হয়, তাঁর কোন বন্ধুর মেয়ে এবং তাঁর ছাত্রী। আল-বেরুনীর ভাষণ অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। এজন্য সাধারণের বুঝবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয়। তিনি তাঁর ছাত্রী রায়হানার অনুরোধে এই বইটি লিখেন এবং তাঁর নামেই উৎসর্গ করেন। এতে তখনকার যমানাতেও যে শিক্ষিত মহিলারা বিজ্ঞান সাধনা করতেন, তা বোঝাই যায়।

যদিও বইটিকে তিনি বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ হিসাবে সহজ-সরল বলে উল্লেখ করেছেন, তবু এই গ্রন্থের অনুবাদক র‍্যামসে রাইট বলেন, "যদিও গ্রন্থখানি জ্যোতিষ সম্বন্ধে উপদেশাবলী সম্বলিত তবুও একে একাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষে ব্যবহৃত আস্তারলব এবং এই সময়কার সর্বজন সমাদৃত ভূগোল ও তারিখ গণনা সম্বন্ধেও এতে আলোচনা হয়েছে।"

গ্রন্থটি ৫৩০ অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে স্থান পেয়েছে-জ্যামিতি, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, আবার জ্যোতির্বিজ্ঞান তারিখ বিজ্ঞান,-আস্তারলব

www.pathagar.com

জ্যোতিষ (রাশিচক্র), গ্রহাদি, রাশিচক্রের বিভাগ, গৃহাদি, ভাগ্যফল, বিচার জ্যোতিষ।

এছাড়াও এতে রয়েছে বিভিন্ন জাতির মাসের নাম ও দিনের সংখ্যা। ইসলামী মাস। ইসলাম-পূর্ব আরবী মাস। য়াহুদী চান্দ্র মাস। হিন্দু চান্দ্র মাস। সিরিয়ান সৌর মাস। গ্রীক সৌর মাস। মিসরীয় সৌর মাস। পারসী সৌর মাস। মঘদীয় সৌর মাস।

জ্যোতিষ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে রাশিচক্র: মাথা ও মুখ—মেষ রাশি। ঘাড় ও শ্বাসনালী—বৃষ রাশি। বাহু ও হাত—মিথুন রাশি। বুক, পাঁজর, পাকস্থলী, যকৃত—কর্কট রাশি। হৃৎপিন্ড—সিংহ রাশি। পেট নাড়ি ভুরি সহ—কন্যা রাশি। পিঠ ও পাছা—তুলা রাশি। জননেন্দ্রিয়—বৃশ্চিক রাশি। উরু—ধনু। হাটু—মকর। পায়ের নালা—কুম্ভ। পায়ের গোড়ালী—মীন রাশি।

আল-বেরুনী তাঁর ছাত্রীকে সহজ ও প্রাথমিকভাবে সব বিজ্ঞান শিখাতে গিয়ে তিনি কিতাবুত তাফহিমে রূপক কাহিনী বর্ণনা করেছেন এভাবে: একদিন কোন এক মহাসাগর ইচ্ছা করল যে, সে পৃথিবীর মাটিতে অতি ক্ষুদ্র আকারে একটি পুকুর খনন করবে। পুকুরটি কাটা হলে দেখা গেল—পুকুরটি ক্ষুদ্র নয়, সাগরে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ আল-বেরুনীকে যে 'সমুদ্র' বলতেন, ঠিকই বলতেন। ভারত বলত সমুদ্র, ইউরোপ বলত তাঁকে বিশ্বকোষ—দুটোই সত্য।

'কিতাবুত তাফহিম' নামক তাঁর রচিত বিজ্ঞানের 'বাল্য শিক্ষা' বইটিই তাঁর জনৈক ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষার বই হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সবার জন্য বিশ্ববিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষার অমূল্য বিজ্ঞান গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

'কিতাবুল হিন্দ'ও তাঁর আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ। এতে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি সর্বমোট ১১৪টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আল-বেরুনী মৃত্যুর ১৩ বছর পূর্বে একটি পত্রে নিজ গ্রন্থের যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১১৪টি। এর পরবর্তী ১৩ বছরে

www.pathagar.com

হয়ত তিনি আরো অনেক বই লিখেছিলেন। তার সংখ্যা ও পরিচয় আমাদের জানা নেই।

তাঁর ১৯টি গ্রন্থে ভারতীয়দের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩টি গ্রন্থ অসমাপ্ত বলে লেখক প্রকাশ করেন। ৭৫০ ও ৬০৫ পৃষ্ঠার বৃহত্তম গ্রন্থ থেকে ৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকাও এই গ্রন্থ তালিকায় স্থান পেয়েছে। স্থানাভাবে গ্রন্থগুলোর আরবী নাম প্রকাশ সম্ভব হলো না। মাত্র বৃহত্তম দুটো গ্রন্থের এবং মধ্যবর্তী ও ক্ষুদ্রতম একটি পুস্তিকার নাম পরিচয় প্রকাশ করা হলো।

'তাকমিলে মিজে হাবশ বিল ইলাল ওয়া তাহযীবে আমালিহি মিন জালাল' প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আহমদ বিন আবদুল্লাহ হাবাশের নক্ষত্রপুঞ্জের তালিকার ভুল সংশোধন করে প্রামাণ্য তালিকা প্রণয়ন। ৭৫০ পৃষ্ঠা।

"আবু হাসান আহওয়াযীর খাওয়ারিজম সম্বন্ধে গ্রন্থের সংশোধন হিসাবে একখানা গ্রন্থ।" ৬০৫ পৃষ্ঠা। 'ইফরাদুল কাল ফি আমরিল আযলাল'। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছায়াপথ সম্বন্ধে বিশদ ও পূর্ণ আলোচনা। ২০০ পৃষ্ঠা।

'ফি তাবইনে রায়ে বৎলিমুসে ফি মাল খাদায়ি'। ৭ পৃষ্ঠা।

তাঁর 'কানুনে মাসউদী' নামক সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থটিকে তিনি অসমাপ্ত ঘোষণা করায় গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বা আকার সম্বন্ধে কিছুই বলা গেল না। তাঁর 'আজারুল বাকিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি অসমাপ্ত থাকায় তার পৃষ্ঠা-আকার সম্বন্ধেও কিছু বলা গেল না। তাঁর এত সব জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি গল্প-কাহিনীর পুস্তক আছে।

www.pathagar.com

মহাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা

ইবনে সিনা (জ. ৯৮০ খৃ.; মৃ. ১০৩৭ খৃ.)

তাঁর পূর্ণ নাম আবু আলী আল-হুসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে সিনা।

ইবনে সিনা সমৃদ্ধ পরিবারের লোক। তাঁর পিতা খারমাইছানের শাসনকর্তা ছিলেন। অতিশয় বিলাস-ব্যসনের মধ্যেই তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁর মায়ের নাম ছিল সিতারা'। তিনি ছিলেন পারস্যের শিরাজ নগরীর নিকটস্থ আফসানা নামক স্থানের এক ধনিক পরিবারের মহিলা।

ইবনে সিনা শৈশবকাল থেকেই তীক্ষ্ম ধী-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ১০ বছর বয়সেই সমগ্র কুরআন শরীফ হিফ্জ করে ফেলেন। বিদ্যালয়ের পাইকারী শিক্ষা নয়, গৃহশিক্ষায় তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা হয়।

তাঁর তিনজন শিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে ইসমাঈল সূফী ধর্মতত্ত্ব, ফিকহ্ প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। আবু আবদুল্লাহ্ আল-নাতেলী দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি এবং মাহমুদ মস্সাহ্ নামক একজন ব্যবসায়ী অঙ্কবিদের নিকট ভারতীয় অঙ্ক বা গণিত বিদ্যাশিক্ষা লাভ করতেন। এই সব শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ভাষা।

কিন্তু শুধু তাঁর মা-ই যে পারসিক মহিলা ছিলেন, তাই নয়, জাতিতেও তিনি ইরানী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে আরবরা আরবী, ইরানী, তুর্কীয়া তুর্কী জাতীয় লোক বলে দাবি করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ইরানী।

www.pathagar.com

তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল শিক্ষক ছিলেন নাতেলী। নাতেলীর নিকট তিনি ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি, টলেমির আল মাজেস্ট, পরফিরি, ইসাগুজি প্রভৃতি অধ্যয়ন করতেন। ছাত্রজীবনেই তিনি তর্ক-বিতর্কে সুনাম অর্জন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি দৃষ্টে শিক্ষকগণ বিস্মিত হন। নাতেলীর কাছে টলেমির আল মাজেস্ট কিছুটা পড়ার পর শিক্ষক নিজ যোগ্যতার অভাবে ছাত্রকে নিজে নিজে পড়তে নির্দেশ দেন। ফলে ইবনে সিনা নিজেই পড়াশোনা শুরু করেন। ১৪/১৫ বছর বয়সেই তাঁর গৃহশিক্ষা সমাপ্ত হয়।

স্বয়ং সাধনায় তিনি পদার্থবিদ্যা, খগোলশাস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। প্লেটো এবং এরিস্টটলের গ্রন্থও পড়তে শুরু করেন। এর মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। চিকিৎসাবিজ্ঞান তিনি অতি সহজেই আয়ত্তাধীন করে ফেলেন। কিন্তু তিনি দর্শনের কূট তর্ক সম্পর্কে অতিশয় ভীত ছিলেন। দেড় বছর পর্যন্ত চিকিৎসা, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের উপর এমনভাবে পড়াশোনা চালিয়েছেন যে, ঘুমানোর অবসর পেতেন খুবই কম। যখন কোন বিষয় কিছুতেই বুঝতে পারতেন না, তখন মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতেন। অনেক সময় দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান স্বপ্নেও পেয়ে যেতেন।

এরিস্টটলের 'কিতাবু মারাদুত তাবিয়া' গ্রন্থ তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল। কিন্তু ৪১ বার পড়েও এই গ্রন্থটির কিছুই বুঝতে পারেন নি। এতে দর্শনশাস্ত্র তাঁর আয়ত্ত-বহির্ভূত ব্যাপার বলে তিনি মনে করতে থাকেন। একদিন বই-এর বাজারের মধ্য দিয়ে চলার সময় জনৈক বই বিক্রেতা তাঁকে একটি বই কিনার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। ফলে তিনি বইটি কিনে নিতে বাধ্য হন। বইটির নাম হলো 'ফি আগরাজে কিতাবু মারাদুত তাবিয়া'। এতদিন এরিস্টটলের যে গ্রন্থটি তিনি বুঝতে পারেন নি, এটি তারই ভাষ্য। ৪১ বার পড়ার পর মূল গ্রন্থটি তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এবার এই ব্যাখ্যা পড়তে পেরে মূল গ্রন্থটির

www.pathagar.com

বক্তব্য তাঁর নিকট সহজ হয়ে গেল। একে তিনি আল্লাহ্‌র অযাচিত সাহায্য বলে মনে করলেন।

আল-বেরুনী প্রথম জীবনেই চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সেই চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। বহু দূর-দূরান্তর থেকে নামজাদা চিকিৎসকগণও তাঁর পরামর্শের জন্য ছুটে আসতেন।

তাঁর চিকিৎসা নৈপুণ্যের সুখ্যাতি অতি দ্রুত রাজদরবারেও ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। এ সময় সুলতান নূহ ইবনে মনসুর এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। রাজকীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ব্যাধি উপশম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন।

একান্ত তরুণ চিকিৎসক ইবনে সিনাকে আহ্বান করা হয় এবং তিনি অতি সহজভাবেই তাঁকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হন। এতে সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়ী জ্ঞানস্পৃহা দেখে রাজকীয় বিশাল লাইব্রেরী ইবনে সিনাকে ব্যবহারের অনুমতি দেন। জ্ঞানগ্রাহী আব্বাসীয় খলীফাদের বহু পুরাতন জ্ঞান-ভাণ্ডার এই লাইব্রেরীতে সঞ্চিত ছিল।

তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি এই লাইব্রেরীর জ্ঞান দ্রুত আহরণ ও সঞ্চয়ে খুবই কাজে লাগে।

তিনি অনন্য স্মৃতিশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও অফুরন্ত তত্ত্ব-তথ্যজ্ঞান তিনি কাগজে নোট করে করায়ত্ত করেন। এই গ্রন্থাগারে কত যে অফুরন্ত জ্ঞান সঞ্চিত ছিল, তার এক মাত্র নীরব সাক্ষী ছিলেন ইবনে সিনা।

দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থাগারটি অকস্মাৎ আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অনেকে মনে করেন ইবনে সিনার জ্ঞানের সমকক্ষতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরতরে লোপ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করে দেন। কিন্তু একথা বোধ হয় সত্য নয়। কারণ, এত বড় একটি কান্ড করে ইবনে সিনা কিছুতেই রেহাই পেতেন না। তা ছাড়া এ বিষয় সংশ্লিষ্ট রাজশক্তি যখন তাঁর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন নি, তখন এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের কোন কারণ থাকে না। ২১ বছর বয়সে তিনি 'আল-মজমুয়া' নামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। এতে গণিতশাস্ত্র বাদে-তৎকালীন যাবতীয় বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পায়। এটিই তাঁর জীবনের প্রথম পুস্তক। পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর তিনি আরো দুটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একটির নাম হলো 'কিতাবুল হাসিল ওয়াল মাহমেল'; অন্যটির নাম 'কিতাবুল বাররে ওয়াল ইসমে'। 'কিতাবুল হাসিল ওয়াল মাহমেল' গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ গ্রন্থ। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতির কোন অভাব ছিল না। উপরন্তু গ্রন্থ রচনার ফলে পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সৌভাগ্য চিরকালই চঞ্চল। ১০০১ খৃস্টাব্দে তাঁর ২২ বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনে দুর্যোগ দেখা দিল।

পিতৃবিয়োগের পর পিতার রাজকীয় চাকরীতেই তিনি নিয়োজিত হন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই যে সাসানীয় রাজবংশের অধীনে পিতা পুত্র চাকরী করতেন, সেই রাজবংশেরই পতন ঘটে। দিগ্বিজয়ী সুলতান মাহমুদ সাসানী শাসন উৎখাত করে বুখারা দখল করে নেন। ১০০৪ খৃস্টাব্দে ইবনে সিনা বুখারা ত্যাগ করে খাওয়ারিজমের রাজধানী গুরগাঁও (জুরজান) গিয়ে রাজকীয় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নিঃস্ব নিঃসহায় অবস্থায় তিনি খাওয়ারিজমের সুলতান মামুন বিন মাহমুদের মন্ত্রী আবুল হোসেন সোহেলের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। মন্ত্রী সোহেল তাঁকে সুলতানের সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। ১০০৪ থেকে ১০১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি খাওয়া-রিজমে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনই করেন। বিদ্যুৎসাহী মন্ত্রী সোহেলের প্রেরণায় তিনি কয়েকটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে একটির নাম হলো 'কিতাবু কিয়ামিন আরদি ফি ওমাতিন সামায়ি' পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান বিষয়ক গ্রন্থ। অন্য গ্রন্থটি জ্যামিতির কোণের পরিমাপ সম্বন্ধীয়। এখানেই আল-বেরুনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়

www.pathagar.com

হয়। খাওয়ারিজমের আল-বেরুনী এবং ইবনে সিনার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার পর হয়ত অবশিষ্ট জীবনে তাঁদের সঙ্গে আর কোন সাক্ষাৎ হয়নি।

গযনীর সুলতান মাহমুদ আল-বেরুনী, ইবনে সিনা প্রমুখ পণ্ডিতকে গযনীর রাজদরবারে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য একটি পরোক্ষ আদেশ-নামা খাওয়ারিজমের সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। ইবনে সিনা তাঁর কয়েকজন পণ্ডিত সঙ্গীসহ এই অবমাননাকর পরোক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গযনীর সুলতান মাহমুদের ভয়ে খাওয়ারিজম থেকে পলায়ন করেন। ঐতিহাসিক নিজামির মতে, সুলতান মাহমুদ বিশেষভাবে ইবনে সিনাকেই পেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ইবনে সিনার পলায়ন সংবাদ পেয়েই তিনি তাঁর প্রধান শিল্পী আবু নসরের মারফত ইবনে সিনার ৪০ খানি প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়ে নিয়ে এই ছবিগুলো সমগ্র পারস্য ও এশিয়া মাইনরের রাজন্যবর্গের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং ইবনে সিনাকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই ধরে নিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়, ইবনে সিনাকে গযনীতে প্রেরণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষমতা ব্যবহার না করার অপরাধে সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তা দখল করে নিয়ে খাওয়ারিজম সুলতান মামুন বিন মাহমুদকে হত্যা করেন। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে সিনা দুর্যোগের অকূল সাগরে ভাসলেন। দিনের বেলা দুর্গম মরুভূমি ছাড়া বস্তি এলাকায় চলা ভয়াবহ বিপজ্জনক। খাওয়ারিজম সুলতানকে হত্যা করে খাওয়ারিজম দখল করা হয়ে গেছে। পারস্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজন্যবর্গ ভয়ে প্রকম্পিত। কোন সময় কার রাজ্য কোন অজুহাতে সুলতান মাহমুদ দখল করে নেন, এ চিন্তা নিয়ে সবাই তটস্থ। সুতরাং ইবনে সিনাকে ধরিয়ে দিতে কেউ যে দ্বিধা করবেন না, তা বলাই বাহুল্য। ইবনে সিনা এবং আবু সহল সারারাত হেঁটে একটা সরাইখানায় এসে পৌঁছলেন। দুই বন্ধুই জ্যোতিষ বিজ্ঞানী। দুই বন্ধুই পৃথকভাবে নিজ নিজ ভাগ্য গণনায় বসে গেলেন। ইবনে সিনার গণনার ফল হলো, পথ হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হবেন। সহলের গণনার ফল হলো, তিনি পথ হারিয়ে এমন

www.pathagar.com

বিপদগ্রস্ত হবেন যে, এ বিপদ থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবেন না। তাঁরা বুঝলেন, এই দেখাই তাঁদের শেষ দেখা। আর কোনদিন তাঁদের মধ্যে দেখা হবে না। দুই বন্ধুই যাত্রা করলেন।

তাঁদের মহাবিপদের যাত্রাপথের ঘটনা ইবনে সিনার ভাষাতে বলাই সর্বোত্তম, "আমাদের যাত্রার চতুর্থ দিনে দিগন্ত বিস্তার করে উঠল ভীষণ ঝড়। সারা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। যমপুরীর ভীষণ অন্ধকার সারা দুনিয়া ছেয়ে ফেলেছে। বালুকণা তীরের মত আমাদের শরীরে বিঁধছে। এরই মধ্যে আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। সমস্ত পথ বালুতে আচ্ছন্ন--সঠিক পথ কোন্‌টি, তা নির্ণয় করার আর উপায় রইল না।"[১]

যখন ঝড় থেমে গেল, দেখা গেল তাঁরা গন্তব্যস্থল থেকে বহু দূরে সরে এসেছেন। সহল মরুভূমির ভীষণ উত্তাপে ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর অবস্থায় মারা গেলেন। পথ প্রদর্শক খাওয়ারিজমের দিকে চলে গেলেন। ইবনে সিনা তুস নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ইবনে সিনার পিতা ছিলেন ইসমাঈলী মতবাদের লোক। সুলতান মাহমুদ এই মতবাদের হাজার হাজার লোককে ফাঁসি দিয়েছিলেন। ইবনে সিনা মনে করতেন, ইসলাম সম্পর্কে তিনি যেরূপ উদার পন্থী লোক, ধর্মোন্মাদ সুলতান মাহ্‌মুদ কিছুতেই তাঁকে সহ্য করবেন না। বিশেষ করে সুলতানের মত মহতোদ্দেশ্যই থাক, প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিতদের তিনি জোর করেই গযনীতে নিতে চেয়েছিলেন। এই বল প্রয়োগ স্বাধীনচেতা ইবনে সিনার সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করে। এজন্য তিনি সুলতান মাহ্‌মুদের আমন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

ইবনে সিনা জানতেন, গুরগাঁওয়ের সুলতান কাবুস ছিলেন বিদ্যুৎ-সাহী ও নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত। এজন্য সেখানে অবস্থানই কিছুটা নিরাপদ মনে করে তিনি গুরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

কিন্তু সেখানে পৌঁছেও আত্মগোপনের পন্থাকেই তিনি প্রথামবস্থায় শ্রেয় মনে করেন এবং এক সরাইখানায় আশ্রয় নেন।

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ঃ এম. আকবর আলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬০।

www.pathagar.com

মানিক লুকিয়ে থাকতে পারে না। তিনি যে একজন অসামান্য চিকিৎসক একথা জানাজানি হয়ে পড়ে। তাঁর সুখ্যাতি দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। একই জের ধরে সুলতানের জনৈক আত্মীয়ের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রাজসন্দর্শনে যেতে বাধ্য হন। বস্তুত কাবুসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কোন আগ্রহ ছিল না।

সুলতান মাহমুদের প্রেরিত ইবনে সিনার ছবি কাবুসের হাতেও ছিল। তিনি তাঁকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন, "এ নিশ্চয়ই ইবনে সিনা।"

সিনা বহুদিন পরে নিজের পরিচয় প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন। কাবুস তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তিনি তাঁকে ন্যায়-শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিশাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করলেন। ইবনে সিনা আবার দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা, অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করলেন।

কিন্তু তাঁর এ সুযোগও স্থায়ী হলো না। ১০১২ খৃস্টাব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানে কাবুস নিহত হন। ষড়যন্ত্রে নাকি তাঁর পুত্রই জড়িত ছিল।

কাবুসের পতনের পর ইবনে সিনা রাই-এর দিকে পলায়ন করেন। অথবা মতান্তরে প্রথম দেহস্তানে যান। যাহোক, দেহস্তানে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সুস্থ হওয়ার পর আবার গুরগাঁওয়ে ফিরে এসে সাহিত্য সাধনায় মন দেন। গুরগাঁওকে মর্যাদা দিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম রাখেন 'আল-আওসাফী আল-জুরজানী'। এবারকার গুরগাঁওয়ে এসে দুইজন বিশিষ্ট বন্ধুর সাহায্যলাভ করেন। তাঁরা হলেন আবু মুহাম্মদ শিরাজী এবং আবু ওবায়েদ জুজমানী। শিরাজী সাহেব নিজের বাড়ির কাছেই তাঁর থাকবার জন্য উন্নত ব্যবস্থা করে দেন।

এখানে এসে প্রথমেই দুটো বই লিখেন। বিশেষভাবে পরম বন্ধু জুজমানী তাঁর পরম ভক্ত ও শিষ্যে পরিণত হন। জুজমানী তাঁর কাছে লজিক ও আল-মাজেস্ট অধ্যয়ন করতেন। অবসর সময় ইবনে সিনা মুখে মুখে বলে দিতেন, জুজমানী লিখে যেতেন। এইভাবে যে গ্রন্থটি লিখা হয়, তার নাম হলো 'আল-মুখতাসারুল

www.pathagar.com

আওসাত আল-মনতেক'। ইবনে সিনার 'কানুন' গ্রন্থটিও এখানেই লেখা হয়। আরও কয়েকটি গ্রন্থও এখানে প্রণয়ন করেন। ইবনে সিনার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জুজমানী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জুজমানী প্রকৃতপক্ষে ইবনে সিনার জীবনী লেখক। মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি তিনিই প্রকাশ করেন।

ইবনে সিনা এখান থেকে রাই-এ চলে আসেন। বলখের মত রাই পারস্যের একটি উন্নত নগর। এ ছিল বুয়াইদ শাসকদের রাজ্য। তিনি চিকিৎসক হিসাবেই রাজদরবারে স্থানলাভ করেন। সুলতান ফখর-উদ-দৌলার পুত্র মাজদ-উদ-দৌলা কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে রোগমুক্ত করেন। মাজদ-উদ-দৌলা তাঁকে প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন দান করেন এবং অচিরেই পরস্পর বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হন।

ফখর-উদ-দৌলার অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী সাইদা বেগম রাজ্য শাসনের দায়িত্ব লাভ করেন। সাইদা বেগমও তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু মাজদ-উদ-দৌলা বন্ধু হিসাবে এবং বয়োপ্রাপ্ত যুবরাজের সিংহাসনারোহণের জন্য ইবনে সিনার জোরদার রাজনৈতিক সমর্থনে সাইদা বেগম অসন্তুষ্ট হন। ইতিমধ্যেই সাইদার পরলোকগমনে মাজদ-উদ-দৌলা স্বাভাবিকভাবেই সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তিনি শাসনকার্যের অযোগ্য ও নারী-বিলাসী ছিলেন।

মাজদ-উদ-দৌলার অন্যতম ভ্রাতা শামস-উদ-দৌলা রাজ্য আক্রমণের জন্য এলে মাজদ-উদ-দৌলা ভীত হয়ে গযনীর সুলতান মাহমুদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইবনে সিনা তখন তাঁর মন্ত্রী পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁকে উপেক্ষা করে, চিরবৈরী সুলতান মাহমুদকে আহ্বান করায়, ইবনে সিনা রাই ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখানে তিনি ৩ বছর ছিলেন।

রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়ায় লেখাপড়ার ক্ষতি হলেও এখানে ইবনে সিনা 'কিতাবুল মায়াদ' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

রাই ত্যাগ করে তিনি হামাদানে গমন করেন। হামাদানের শাসনকর্তা ছিলেন সেই শামস-উদ-দৌলা, যার ভয়ে মাজদ-উদ-দৌলা

www.pathagar.com

সুলতান মাহমুদের সাহায্য চেয়েছিলেন। এখানেও প্রথমে চিকিৎসক হিসাবে শামস-উদ-দৌলার রাজপ্রাসাদে তাঁর ডাক পড়ে। ৪০ দিন চিকিৎসা করে তাঁর শূল বেদনাকে তিনি উপশম করেন। এতে সুলতান খুশী হয়ে তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন এবং তাঁকে মন্ত্রীপদ দান করে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

হামাদানেও ইবনে সিনা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। কিছুদিন মন্ত্রীত্ব চলাবার পর জীবনের উপর আবার দুর্যোগ দেখা দিল। হঠাৎ রাজকীয় সৈন্যগণ ইবনে সিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে বন্দী করে শামস-উদ-দৌলার নিকট তাঁর প্রাণদণ্ডের দাবি জানাল।

সুলতান সৈন্যদের দাবি সমর্থন করতে না পারলেও বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পেলেন না। এজন্য তিনি সিনাকে গোপনে মুক্তি দিয়ে আত্মগোপন করে থাকার পরামর্শ দিলেন। ইবনে সিনা তাই করলেন।

ইতিমধ্যে শামস-উদ-দৌলার আবার গুরুতর অসুখ দেখা দিল। রাজকীয় চিকিৎসক ব্যর্থতা বরণ করলেন। ইবনে সিনার জন্য তখন সবাই ব্যাকুল। তাঁকে খুঁজে বের করা হলো। সুলতানকে তিনি আবার আরোগ্য করলেন। তাঁকে ক্ষমা ঘোষণা করে আবার মন্ত্রীত্বের পদে বহাল করা হলো।

এই সব দুর্যোগের মধ্যেও ইবনে সিনার জ্ঞান-সাধনা অব্যাহত ছিল। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি গ্রন্থ 'কিতাবুশ শিফা' ও 'কানুন'-এর রচনাকার্য অব্যাহতভাবেই চলছিল।

শামস-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর পুত্র তাজুল মুলক মসনদে আরোহণ করেন। এবার সৈন্যরা ইবনে সিনাকে পূর্ণ সমর্থন করে মন্ত্রীত্বের জন্য অনুরোধ করলেও তাজুল মুলকের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক হলো না। তিনি ইস্পাহানের শাসনকর্তা আলাউদ-দৌলাকে সমর্থন করায় তাজুল মুলক তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। আলাউদ-দৌলা এ সংবাদ জানতে পেরে হামাদান আক্রমণ করলে ভয় পেয়ে ইবনে সিনার বন্দী দুর্গেই তাজুল মুলক আশ্রয় নেন। আক্রমণকারীরা সামরিক

www.pathagar.com

হুমকি দিয়েই ফিরে যান। এই ফাঁকে ইবনে সিনা সঙ্গীসহ পলায়ন করে ইস্পাহানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইস্পাহানের কাছাকাছি পৌঁছলে আলাউদ-দৌলা তাঁকে সসম্মানে আমীর ওমরাহ পাঠিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান। ইবনে সিনাকে সুলতান মন্ত্রীত্বের পদে বহাল করেন এবং সুন্দর সুসজ্জিত বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের সমস্ত জ্ঞানী-গুণীকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে ইবনে সিনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।

ইস্পাহানে এসে ইবনে সিনা একটু স্থির জীবন যাপন করতে শুরু করেন। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালনের অবসর সময়ে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর বিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থ 'কিতাবুশ শিফা' এবং 'কানুন' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এখানে তিনি আরো বহু পুস্তক রচনা করেন।

গযনীর সুলতান মাহমুদের ভয়ে আলাউদ-দৌলাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সুলতান মাহমুদের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসার জন্যও তিনি উদগ্রীব ছিলেন। সুলতান মাহমুদের রাই দখল করার পর থেকেই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু আশা তাঁর ফলবতী হলো না।

১০৩০ খৃস্টাব্দে সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান মাসউদ যখন ইস্পাহান আক্রমণ করেন, তখন আলাউদ-দৌলা ও ইবনে সিনা পালিয়ে যান। ইবনে সিনার বাড়ি লুণ্ঠিত হয় এবং তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ গযনীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইবনে সিনা মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সমস্ত কাজ এত সুশৃঙ্খল ছিল যে, ঐতিহাসিক নিজামীর ভাষায় 'তাঁর কাজ কারবার এমন সুশৃঙ্খল (ও) সুচারুরূপে সম্পন্ন হতো যে, মহামতি আলেকজাণ্ডারের মন্ত্রী এরিস্টটলের সঙ্গেই শুধু তাঁর উপমা চলতে পারে। আলেকজাণ্ডারের পর আর কোন নৃপতিই এমন বিচক্ষণ সুপণ্ডিত জ্ঞানী মন্ত্রী পান নি।'[১]

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : এম. আকবর আলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৯।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক কিফতীর মতে ইবনে সিনা অত্যন্ত কামুক ছিলেন। এজন্য অকালে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। শূল বেদনা রোগে আক্রান্ত হন। আলাউদ-দৌলার সঙ্গে এক যুদ্ধ অভিযানে সঙ্গী হয়ে পরাজিত অবস্থায় পলায়নের সময় পথিমধ্যে শূল বেদনা এবং তাঁর মৃগী রোগের জন্য তিনি নিজস্ব ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী ঔষধ প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর নিয়োজিত চিকিৎসক ইনজেকশনে ২ গ্রেনের স্থলে ৫ গ্রেন ঔষধ ব্যবহার করেন এবং তাঁর ক্রীতদাসও তাঁর এমন দুঃসময়ে বেঈমানী করায় রোগের মাত্রা বেড়ে যায়। যা হোক, তবু তিনি কিছু দিন পরে সুস্থ হন। আলাউদ-দৌলা হামাদান আক্রমণ করার সময় তিনি তাঁর সঙ্গী হয়ে পুনরায় রোগাক্রান্ত হন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার শক্তিদাতা আর শক্তি দিতে পারছেন না। এখন আর আমার রোগ সারানোর চেষ্টা করার কোন দরকার নেই।' তিনি জীবনের আশা ছেড়ে দেন এবং ৫৭ বছর বয়সে জ্ঞানের মহাকাশ থেকে এই উজ্জ্বল জ্যোতি অকালে খসে পড়ে।

ইবনে সিনার সাথে ভিন্নমত পোষণকারী ইবনে ইউনুস নামে জনৈক বিখ্যাত কবি ইবনে সিনার মৃত্যু সম্বন্ধে যে কবিতাটি লিখেন, সেই আরবী কবিতার বাংলা অর্থ হলো ঃ

> ইবনে সিনাকে দেখেছি লোকের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলো জেলখানায়, (কোষ্ঠবদ্ধতায়) একটি অসম্মান মৃত্যু। 'শিফা'-তে (রোগ আরোগ্যকারী) তাঁর উদ্ধার হলো না। 'নাজাতেও' (অর্থ, মুক্তি। শিফা-নাজাত তাঁর লেখা দুটি বই) তাঁর মৃত্যু রোধ করতে পারল না।

তাঁর আভিজাত্য বোধের জন্যই সাধারণভাবে তাঁকে কোন কোন সময় গর্বিত ও দাম্ভিক মনে করা হতো। দ্বিতীয়ত, ইসলাম সম্পর্কে তিনি এত উদার মতাবলম্বী ছিলেন যে, ধর্মান্ধ গোড়া পন্থীরা তাঁকে ইসলামের প্রতি উপেক্ষা ও বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করতেন। দাম্ভিক, চরিত্রহীন, নারীলোভী, অধার্মিক হিসাবে সুপরিচিত হওয়ায় রাজনীতির বহু সুযোগের মধ্যেও ইবনে সিনা তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। এজন্য তাঁকে সেনাবিদ্রোহের সম্মুখীন পর্যন্ত হতে হয়েছিল। প্রদীপ্ত সূর্য যেমন সকল অন্ধকারকে নাশ করে দেয়, তেমনি তাঁর

www.pathagar.com

ইবনে সিনা জীবনের শেষ ৮ বছর ইস্পাহানে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে জ্যোতিবিজ্ঞান সাধনা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকেন।

ইবনে সিনা ও আল-বেরুনী উভয়েই সমসাময়িক প্রায় সমকক্ষ প্রতিভাধর ছিলেন। ওঁদের প্রতিভার তারতম্য বলা মুশকিল। উভয়ই অনন্য। উভয়ই সর্বমুখী প্রতিভাধিকারী এবং ঘনিষ্ঠত্ব ও সমাজ ছিল তাদের রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে। ইবনে সিনা নৃপতিদের প্রিয় পাত্রও ছিলেন। তাঁদের কারাগারেও ছিলেন। তেমনি আল-বেরুনী সুলতান মাহমুদের নজরবন্দীও ছিলেন, কারাগারেও ছিলেন এবং সুলতান মাহমুদ, মাসউদ ও মাওদুদের প্রিয়পাত্রও ছিলেন। উভয়ই রাজকীয় উত্থান-পতন ও ভাগ্য বিপর্যয়ে আকাশ থেকে ভূ-তলে পড়ে চরম দারিদ্র্য-দুর্ভোগেও অভ্যস্ত ছিলেন। টাকা যে জীবন জীবিকার জন্য কত প্রয়োজন, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যথেষ্ট প্রয়োজন বোধও করেছেন। কিন্তু গুণমুগ্ধ সুলতান কাবুস ইবনে সিনাকে তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ দান করতে চেয়েছিলেন। তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আল-বেরুনীকে সুলতান মাসউদ এক হস্তী পরিমাণ রৌপ্য দান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

উভয়ই জীবন ধরে দিয়ে, বিশ্ব পরিচয় দিলেন, কিন্তু আত্মপরিচয়ে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। ইবনে সিনার স্ত্রী-পুত্র ছিল কিনা, আদৌ বিবাহ করেছিলেন কিনা—এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনিও সম্পূর্ণ নীরব। আল-বেরুনীও নিজস্ব জীবন প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন।

এরিস্টটলের 'হেভেন' গ্রন্থের ১০টি ভুল আবিষ্কার করে আল-বেরুনী তাঁর যুবক বন্ধু ইবনে সিনার নিকট উত্তর চেয়েছিলেন। কারণ, ইবনে সিনা এরিস্টটলের সমর্থক ছিলেন। সেই দশটি প্রশ্ন এই।

১. আকাশ ভারী, পাতলা নয়—এরিস্টটলের এই মত অযৌক্তিক। ২. ব্রহ্মাণ্ডের শুরু নেই—একথা ঠিক নয়। ৩. দিক ৬টি। দিক অনন্তও হতে পারে। ৪. এরিস্টটলের আনবিক মতবাদে বিরোধ এবং বস্তুর অনন্ত বিভাজ্য মতও সমান ভুল। ৫. এই একটি সৌর জগত ছাড়া আর সৌর জগত নেই মতবাদ ভুল। ৬. আকাশের গঠন উপবৃত্তব্য; বৃত্তাকার গঠন মতবাদ ভুল। ৭. পূর্বদিক 'ডান'

www.pathagar.com

সৌরকরোজ্জ্বল বিভিন্নমুখী প্রতিভা তাঁর সকল দোষকে সর্বদা নির্মূল করে দিয়ে মানুষের মনে জোর করে স্থান করে দিত।

তাঁর লেখা 'লিসানুল আরব' গ্রন্থটি অসমাপ্ত রেখেই তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এই পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করতে আর কেউ সাহস পান নি। কিন্তু 'ডাস ক্যাপিট্যাল'-এর চতুর্থ খণ্ডটি অসমাপ্ত রেখে কার্ল মার্কস মৃত্যুবরণ করলে সে খণ্ডটি সমাপ্ত করার মত লেখকের অভাব হয়নি।

ইবনে সিনার দ্রুত ও অত্যুন্নত লেখার শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর লেখা 'আল-মুখতাসারুল আওসাত ফিল মনতেক' সহ 'কিতাবুল নাজাত' গ্রন্থের কতগুলো আপত্তিকর বক্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়ে শিরাজের মহামান্য কাযী সাহেব নিজস্ব দূত প্রেরণ করেন। ইবনে সিনা এশার নামায থেকে ফজরের নামাযের সময়সীমার মধ্যে প্রায় শত পৃষ্ঠার কাগজে জ্ঞানগর্ভ ও সন্তোষজনক জবাব লিখে দিয়ে কাযী সাহেবকে অবাক করে দেন। এই ১০০ পৃষ্ঠার জবাবটি ছিল একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ পুস্তক। অথচ ইবনে সিনা এটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে লিখে-ছিলেন। শুধু কাযী সাহেব নয়, যে সময়ে যে রাজ্য শাসকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, প্রত্যেকেই তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে সমর্থক সাজতে বাধ্য হয়েছিলেন। বহু লোক যে তাকে কাফির মনে করত, তাও তিনি জানতেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মতাদর্শের প্রতিফলনে একটি কবিতাও রচনা করেন। তাঁর বাংলা অর্থ হলো এই :

> কাউকে এমনি কাফির বলা সোজা ব্যাপার মোটেই নয়। ঈমানে কেউ আমার চেয়ে কোনক্রমেই দৃঢ় নয়। আমার মত লোকই যদি এই দুনিয়ায় কাফির হয়, মুসলমান কি আছে কোথাও ? সেটাও ভেবে দেখতে হয়।

বদরউদ্দীন আলাভী তাঁর বেশ উচ্চস্তরের ২২টি কবিতার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর একটি কবিতা অধ্যাপক আলাভী, আবি ওসায়বিয়া, খাল্লিকান, আমুলি, কাশকাউল, এলিয়ান, মারকিস, দ্য স্লেল, কারবেন দ্য-ভো (ফরাসী ভাষায়) প্রমুখ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেন। এত সংখ্যক অনুবাদের দ্বারাই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

www.pathagar.com

হায়সাম ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক

কুশিয়ার ইবনে লাব্বান (৯৭১—১০৩৯)

লাব্বান গণিতের মধ্যে ত্রিকোনমিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। তবে ত্রিকোনমিতিতেই তাঁর অধিক দক্ষতা প্রকাশ পায়।

তিনি আবুল ওয়াফার ত্রিকোনমিতির অনুসরণ এবং এর আরও উৎকর্ষ সাধন করেন। জ্যোতিবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে 'আজ-জিজ আজ-জামি ওয়াল বালিগ' নামে একটি তালিকা তৈরী করেন। তাঁর মাতৃভাষা ফার্সী হলেও তিনি এই 'জিজ' আরবীতে রচনা করেন। এর গুরুত্বের প্রমাণ এই যে, অচিরেই এই 'জিজ'-টি (তালিকাটি) ফার্সীতে অনুদিত হয়। একে আংশিকভাবে অধ্যাপক ইডিলার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বার্লিনে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। তার একটি তালিকায় ৪৫টি স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে এমনি ৯১টি স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ দেখানো হয়েছে।

জ্যোতিষী গণনার জন্য ইয়াজদিগিরদ বছরে ৩০টি নক্ষত্রের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ দেখানো হয়েছে। গ্রন্থের শেষে আলেকজান্দ্রিয় ১১৯৩ বছরের ৩০টি নক্ষত্রের এমনি তালিকা দেওয়া হয়েছে। জিজে ত্রিকোনমিতির জটিল অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণ, পর্যবেক্ষণ দ্বারা জ্যোতি-বিজ্ঞানকে উন্নতমানের পর্যালোচনা করা হয়েছে। জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অঙ্কের গ্রন্থটি হিব্রুতে অনুবাদ হয় এবং তা এখনও বর্তমান আছে। ব্রকেলম্যান তাঁর ৬ টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

ইবনুল হুসায়ন

তিনি অখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলেও সাধনা ছিল উচ্চাঙ্গের। জ্যামিতিই ছিল তাঁর প্রধান সাধনার বিষয়। বীজগণিতেও তাঁর অনন্য দক্ষতা ছিল। তাঁর প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থটি 'মঁসিয়ে উপেক' এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি 'কারা দ্য-ভো ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ব্রকেলম্যান তাঁর ৩টি গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইবনে তাহির

নিশাপুর ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি হিসাবে বিখ্যাত হলেও তার পূর্ব থেকেই সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার সূত্রপাত হয়। ৯ম শতাব্দীতে 'আরজানি' ও ১১ শতাব্দীতে ইবনে তাহির—এই দুই বৈজ্ঞানিকের উন্নত সাধনাই তার প্রকৃত প্রমাণ। মুসলিম দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে ইবনে তাহির গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন হাদীস-বেত্তার মতবাদ সম্বন্ধেও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর নাম হলো 'কিতাবুল ফারক বায়নুল ফারাক'। তিনি শাফী মতাবলম্বী ছিলেন। সম্পত্তি বন্টন উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অন্ততঃ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে ইসলামে যে কোন বিরোধ নেই তিনিও তাঁর অন্যতম প্রমাণ। গণিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলো বই লিখেন। তন্মধ্যে 'আত-তাক্‌মিল' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রকেলম্যান তাঁর ৮টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন।

খলীফা হাকিম (মৃত্যু ১০২১ খৃস্টাব্দ)

তিনি মিসরের খলীফা ছিলেন এবং ১০০৫ খৃস্টাব্দে 'দারুল হিকমা' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, কবিতা, সমালোচনা, আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, শব্দ বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রাজপ্রাসাদে একটি প্রকান্ড লাইব্রেরীও স্থাপন করা হয়। যুগ যুগ ধরে রাজকীয় লাইব্রেরীতে সাধারণ সুধীগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি সেই ব্যবস্থা রহিত করেন। ফলে সাধারণ সুধীবৃন্দের পড়াশুনা ও জ্ঞানালোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মিসর, স্পেন ও বাগদাদের

www.pathagar.com

মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। তখন ইউরোপ অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

খলীফা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিজ্ঞানালোচনায় যেমন ছিলেন বিচক্ষণ জ্ঞানী, দয়ামায়া, উদারতায় সমুন্নত, তেমনি রাজ্য শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় ছিলেন খামখেয়ালী। যখন যা খুশী আদেশ দিয়ে বসতেন, যাকে খুশী প্রাণদন্ড দিয়ে দিতেন। এ কথায় তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অধ্যাপক হিট্টির মতে 'খলীফা হাকিম' জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পাগলামীর ব্যতিক্রম ছিলেন না। হিট্টির ভাষায় 'তিনি (খলীফা) কায়রোতে যে দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন, ৩ বছর পরে সেটাকে শুধু ধ্বংসই করেন নি, সেখানকার সমস্ত অধ্যাপককেই ফাঁসি দেন।"

নতুন ধর্ম প্রবর্তনের লোভে তিনি ভারত সম্রাট আকবরের মত নিজকে নতুন ধর্ম প্রবর্তক বলে দাবি করেন।

তিনি উন্নত মানমন্দির স্থাপন করে বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের মত সারারাত মানমন্দিরে গবেষণা চালাতেন। এই বিচিত্র চরিত্রের বৈজ্ঞানিক খলীফা ১০২১ খৃস্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী গতানুগতিকভাবে সুদূর পাহাড়ে অবস্থিত মানমন্দিরের দিকে রওয়ানা হন। সারারাত মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ কার্য সমাপন করে সকাল বেলা সহচর বিদায় করে দিয়ে একাকী মরুভূমির দিকে যাত্রা করে আর রাজধানীর দিকে ফিরে আসেন নি। গাধাটিকে আহত অবস্থায় এবং তার সাতরঙ্গা জামাটিতে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ৪ বছর পরে একজন স্বীকার করে যে, খলীফা হাকিমকে তাঁর পয়গম্বর দাবির ধর্মদ্রোহিতার জন্য সে হত্যা করেছে।

ইবনে ইউনুস (মৃত্যু ১০০৯ খৃস্টাব্দ/৩৯৯ হিজরী)

ইবনে ইউনুস ভূগোলে পারদর্শী ছিলেন। খলীফা আল-আযীযের আদেশে তিনি ৯৯০ খৃস্টাব্দে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের তালিকা প্রস্তুত শুরু করেন। খলীফা আযীযের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেই তালিকা সম্পূর্ণ করার কার্য চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিতে থাকেন। সেই নৃপতির উৎসাহে ইবনে

www.pathagar.com

ইউনুস সুদীর্ঘ ১৮ বছরের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় তালিকা সমাপ্ত করেন। এতে জ্যোতিবিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য এবং তাঁর আবিষ্কার বিস্তারিতভাবে স্থান লাভ করে। জিজটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে তখনকার সমস্ত বিজ্ঞান জগত থেকে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ' বৈজ্ঞানিক হিসাবে অভিনন্দন জানানো হয়। তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবুল ওয়াফা এই তালিকা তৈরির বহু পুর্বেই তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিদ বলে অভিনন্দন জানান। তাঁর জিজ প্রকাশের সুখ্যাতি টলেমির সুনামকেও ম্লান করে দেয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ওমর খৈয়াম এই প্রকান্ড তালিকা ফারসীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে নাসির উদ্দীন তুসী এই জিজকে মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। চীনা বৈজ্ঞানিক চো চিউ কিং তার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থে এর তথ্যাদি হুবহু উল্লেখ করেন।

এতে জ্যোতিবিজ্ঞানের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ ফল এবং গণিত শাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, নতুন ও পুরাতন মতবাদের পর্যালোচনা এবং তার নিজের নতুন নতুন আবিষ্কার সন্নিবেশিত ছিল।

সম্পূর্ণ জিজটি পাওয়া যায় না। হয়ত কিছু কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর কিছু কিছু অংশ লিডেন অক্সফোর্ড, প্যারী, ইস্কুরিয়েন, বার্লিন এবং কায়রোতে পাওয়া গিয়েছে।

জিজ লেখার উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী বিভিন্ন জনের প্রস্তুত জিজে পার্থক্য ও ভুলক্রটি দৃষ্টে একটি বিশুদ্ধ জিজ প্রস্তুত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তিনি পূর্ববর্তী ১১টি জিজের নাম উল্লেখ করেন। এসব থেকে তিনি গ্রহগুলোর মধ্যগতিসহ বহু উদ্ধৃতি দেন এবং নানা পর্যবেক্ষণের ফলও লিপিবদ্ধ করেন।

পূর্বেকার গোলীয় জ্যোতিবিজ্ঞানের বহু অমীমাংসিত কঠিন সমস্যার সমাধান তাঁর অপূর্ব কৃতিত্ব।

আবুল ওয়াফার সমতুল্য না হলেও ত্রিকোনমিতিতে তাঁর অবদান নগণ্য নয়। ত্রিকোনমিতির সমস্যাগুলোর সমাধানে পূর্বেকার ষষ্ঠিক ভগ্নাংশের গুণনের স্থলে শুধু যোগ করেই এই ফরমুলা অনুসারে এ সব সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কারাগৃহের নির্ণয়ে এ পর্যন্ত পূর্বতন বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকই তাঁদের নিজ নিজ অঙ্ক শক্তি কিছু না কিছু হলেও প্রয়োগ করেছেন। ইবনে ইউনুস কারাগৃহের দিক

www.pathagar.com

নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে গিয়ে এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। ফরমুলাটি হলো এই, দুইটি স্থানের মধ্যকার সময়ের পার্থক্য হলো স্থান দুটির দ্রাঘিমার পার্থক্যের সমান। যদি একই সময় দূরে দূরে অবস্থিত দুটি স্থানের স্থানীয় সময় নিরূপণ করা যায়, তাহলে তাদের দ্রাঘিমার পার্থক্যও অতি সহজেই নিরূপিত হয়। পদ্ধতিটি হলো এই—চন্দ্রগ্রহণের সঠিক সূচনা সময়ের অনুসারে গণনা করলেই দুটি স্থানের সময়ের পার্থক্য গণনা করা যায়। সেকালে বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানের সঠিক সময় নিরূপণ কার্যে বৈজ্ঞানিকগণ এই অসাধারণ নিয়মই প্রয়োগ করতেন। আল-বাত্তানী, আবুল ওয়াফা প্রমুখ বৈজ্ঞানিক প্রথমেই গোলীয় ত্রিকোনমিতির ফরমুলা গ্রহণ করেন।

তারপর চন্দ্রগ্রহণকে কেন্দ্র করে একই সময়ে দুটি স্থানের মধ্যকার সময়ের পার্থক্য দুটি দ্রাঘিমার সমপার্থক্যের অঙ্কের দ্বারা বিভিন্ন স্থানের সময় নিরূপণ ও সঠিক দিক নির্ণয়ে তাঁরা সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, ইউনুস এই পদ্ধতিতে টলেমির ভূগোলের বহু ভুল সংশোধন করেন।

পূর্বে প্রায় প্রত্যেক জ্যোতিবিজ্ঞানী জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়েও আলোচনা করতেন। তিনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

তিনি মিসরের খলীফা আযীয বিল্লাহর আদেশে পূর্বোক্ত জিজ প্রস্তুত করেন। এই খলীফাই আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

খলীফা আবদুল আযীয একদিন কি একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। ইবনে ইউনুস জুতো হাতে নিয়ে গিয়ে সরাসরি দরবারের মাঝখানে গিয়ে বসেন। তারপর বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আর্কিমিডিসের মত—"পেয়েছি, পেয়েছি" বলতে বলতে কাউকে কিছু না বলেই সোজাসুজি চলে আসেন। এতে তাঁর রাজকীয় ভদ্রতা ও তাজিমের অভাব নিয়ে অমাত্যবর্গের মধ্যে সমালোচনা বেশ দানা বেঁধে উঠে। তখন খলীফা বলেন, আপনারা যাঁকে সমালোচনা করছেন, তিনি হয়ত আকাশের কোন তারকা জগতে বিচরণ করছেন, মাটির পৃথিবীর কথা তাঁর মনেই ছিল না।

ইবনে ইউনুস কবি এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মূর্খ পুত্র তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইগুলো ওজনদরে বিক্রি করে দেয়।

www.pathagar.com

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছেঃ ১ আযীযুল হাকিম ২. কিতাবু বুলুগ ৩. আল-সায়েব ৪. কিতাব ফিহিস সামাত।

ইবনে হায়সাম (জ. ৯৬৫ খৃ.; মৃ. ১০৩৯ খৃ.)

তিনি তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিক বায়হাকী তাঁকে দ্বিতীয় টলেমি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু আধুনিক বিশ্বসভ্যতা তাঁকে 'অপটিক' (চক্ষু-চিকিৎসা)-এর জনক বলে চিহ্নিত করেছে মাত্র।

অধ্যাপক মারটনের মতে তাঁর মেধাশক্তি ছিল বিস্ময়কর। বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই ইউরোপীয় অধ্যাপক এই প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করেন। হায়সাম চাকরিজীবী ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার জন্য চাকরীতে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হতে থাকে। কিন্তু চাকরীকে বিজ্ঞান সাধনার অন্তরায় মনে করে তিনি চাকরী ছাড়তে চাইলেও সরকার বাঁধাদেন। তখন তিনি পাগলের অভিনয় করে চাকরী থেকে মুক্তি পান।

তিনি যে উন্নতমানের বিজ্ঞান সাধনা করতেন, তা তাঁর চারটি গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যায়। আরবী লম্বা-চওড়া নাম বাদ দিয়ে শুধু বাংলা অনুবাদটুকু প্রকাশ করা হলো। ১. জ্যামিতিক গণনার সাহায্যে পৃথিবীর দুই জায়গার মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয়, ২. পৃথিবীর বাহ্য প্রকৃতি, ৩. একটা ছায়া থেকেই মেরিডিয়ান ঠিক করা ৪. কিভাবে ধ্রুবতারার উন্নতি নিরূপণ করা সম্ভব।

তখন ছাপাখানা ছিল না। হাতে লিখেই সুধীবৃন্দের লেখা প্রচার-প্রকাশ হতো। হায়সামের হাতের লেখা ছিল অতিশয় চমৎকার। তাঁর চাকরীচ্যুতির পর তিনি অন্যের পুস্তক নকল করেই জীবিকার অবলম্বন করে নেন। বছরে ৩টি গ্রন্থ নকল করে দিয়ে তিনি পারিশ্রমিক পেতেন ১৫০ দিনার।

চাকরীও তিনি আপোসে নেন নি। নীলনদের বাঁধ দিয়ে উন্নত চাষাবাদের জন্য তিনি বহু দিনের পরিকল্পিত একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা খলীফা হাকিমের নিকট পেশ করেন। খলীফা পরিকল্পনাটি

www.pathagar.com

ভালভাবে দেখে নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করেই হায়সামকে রাজস্ব বিভাগে একটি উচ্চস্তরের চাকরি দিয়ে দেন। তিনি খলীফার ভয়ে দ্বিরুক্তি না করে চাকরি গ্রহণ করেন। আগেই বলেছি, দক্ষতায় তাঁর দ্রুত প্রমোশন হতে থাকে।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় অধ্যাপককে ফাঁসি দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে পাগলের ভান করে চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়ে খলীফার নজরবন্দী হয়ে থাকেন। তাঁর সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়। খলীফার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁকে নজরবন্দীই থাকতে হয়েছিল। অথচ এই হায়সাম মিসরে আসার আগে ইরাকে ছিলেন। যন্ত্র প্রকৌশলী হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি শুনতে পেয়ে এই খলীফা হাকিমই তাঁকে মিসরে নিয়ে এসেছিলেন।

মৃত্যুর ১৩-১৫ বছর পূর্বে 'উলুমিল আওয়ালে ইলা আখির' গ্রন্থে তিনি তাঁর লেখা ৬৯টি গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। যদিও তিনি বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই গভীরভাবে সাধনা করে পুস্তকাকারে তার ফল প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ ও ধর্মশাস্ত্রই তাঁর প্রধান সাধনার বিষয় ছিল বলে তিনি স্বয়ং উল্লেখ করেন।

তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে জানা না গেলেও আল-আশকারী নামে তাঁর একজন সুশিক্ষিত জামাতা ছিলেন। জামাতা তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবু ফিল মানাজির'-এর ৭ খণ্ডের মধ্যে ৫ খণ্ড অনুবাদ করেন। তাতে বোঝা যায়, তাঁর স্ত্রী-কন্যা পরিবেষ্টিত একটা পারিবারিক জীবন ছিল। আল-বেরুনী ও ইবনে সিনায় সংসার জীবন সম্পর্কিত নীরব ইতিহাসের মত তাঁর সাংসারিক ইতিহাস শূন্য নয়।

ঐতিহাসিক বায়হাকীর মতে, সিরিয়ার জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি ইবনুল হায়সামের নিকট জ্ঞানলাভের জন্য আবেদন জানান। ছাত্রের নিকট তিনি মাসিক ১০০ দিনার পারিশ্রমিক দাবি করেন। মুরখাব নামক এই সিরিয়ান শিষ্য ৩ বছর লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় ইবনে হায়সাম তাঁকে ৩,৬০০ দিরহাম ফেরত দিয়ে বলেন, "এ টাকা তোমার। তোমার আর আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমার কাছে গচ্ছিত ছিল মাত্র।"

www.pathagar.com

তিনি উপদেশ দেন, "মনে রেখো, কোন ভাল কাজের জন্য কোন পুরস্কার কি দান গ্রহণ করা বা ঘুষ নেওয়া উচিত নয়।"

সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীরুল উমারা ইবনুল হায়সামের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করে তাঁকে মোটা টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করেন। এতে কোনই আগ্রহ প্রকাশ না করে ইবনুল হায়সাম বলেন, "আমার জীবন যাপনের জন্য সামান্য অর্থই প্রয়োজন। ......(আপনার নিকট হতে) আমি যদি আমার দরকারের বেশী অর্থ নিয়ে জমাতে থাকি, তাহলে আপনার ক্রীতদাসে পরিণত হব আর যদি অন্যভাবে খরচ করি, তাহলে আপনার অর্থ অপব্যয়ের জন্য দায়ী হব।"

ধর্মদ্রোহী হিসাবে ইবনুল হায়সামের অমূল্য বিজ্ঞান গ্রন্থ সন্নিবদ্ধ করা হয়। এ হলো ইউরোপীয় অর্থ... প্রলোভনে এক শ্রেণীর মোল্লার বিজ্ঞান-বিরোধী ফতুয়ার পরিণাম। কিন্তু হায়সাম স্বয়ং তাঁর একটি গ্রন্থে মন্তব্য করেন "পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমার জ্ঞানের পরিধি এবং 'সত্য অনুসন্ধানের জন্য আমার আত্মোৎসর্গের কথা জানেন। তাঁরা আরো জানেন, আমি কতটুকু জ্ঞান-আহরণ করেছি, কতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেছি এবং আল্লাহ্র কাছাকাছি কতটুকু এগিয়েছি।"

বাগদাদ মসজিদের ইমাম ওবায়দুল্লাহ বিজ্ঞানকে ইসলাম-বিরোধী বলে প্রচার করে তাঁর বিজ্ঞান গ্রন্থগুলোর বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তখন ১১৯২-৯৩ খৃস্টাব্দে আবুল হাজ্জাজ-ইসহাক নামক একজন য়াহূদী বৈজ্ঞানিক হায়সামের এইসব অমূল্য বিজ্ঞান গ্রন্থ বিশেষ করে জ্যোতিবিজ্ঞান গ্রন্থগুলো আগুনে পোড়ানোর দৃশ্য দেখে অত্যন্ত পরিতাপ করেন। অথচ হায়সাম ধার্মিক ছিলেন। তখন নব জাগ্রত ইউরোপে এইসব বিজ্ঞান গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদের হিড়িক চলছে। তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মোন্মাদরা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটন করে। এই সময়ে যেসব ইউরোপীয় য়াহূদী ও খৃস্টান মনীষী তাঁর বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো অনুবাদ সাধনায় মগ্ন ছিলেন, তাঁরা হলেন, রোজার বেকন (ইংল্যাণ্ড) জন পেকহ্যান, উই র্কোলো (পোল্যাণ্ড), ক্রিমানার জিরার্ড, জেকব বিন মাহির ইবনে তিবান প্রমুখ। এঁরা হিব্রু ও স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ কার্য সমাপন করেন।

www.pathagar.com

ইবনে হায়সাম সত্য প্রকাশ ও অনুসন্ধানে যেমন অবিচল ছিলেন, তেমনি তাঁর ভাষণ ছিল সহজ ও সাবলীল। তাঁর পথ প্রদর্শক স্বনামধন্য বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের জ্যামিতির ত্রিভুজের কোণকের আংশিক ভুল অতি বিনম্র ভাষায় তিনি সংশোধন করে দেন। গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের সমবাহু ত্রিভুজের জ্যামিতিক ভুলও তিনি এ রকম সবিনয়ে সংশোধন করে বক্তব্য রাখেন। তিনি অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা, দর্শন, আবহাওয়া বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, ভু-আকার বিদ্যা, বলবিদ্যা (মেকানিক্যাল) অধিবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্মীয়, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই আলোচনা ও সাধনা করেছেন। তিনি তাঁর 'নফুসী হাইওয়ানিয়াহ্' গ্রন্থে জীবজন্তুদের উপরে সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'তাশরিকুল ইনসান ইলাল মাউত' গ্রন্থে মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক মারটনের মতে আল-বেরুনী, ইবনে সিনা, ইবনুল হায়সামের মধ্যে হায়সামই ছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।

ইস্তাম্বুলের অধ্যাপক ইসমাঈল পাশা (মৃত্যু ১৯০২ খৃস্টাব্দ) হায়সামের রচিত গ্রন্থের বিষয়সহ একটা তালিকা প্রকাশ করেন। এতে ৯১৫টি পুস্তকের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। পুস্তকগুলো হলো ঃ

অঙ্কশাস্ত্র ২৫, জ্যোতিবিজ্ঞান ২৩, ন্যায়শাস্ত্র ১৫, পদার্থবিজ্ঞান ১১, দর্শন ১১, মনোবিজ্ঞান ৬, ভুগোল বিজ্ঞান ৬, প্রাণী বিজ্ঞান ৩, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩, চিকিৎসা বিজ্ঞান ২, সাহিত্য ২ ক্ষেত্রতত্ত্ব ২, এপিসটেমোলোজী ও জ্ঞানের বিভাগ ২, যুদ্ধ বিজ্ঞান ১, হস্তলিপি-বিদ্যা ১, ধর্মশাস্ত্র ১, রসায়ন বিজ্ঞান ১।

অধ্যাপক ইসমাইলের এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। ইবনে আবি ওসায়-বিয়ার তালিকায় অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার উপর লেখা গ্রন্থ সংখ্যা হলো ৪১। তন্মধ্যে জ্যামিতির সংখ্যাই হলো ২৬। ধর্মের উপর লেখা ৩। কিন্তু এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে এ পর্যন্ত তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের আরো ১৩টি এবং জ্যামিতির আরো ২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

www.pathagar.com

সেকালের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বহু গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থ বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল. যেমন, বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আল-বেরুনীর 'কানুনে মাসউদী' ইবনে সিনার, 'কানুন' আল-খাওয়া-রিজমির 'এলমুল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' প্রভৃতি। হায়সামের 'কিতাবুল মানাজির'ও বিশ্বের অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। এ সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত য়াহূদী বৈজ্ঞানিক যোসেফ বিন জুদাহ বিন আর্কানন 'কিতাবুল মানাজিরকে' ইউক্লিড টলেমির গ্রন্থের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তার ফলে ইউরোপের নব জাগরণের যুগে পুস্তকটি ব্যাপক প্রচার-প্রসার পায় ও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। পাশ্চাত্যের মনীষী বৈজ্ঞানিকগণ মুক্ত কন্ঠে পুস্তকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তন্মধ্যে ইংল্যাণ্ডের স্যার উলফেণ্ডেন, পোল্যাণ্ডের অধ্যাপক রায়বিকির, আমেরিকার অধ্যাপক মারটন, অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক স্যার মলিফ্যান্টের প্রমুখ মনীষী 'কিতাবুল মানাজির' আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ বিশদভাবে অপটিক সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করেন।

আধুনিক বিজ্ঞান অঙ্গনে প্রচলিত হয়ে আছে যে, আলোর গতি নির্ধারণ ও আবিষ্কারক এ. মাইকেলসন। আলোর প্রতিফলন, প্রতি-সরণ ও প্রতিবিম্ব আবিষ্কারক লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক স্নেল, দে কার্টে প্রমুখ অথচ এই তথ্য আদৌ সত্য নয়।

অধ্যাপক স্নেলের (১৫৯১—১৬৫০) জন্মের ৬২৬ বছর পূর্বে ইবনে হায়সাম জন্মগ্রহণ করেন। আলো সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে আর কেউ বিশদ-ব্যাপক গবেষণা করতে পারেন নি। আলো সম্বন্ধে তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো রচনা করে গেছেন 'মাকালাতু ফিল জুয়ে' আলো কি? 'রিসালাতু ফিশ শাফাফ' বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা নির্ণয়, 'মাকালাতু ফি কাওস কজহে ওয়াল হালাতি' রংধনু, বস্তুর ছায়াপথ গ্রহণ ইত্যাদি। 'মাকালাতু ফিল মারাইয়াল মুহরিকা বিলকুতু', ডাই-অপট্রা প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনায় আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রতিবিম্বের স্বরূপ পভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর 'মাকারাতু ফিল মারাইয়ান মুহরিকা বেদদাওয়ায়ের' এবং মাকালাতু ফিল জুয়েল কামার' প্রভৃতি গ্রন্থে আলো সম্বন্ধে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। এই প্রত্যেকটি গ্রন্থেই ইউরোপীয়

www.pathagar.com

এমন কি স্বর্ণে পরিণত করা যায়। তার বহু রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল নজীর সহ তিনি প্রমাণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। আল কেমীর মারফত সুদক্ষ বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা যে এসব কার্যকরী করা সম্ভব, তা তিনি প্রমাণ করেছেন।

সে যা হোক, আমরা একটা কথা ভাবি, 'আল-কেমী' শব্দটা তো আরব বিজ্ঞানেরই সম্পদ। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের কেমিস্ট, কেমিস্ট্রী—এই শব্দগুলোও আরবদের বিজ্ঞান ভাণ্ডারের অবদান।

টলেডো খৃস্টানদের দখলে যাওয়ার পর স্পেনের ধর্মগুরু সেভিলের আর্কবিশপ রেমেণ্ডের নির্দেশে ১১৩০ খৃস্টাব্দে ডোমিনিকো আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আরবী গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। টলেডোর এই অনুবাদ সংস্থার মূল পরিচালক ছিলেন জিরার্ড। তিনি ১৭ বছরে ৯২টি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাঁকে ইউরোপে আরব সভ্যতার পিতা বলা হয়। এর পূর্বে ইবনে সিনার 'কানুন' গ্রন্থ হিব্রুতে অনূদিত হয়ে যায়।

১১৪১—৪৩ খৃস্টাব্দে রবার্ট দ্য-রিটাইনেস নামক ইংরেজ পণ্ডিত সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। ইবনে সিনার যেসব গ্রন্থ ল্যাটিনে অনুবাদ হয়েছিল, তার কতকগুলোর অনুবাদকারীর নাম উল্লেখ করা হলো।

জিরার্ডের অনূদিত ১টি।
আলপাগাস বেল্লনেনসিস। 'কানুন' সহ ৯টি।
জোহানেস হিস্পালেনসিস ৫টি।
গুন্ডিসালভস ১টি।
ফ্রাকান্টিয়াস ডিমেনটিনাস ২টি।
মাইকেল স্কট ১টি।
২য় জিরার্ড 'কানুন' গ্রন্থটির অনুবাদ করেন।
আরনোল্ড ১টি।
পিয়ারে ভাটটিয়রেস ২টি।
আরামন গাউস ব্লাসমি ৯টি।

'কানুন' গ্রন্থটি প্রথম জিরার্ড অনুবাদ সমাপ্ত করতে পারেন নি। দ্বিতীয় জিরার্ড তাঁর অনুবাদ সমাপ্ত করেন। ইবনে সিনার রচিত

www.pathagar.com

১৯২ টি গ্রন্থের মধ্যে আমরা 'শিফা' সম্পর্কে কিছু আভাস উল্লেখ করেছি। এখন 'কানুন' সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

জিরার্ড কর্তৃক 'কানুন' ইউরোপে প্রচার হওয়ার পর ১৪৭০ খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী ৩০ বছরের মধ্যে এর ১৬ টি সংস্করণ প্রকাশ হয়। এরপর ইউরোপের বিভিন্ন বিখ্যাত স্থান থেকে এটি প্রকাশ হতে থাকে। এটি হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবশ্য পাঠ্যরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ মহাকবি চসার (১৩৪০-১৪০০) তাঁর সমরকার বৃটেনের চিকিৎসা প্রথা সম্পূর্ণ মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে গঠিত বলে উল্লেখ করেন। মহাকবি চসারের Doctour of Phisyk" নামক কাব্যগ্রন্থে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী গ্যালেনের আবির্ভাবকে আর-রাযী ও ইবনে সিনার প্রভাবের অবদান বলে উল্লেখ করেন। একাদশ শতাব্দী থেকে ১৬৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলোতে 'কানুন' অবশ্য পাঠ্যরূপে প্রচলিত থাকে। অর্থাৎ 'কানুন' গ্রন্থ ইউরোপে প্রায় ৬ শত বছর সর্বজনমান্য চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থরূপে আদৃত ছিল। এর মধ্যে একটি মজার কথা এই যে, বহু প্রচলিত আরবী শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে, একটা কিছু দুর্বোধ্য শব্দ দিয়ে স্থান পূরণ করে রাখা হয়। এই শব্দ-গুলোকে কুরআনের শব্দের মত 'দৈব-শব্দ' মনে করে ভক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে'। এজন্য এক সময় 'কানুন'-কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইবেল বলে মনে করা হতো!

১৫৯৩ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'কানুন' আরবী ভাষায় রোম থেকে প্রকাশিত হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবী ভাষায় রচিত 'কানুন' ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে পড়াশোনা করা হতো।

বস্তুত আধুনিক সভ্যতার জনক ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞান আরব বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবেই গড়ে উঠে। সুতরাং বর্তমান উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলে মুসলমানদেরই অবদান বিদ্যমান।

এই ভাবে বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যাবে যন্ত্রবিজ্ঞানের মূলেও রয়েছে মুসলিম সভ্যতার অবদান।

www.pathagar.com

গণিত শাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই 'কিতাবুশ শিফা'-র সবগুলো খণ্ড এখনও একত্র হয়ে প্রকাশ হয়নি। তন্মধ্যে ৫টি খণ্ড বেনামী হয়ে ইউরোপে এরিস্টটলের নামে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক হোম ইয়ার্ড এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন; এরিস্টটলের নামে প্রচলিত একটি ইংরেজী গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে 'কিতাবুশ শিফা'-রই পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ মাত্র।

ইবনে সিনা মাটি ও পাহাড়-পর্বত বা তার উপর যেসব পদার্থ আছে, সে সবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর মতে পানি থেকেই মাটি, পাথর প্রভৃতির উৎপত্তি। পানির প্রকৃতির মধ্যেই মৃত্তিকীয় গুণের আধিক্য রয়েছে। এ জন্যেই পানি জমে গিয়ে মাটিতে পরিণত হয়।

এ সম্বন্ধে তিনি বহু বিচার-বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে কতগুলো জিনিস একত্রে থাকলে, তন্মধ্যে যেসব জিনিস শক্তিশালী, অন্য জিনিসগুলো সেই জিনিসে পরিণত হয়। যেমন কোন দ্রব্য লবণের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকলে সেই দ্রব্যগুলোও লবণে পরিণত হয়ে যায়। কোন জিনিস আগুনে পড়লে সে-ও আগুন হয়ে যায়। কতদিনে রূপান্তর ঘটতে পারে, তা নির্ভর করে প্রধান জিনিসের শক্তির উপর। এজন্য রূপান্তর ধীরে-সুস্থেও হয়, আবার খুব দ্রুতও হয়। পানি থেকে উৎপন্ন কাদামাটি থেকে কি করে পাহাড়-পর্বতগুলো গড়ে উঠল, তারও তিনি পরীক্ষিত ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা দেন। সমুদ্রের আঠাল কাদামাটি জমে পাথরে পরিণত হয়েছে। এ জন্য অনেক পাথর ভাঙ্গলে সামুদ্রিক শঙ্খ ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

তিনি খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। পাথর তাপে নমনীয় দ্রব্য, গন্ধক, লবণ অর্থাৎ নমনীয় ও অনমনীয়। নমনীয়গুলো দুর্বল। লবণের মত পানিতে গলে যায়। যেমন ফিটকিরি, ডিট্রিওল, মালত্রমোনিয়াক ও কালকান্দ। ওগুলো তৈলীয় প্রকৃতির। এদের শুধু পানি দিয়ে গলান যায় না, যেমন গন্ধক, জারনিখ প্রভৃতি।

পারদ ও গন্ধক সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গন্ধক ও পারদকে উন্নত স্তরের বৈজ্ঞানিক সংশ্লেষণ দ্বারা যে লোহা, তামা,

www.pathagar.com

এজন্য আকাশ পূর্বদিক থেকে ঘোরে, এটা যুক্তি নয়। 'ডান'. 'বাম' আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। ৮ আগুনের আকার গোল; এটা যুক্তি নয়, অনুমান। ৯. সূর্য রশ্মির সাহায্যে তারা কিভাবে উৎসারিত হয়? সূর্যরশ্মি কি কোন বস্তু, না কোন অবস্থা? ১০ রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পর্কে এরিস্টটলের মতবাদ যুক্তিসঙ্গত নয়।

আল-বেরুনী এই সঙ্গে তার নিজেরও ৮টি প্রশ্নের উত্তর ইবনে সিনার নিকট চেয়ে পাঠান।

ইবনে সিনা আল-বেরুনীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল থেকেও এরিস্ট-টলের মতকে সমর্থন করেই উত্তর প্রেরণ করেন। কিন্তু ইবনে সিনার মতকে যুক্তিযুক্ত নয় মনে করেই আল-বেরুনী তঁার মতকে পরিবর্তন করতে পারেন নি। দুই বিজ্ঞ-বন্ধুই ছিলেন নিজ নিজ সত্যের অনুসারী।

আল-কিন্দি, আল-ফারাবী প্রমুখ জ্ঞান তপস্বী অঙ্কশাস্ত্রের সংযোগে যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন করে গিয়েছিলেন, ইবনে সিনা তাঁর 'কিতাবু উয়ূনুল হিকমা' গ্রন্থে সেই সব মনীষীর মতের ভিত্তিতে অঙ্কের নিয়মে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মানোন্নয়ন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ইবনে সিনার একান্ত আপন শিষ্য এবং জীবনী লেখক ও আইন-জীবী জুজমানী ইবনে সিনা রচিত ১৯২টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে ১৮৩টি আরবী নামের গ্রন্থ তালিকা পাওয়া যায়।

এই সব গ্রন্থ দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ধর্ম, সঙ্গীত, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান, বিচার বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রকৃতি আবহাওয়া, অর্থ, ন্যায়-শাস্ত্র প্রভৃতি সর্বতোমুখী উচ্চস্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রচিত।

স্থানাভাবে গ্রন্থ তালিকা প্রকাশ থেকে বিরত থেকে আমরা এখানে শুধু 'কিতাবুশ শিফা' নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে চাই।

ইবনে সিনা বুয়াইদ সুলতান শামস-উদ-দৌলার যখন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন, 'কানুন' গ্রন্থ রচনার সময় জুজমানীর অনুরোধে 'কিতাবুশ' শিফা' হামাদানে লেখা শুরু করেন এবং ইস্পাহানে এসে সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি ১৮ খণ্ডে বিভক্ত। এতে দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান,

www.pathagar.com

চরিত্রানুযায়ী যথা খুশী ইংরেজী নাম (লেখকের নাম নয়) দিয়ে ইউরোপে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। এই সব ল্যাটিন অনূদিত গ্রন্থ ইউরোপে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যেই অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে। আলোর গতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি সবই তো ইবনুল হায়সামের আবিষ্কার। ৬২৬ বছর পরে স্নেল প্রমুখ সেসব তত্ত্বের আবিষ্কারক হয়ে গেলেন কি করে? স্নেল হায়সামের সূত্র ধরে শিক্ষালাভ করে এর উৎকর্ষ, উন্নয়ন, উদ্ভাবন প্রভৃতি সবকিছুই করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা আবিষ্কারকের নামটি জাল করতে পারেন না। বস্তুত বর্তমান বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদেরই বেনামী বিজ্ঞান মাত্র।

'কিতাবুল মানাজির'-এর একটি মূল্যবান তত্ত্বকথা এই যে, চোখ থেকে আলোর রশ্মি কোন বস্তুর উপর পড়লেই সেই রশ্মির সাহায্যে বস্তুকে আমরা দেখতে পাই—এটা সত্য নয়। প্রতিটি বস্তু থেকে আলোকচ্ছটা আমাদের চোখে পড়লেই আমরা বস্তুকে দেখতে পাই—এটিই সত্য।

অথচ ইউক্লিড, এরিস্টটল, টলেমি প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক বৈজ্ঞানিকের মতে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলনের বস্তু দেখা যায়। এই মতবাদটি এত কাল যাবত বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে ধর্মগ্রন্থের মত বিশ্বাসের বিষয় ছিল। তখন সকলে তা বিনা প্রশ্নেই মানতেন। টলেমি ইউক্লিড, এরিস্টটলের এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়ে, ইবনে হায়সাম প্রচলিত বিজ্ঞান জগতটার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনার ঝুঁকি নিয়েও সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে একটুও বিচলিত বোধ করেন নি। তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর নতুন আবিষ্কার 'কিতাবুল মানাজির'-এ জানিয়ে দিলেন যে, বস্তু থেকে আলোর ছটা আমাদের চোখে পড়লেই আমরা বস্তুকে দেখতে পাই।

ক্রুসেডের আঘাতে ইউরোপীয় খৃস্টান জগত অন্তত এই শিক্ষা ভালভাবেই লাভ করেছিল যে, মুসলিম সভ্যতা বা আরব সভ্যতাকে সম্পূর্ণ হীনবল করতে না পারলে তাদের সভ্যতা (আধুনিক সভ্যতা) কিছুতেই গড়ে উঠবে না। মুসলিম সভ্যতা পতনের পর যখন মুসলমানগণ অতি দ্রুত অশিক্ষিত ও গরীব হতে শুরু করে এবং অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠি ধন-সম্পদে, জ্ঞান-বুদ্ধিতে,

www.pathagar.com

ক্ষমতা-মর্যাদায় রাতারাতি স্ফীত হয়ে পৃথিবীর উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার শুরু করে, তখন ইউরোপীয়গণ উপলব্ধি করে যে, বিশ্বের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার ও স্থায়িত্বের জন্য বিজ্ঞানই হবে মূল হাতিয়ার। কিন্তু এই বিলুপ্ত বিজ্ঞান একমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুর্বর আরব থেকেই উর্বর বিজ্ঞান-স্বর্ণ খনি এই সুযোগে লুটে আনতে হবে। এখন মুসলিম জগত পরাভূত, মৃতপ্রায়। ওরা জেগে উঠলে একটা পাণ্ডুলিপিও ছুঁতে দেবে না। তাছাড়া বুঝতে পেরে মুসলমানেরা যদি পাণ্ডুলিপি না দেবার আন্দোলন গড়ে-তোলে, তাহলে ইউরোপের অনুবাদ আন্দোলন ব্যর্থ হবে। এজন্য একদিকে তাঁরা মুসলিম বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেন, অন্যদিকে মুসলমানদের বিজ্ঞানে বীতস্পৃহ করে তোলার জন্যে অজস্র অর্থব্যয়ে এক শ্রেণীর আলিমদের বিজ্ঞান হারাম ঘোষণার ধ্বংসাত্মক কাজে লাগিয়ে দেন।

এই ধরনের ভাড়াটিয়া আলিমগণ যখন বাগদাদ মসজিদের ইমাম ওবায়দুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ইবনে হায়সামের বিজ্ঞান গ্রন্থ দগ্ধীভূত করে দিয়ে ইসলামের মহিমা প্রচার করছিলেন, তখন অন্যদিকে ইউরোপীয় অধ্যাপক রামুস ইবনে হায়সামের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কিতাবুল মানাজির' সংগ্রহের জন্য সারা মধ্যপ্রাচ্যের গ্রাম-গঞ্জের দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। শেষমেষ একটি পুটলি বাঁধার পুরাতন কাগজের দোকানে অতি ময়লা কালি-কুলির মাঝ থেকে পুস্তকটি তিনি খুঁজে বের করেন। এই গ্রন্থের সংস্পর্শে সারাটা ইউরোপ নবজাগরণে সজীব হয়ে উঠেছিল। পরের পৃষ্ঠায় 'কিতাবুল মানাজির' পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা দেওয়া গেল। উক্ত পৃষ্ঠার চিত্রে সমান্তরাল সূর্যরশ্মি অধিবৃত্তাকৃতি আয়নার উপর পড়ে কিভাবে প্রতিফলিত হয়, তা জ্যামিতির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

ইস্তাম্বুলের আয়াসোফিয়া লাইব্রেরীতে একত্রে ৭টি খণ্ডেরই ৬৭৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 'কিতাবুল মানাজির'-এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটিই সংরক্ষিত আছে।

'কিতাবুল মানাজির'-এর প্রথম খণ্ড, দৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ড, চোখে কিভাবে দেখা যায়। তৃতীয় খণ্ড, দৃষ্টি-বিভ্রমের কারণ। চতুর্থ খণ্ড, পালিশ করা বস্তু থেকে কিভাবে

www.pathagar.com

প্রতিফলন ঘটে। পঞ্চম খণ্ড, প্রতিবিম্বের অবস্থা। ষষ্ঠ খণ্ড, প্রতিফলন এবং প্রতিফলনের জন্য চোখে যেসব বিভ্রম ঘটে।

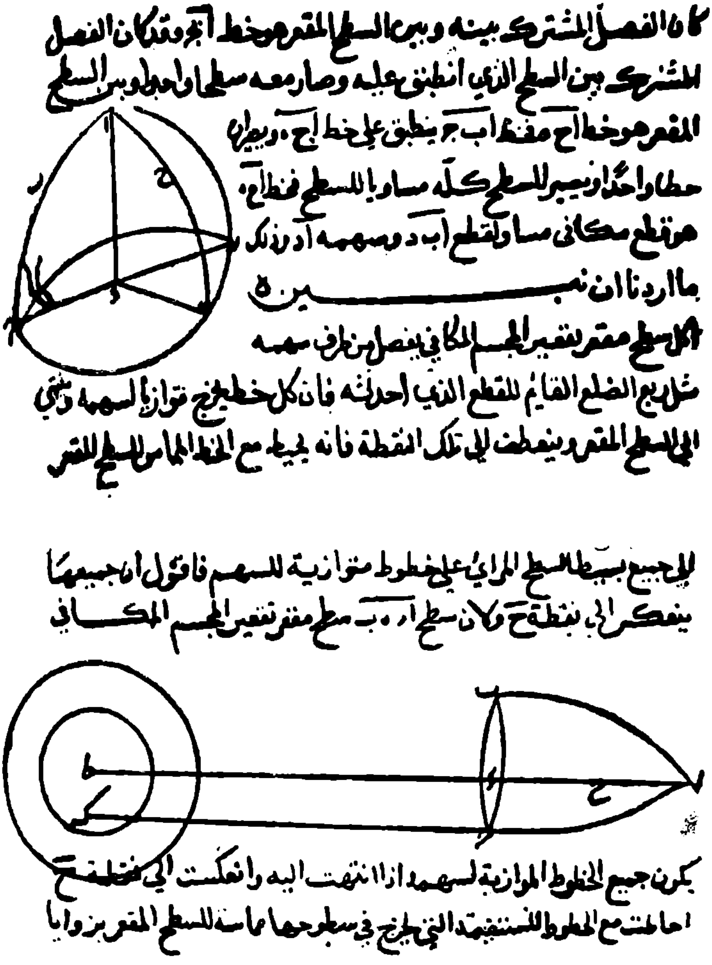

'বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান' গ্রন্থ থেকে গৃহীত
২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা

সপ্তম খণ্ড, স্বচ্ছ বস্তু থেকে প্রতিসরণের দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ। ১৬৩০ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক কেপলার পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ আলোর কোন প্রকার গতিতে

www.pathagar.com

সময়ের দরকার হয় না বলেই মনে করতেন। অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের ল্যাটিন অনুবাদের তত্ত্ব তাঁদের হাতে পড়েনি বলে মনে করতে হবে। সেই অবস্থায় যখন সেই তথ্য তাঁদের হস্তগত হবে, তখন যিনি এর বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করবেন, তখন সেই বৈজ্ঞানিকের ইচ্ছা না থাকলেও আবিষ্কারক হিসাবে ইউরোপের শক্তিশালী প্রচারের ঢোল তাঁর নামেই বাজতে থাকবে, তাতে আর বিচিত্র কি? এভাবেই ডেনমার্কের গণিতবিদ রোসার (১৬৪৪—১৭১০) আলোর গতি 'নির্ধারণ' করার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ আলোর গতি সম্বন্ধে অজ্ঞই ছিলেন।

অথচ রোসার জন্মের ৭ শত বছর পূর্বেই আল-বেরুনী, ইবনে সিনা, ইবনে হায়সাম প্রমুখ বিজ্ঞানী আলোর গতি আছে বলে প্রমাণ করেন। আল-বেরুনী এক ধাপ এগিয়ে এ-ও আবিষ্কার করেন যে, আলোর গতি শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত চলে। এরপরও গ্রীক আরব বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আলোর গতির স্থানান্তরে কোন সময়ের দরকার হয় না। কিন্তু, ইবনে হায়সাম আবিষ্কার করে 'কিতাবুল মানাজির'-এ প্রকাশ করেন যে, আলোর গতিতে সময়ের দরকার হয়। কিন্তু সময়টা এত দ্রুত বা এত ক্ষিপ্রগতি যে, মাপযন্ত্রে তা প্রকাশ করা কঠিন। আলোর গতি সম্বন্ধে গোলাকৃতি লেন্সের ফোকাস সংক্রান্ত যে সমস্যার সমাধান ইবনে হায়সাম করেন, সেই সমস্যাটি অদ্যাবধি Al Hazen's Problem নামে ইউরোপে প্রচলিত আছে।

১২৭০—৭৮ খৃস্টাব্দে উইটেলোর রচিত The perspectiva গ্রন্থটিকে অপটিক সম্বন্ধে গ্যালিলিও কেপলারের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে ইউরোপ প্রচার করে। কিন্তু এটি ইবনে হায়সামের কিতাবুল মানাজির-এর প্রায় অবিকল নকল মাত্র।

এরপর জন পেকহেমের রচিত The Perspective Communis গ্রন্থটিও 'কিতাবুল মানাজির'-এরই চর্বিত চর্বণ। এরপর ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, জোহানেস কেপলার প্রমুখ মানাজিরকে ভিত্তি করেই আলোর ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেন।

www.pathagar.com

ওমর খৈয়ামও তাঁর বীজগণিতে ইবনে হায়সামের সংখ্যাবিজ্ঞানের গুরুত্ব সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। ওমর খৈয়াম বলেন, "যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—কোন্ বর্গটি তার বাহুর 'ঘন'-র কত অংশের সমান ……… আবু আলী ইবনে হায়সাম (আল্লাহ্ তাঁর মঙ্গল করুন) এ বিষয় প্রমাণ করেছিলেন। যা হোক, তাঁর পন্থাটি বেশ জটিল ও কঠিন এবং এ গ্রন্থে তার ব্যবহার হতে পারে না।"

আর একটি এলজাবরার অঙ্ককে কেন্দ্র করে পুনরায় ওমর খৈয়াম মন্তব্য করেন, "বৈজ্ঞানিক আবু আলী ইবনে হায়সাম (আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাঁর উপর বর্ষিত হোক) এ বিষয় বিশেষভাবেই প্রমাণ করেছেন।"

তিনি 'মাসতেল কিবলা' গ্রন্থে ত্রিকোনমিতির কো-ট্যানজেন্ট সম্বন্ধে একটি থিওরেম আবিষ্কার করেন।

ইবনে হায়সামের 'মাকালাতু ফি মারাকিজুল আসকান' গ্রন্থে পতনোন্মুখ বস্তুর গতিবেগ, সময় ও বিচ্যুত স্থানের মধ্যবর্তী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পতিত বা পতিত-প্রায় বস্তুর গতিশক্তির পর্যালোচনায় আন্ততাত্ত্বিক শক্তিটিই হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। তিনি বইটি লিখেছিলেন শুধু এই শক্তিটিকেই কেন্দ্র করে।

তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল বিচ্যুত বস্তুর গতির ভারকেন্দ্র সম্বন্ধে। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাপক বিশ্লেষণে তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না অথবা এতদূর চিন্তাও তিনি করেন নি কিংবা এদিকে অগ্রসর হওয়া তাঁর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা-বহির্ভূত ছিল।

নিউটনের জন্মের ৬৭৭ বছর পূর্বে ইবনে হায়সাম জন্মগ্রহণ করেন। 'মাকালাতু ফি মারাকিজুল আসকান' নামক বিচ্যুত বস্তুর গতিশক্তির ভারকেন্দ্র (মাধ্যাকর্ষণ) সংক্রান্ত গ্রন্থটি নিশ্চয়ই অনুসন্ধিৎসু ইউরোপের ল্যাটিন অনুবাদের কবল থেকে রেহাই পায়নি। বিশেষ করে এই সব বই-পুস্তকের আরবী লম্বা চওড়া নামের তালিকা আমরা ইউরোপের বদৌলতেই পেয়েছি। মাধ্যাকর্ষণের প্রথম পন্থাটি কি নিউটন বিশ্ববাসীকে দেখালেন, না হায়সাম নিউটনকে দেখিয়েছিলেন। মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপক বিশ্লেষণের উপর যিনি পরিষ্কার একটি পুস্তকই রচনা করে গেলেন,

www.pathagar.com

সেই পথ ধরে বা তাঁকেই অনুসরণ করে অনন্য প্রতিভাবলে নিউটন মাধ্যাকর্ষণের বিস্ময়কর উৎকর্ষ সাধক হতে পারেন। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের মূল সূত্রের আবিষ্কারক বহুশত বছর পূর্বেকার মনীষী বৈজ্ঞানিক ইবনে হায়সাম, নিউটন নন।

হায়সামের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ তাঁর শক্তির ভার-কেন্দ্রের সুস্পষ্ট ধারণা থেকে উদ্ভূত। এ সম্বন্ধে ইবনে হায়সাম 'মিজানুল হিকমা' গ্রন্থে ভারকেন্দ্র ও লম্বকেন্দ্রের সম্বন্ধ নিয়ে, নিক্তি ও লৌহ তুলাদণ্ডের স্থির ও দোদুল্যমান অবস্থায় অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করেন। বিচ্যুত বস্তুর দূরত্ব ও গতিশক্তি সময়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কেও তাঁর অভ্রান্ত ধারণা ও কৈশিকাকর্ষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রাথমিক অবদান। পুস্তকটিতে বায়ুমণ্ডলে ভার বর্ধিত ঘনত্বের সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আরো পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছেন যে, একই জিনিসের ওজন বায়ুর হাল্‌কা ও ঘনত্বের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল।

এতে বোঝা যায়, বায়ুমণ্ডলের প্রথম বিশ্লেষক ক্যাভেণ্ডিস নন এবং বায়ুর ওজন সম্বন্ধে প্রথম আবিষ্কারক টরিসিলি নন, বরং বৈজ্ঞানিক ইবনে হায়সাম। অনুরূপভাবে পানির উপাদান সম্বন্ধে প্রথম আবিষ্কারক ক্যাভেণ্ডিস নন, ইবনে সিনা। এইভাবে মুসলিম বৈজ্ঞানিক-বৃন্দের তত্ত্ব-তথ্য শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে আদি সূত্রের আবিষ্কারক সেজে বসে আছেন ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানী।

কেপলারকে গ্রহপুঞ্জের গতির আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে। অথচ তারো প্রায় পৌনে ৭শ বছর পূর্বে ইবনে হায়সাম 'মাকালাতু ফিল মাজরাত' গ্রন্থে ছায়াপথের মহাশূন্যের নাক্ষত্রিক অবস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও আবিষ্কারের পথ প্রদর্শন করে রেখে গেছেন। এমন কি টলেমির চোখে যা ধরা পড়েনি, তারও তিনি সন্ধান দিয়ে গেছেন। ল্যাটিন অনুবাদের কল্যাণে উচ্চশিক্ষিত কেপলারকে নক্ষত্র সম্পর্কে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের এই যে ৫শ বছরের পুঙ্খানু-পুঙ্খ, বিশদ ও বিশাল আলোচনা কি কিছুই প্রভাবিত ও অগ্রপথ প্রদর্শন করেনি?

www.pathagar.com

গ্রীক বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে মুসলিম বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতির স্বীকৃতি কি মুসলিম বিজ্ঞানীরা আধুনিক—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে পেতে পারতেন না ?

এ পর্যন্ত ইবনে হায়সামের ল্যাটিন, হিব্রু ও স্পেনীয় ভাষায় ২৫টি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে এবং সর্বমোট গ্রন্থের তালিকা পাওয়া গেছে ১৮২টি। স্থানাভাবে গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় দেওয়া সম্ভব হলো না।

তবে দেখা যায় এতে গল্প-কাহিনী জাতীয় কোন পুস্তক নেই। শুধু কবিতা সম্বন্ধে যে বই রচনা করা হয়েছে, কবিতার বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাতে কয়েকটি বই আছে মনস্তত্ত্বের উপর লেখা। মোটকথা, যত প্রকারের বিজ্ঞান আছে, প্রায় সব পুস্তকই সেই সব বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার উপর রচিত হয়েছে। ধর্ম, দর্শন, জলঘড়ি, ছায়াঘড়ি থেকে আরম্ভ করে দালান-কোঠা নির্মাণ, ফলিত বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং নীলনদের বাঁধ পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থই মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। লেখ্যশৈলী গুরুগম্ভীর, এমন কি বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ভুল সংশোধন ও প্রতিবাদ গ্রন্থগুলোও নিরপেক্ষতার গাম্ভীর্যে ও মার্জিত ভাষায় রচিত। ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, টলেমি, এরিস্টটল প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে খাওয়ারিজমি ও বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের মত মহাবিজ্ঞানীদের সৃষ্টিশক্তির বিষয়সমূহ সব প্রযত্নে ভাষ্য ও ব্যাখ্যা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

খৈয়াম, গাযালী, যারকালী প্রমুখ বিজ্ঞানী

মুসলিম সভ্যতার পতন ও বর্তমান খৃস্ট সভ্যতার উত্থান—পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুটো সভ্যতার উত্থান-পতনের কেন্দ্রভূমি হলো স্পেন। এখন স্পেন খৃস্টান অধ্যুষিত। এই স্পেনই যে এক সময় মুসলিম অধ্যুষিত, মুসলিম প্রভাবিত, মুসলমানদের কীর্তি-কাহিনীর স্বপ্নরাজ্য ছিল এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র ছিল, এখন চর্ম চক্ষে দেখলে তার কিছুই বোঝা যায় না। শুধু মহাকাশের নীরব সাক্ষী স্বরূপ মৃত ব্যক্তির হাড় পাঁজরের মত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন স্মৃতির উত্তাল সাগরে মহাকালের বিদায় বেদনার মৃত্যু-তুহিন দীর্ঘশ্বাসেরই মূর্ত প্রতীক মাত্র।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সারাসিন সভ্যতার স্পেন বিজয় ও মুসলিম স্পেনকে গড়ে তোলা উমাইয়া বংশের অবদান। এই বংশের পতনের পর ক্ষমতাশীন আব্বাসীয়গণ রাজ্য বিস্তারের চেয়ে রাজ্য-উন্নয়নেই বেশী মনোযোগ দেন। প্রশাসনিক শৈথিল্যের ফলে স্পেনের মুসলিম শাসক প্রতিনিধিগণ বিকেন্দ্রিক শাসন গঠনে ক্রমানুয়ে প্রশ্রয় পেতে শুরু করেন। ১০৩০ খৃস্টাব্দে পূর্বাপর সময়ে আব্বাসীয় শাসক শক্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। বিশাল সাম্রাজ্যের আওতা থেকে বিভিন্ন দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হতে শুরু করে। নিরুপায় আব্বাসীয় খলীফাগণ নিরুপদ্রব জীবন যাপনের জন্য নামমাত্র পুতুল খলীফায় পরিণত হন।

ফলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বুয়াইদ বংশের (৯৪৫-১০৫৫) প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এ ছিল ইরানী প্রাধান্যের প্রতিফলন। এরপর তুর্কী প্রাধান্যের প্রতিফলনে সেলজুক (১০০৭—১১৯৪) রাজবংশ গড়ে উঠে। এতে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড ও হীনবল হয়ে পড়ে। ফলে স্পেনের মুসলিম শাসক ও ঐক্য শক্তি হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ততঃ ২০টি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম শক্তির এই পারস্পরিক

www.pathagar.com

রেষারেষির সুযোগ গ্রহণ করেন খৃস্টান রাজশক্তির প্রতীক রাজা আল-ফানসো। যদিও ১৪৯২ খৃস্টাব্দে স্পেনের মুসলিম শক্তির পতন ঘটে ঃ কিন্তু পতনের ঐতিহাসিক কারণসমূহ সৃষ্টি হতে থাকে একাদশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় শাসনের অযোগ্যতা থেকে। সেলজুক শাসকের ক্ষমতার ভারসাম্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। ১০৭৫ খৃস্টাব্দে খৃস্টান ও য়াহূদীদের তীর্থস্থান জেরুসালেম সেলজুক তুর্কীরা দখল করে। ফলে খৃস্টান জগতে ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়। তার সুযোগ গ্রহণ করেন ১০৯৫ খৃস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আর্বান। তিনি মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) আহ্বান করেন। এর সর্বশেষ প্রতিক্রিয়ায় স্পেন থেকে মুসলিম সভ্যতার পতন শুরু হয়।

স্পেন ২০টি রাজ্যে খন্ড-বিখণ্ড হলেও এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ প্রভৃতি সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেষ্টায় প্রতিটি শাসকই ছিলেন অসাধারণ উৎসাহী। অনেক সুলতান ব্যক্তিগতভাবে ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতেন।

সেভিলের সুলতান মুতামিদ আন্দালুসিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর বেগম ইতিমাদও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।

বাজাজোরের শাসনকর্তা মুজাফ্ফর কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি সর্বজ্ঞানের সমন্বয়ে ৫০ খন্ডে সমাপ্ত একটি বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। কত বড় পন্ডিত ব্যক্তি হলে এত বড় বিশ্বকোষ রচনা সম্ভব হতে পারে, তা সহজেই বোধগম্য।

জারাগোজার সুলতান মুকতাদির বিল্লাহ্ নিজেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মজলিসে যোগদান করতেন। মাত্র ৩টি জেলা নিয়ে গঠিত হলেও এই রাজ্যই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় স্পেনের শীর্ষস্থানীয়।

মুকতাদির-এর পুত্র সুলতান ইউসুফ আল মোতাসন একজন উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক ছিলেন। নৃপতিদের মধ্যে উলুঘ বেগের পরেই হয়ত তাঁর স্থান। পূর্বোল্লিখিত য়াহূদী বৈজ্ঞানিক যোসেফ বিন আকসিনের মতে ইউসুফের অঙ্কগ্রন্থ 'ইস্তিকমাল' আল-মাজেস্টের মত সমগুণ সম্পন্ন বুনিয়াদী বিজ্ঞান গ্রন্থ। যোসেফের গুরু বিখ্যাত য়াহূদী বৈজ্ঞানিক যোসেফ বিন মাহসুন 'ইস্তিকমালে' এর ভাষ্য রচনা করেন।

www.pathagar.com

ইবনুল সাফফার (মৃত্যু ১০৩৪ খৃস্টাব্দ)

জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা প্রকার যন্ত্রপাতির বিস্তারিত বর্ণনা, সেগুলোর কার্যবিধির ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণের সাথে নিজেরও পর্যবেক্ষণের ফল মিলিয়ে তিনি একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। তাঁর আস্তারলব ব্যবহারবিধির গ্রন্থটি পরবর্তীকালে প্লেটো অব টিভলি ল্যাটিনে অনুবাদ করে জোহানেস হিস্পালেন্সিসকে উৎসর্গ করেন। পরে এই গ্রন্থটি প্রফেটিয়ান কর্তৃক হিব্রুতে অনূদিত হয়।

আল-যারকালী (১০২৯-১০৮৭)

তিনি স্পেনের অধিবাসী। ঐতিহাসিক আল-কিফতির মতে, তিনি আকাশ ও তারকা তত্ত্বে উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি নভোমণ্ডলের একটি নক্শা তৈরী করেন। তারকা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আকাশ-নক্শার অনুলিপি প্রকাশ পেলে অনেকেই তা বুঝতে পারেন নি। এই নক্শাটির নাম হলো 'মহি ফায়ে আনযারকীয়াল'। এর খ্যাতি পরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। অনেকেই তা নকল করে নেন। ইবনুল হাম্মাদ আল-আন্দালুসী তাঁর ফরমূলা প্রয়োগ করে ৩টি বিশেষ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবেই বিখ্যাত ছিলেন। সূর্যের গতি সূর্যের অপভূর ক্রান্তি বৃত্তের তীর্যকতা টলেডো তালিকা ও আস্তারলবের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব। নক্ষত্রের তুলনায় সূর্যের অপভূ যে স্থির থাকে না, বরং তাঁরও যে একটা গতি আছে, তাঁর পূর্বে বিজ্ঞানের ভাষায় তা আর অন্য কারো দ্বারা প্রকাশ পায়নি। তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদ হিসাবে তা প্রকাশ করেন। তিনিই গতির আবিষ্কর্তা। তাঁর গণনায় সূর্যের অপভূর বার্ষিক গতি ১২.৪´´। বর্তমান স্থিরীকৃত পরিমাণ হলো ১১.৮´´ সেকেণ্ড। বর্তমান উন্নত যান্ত্রিক যুগের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর গণনার এই প্রায় সঠিকত্ব বিস্ময়কর বলা যেতে পারে।

মিঃ বোসোর মতে, তিনি সূর্যের গতি সম্বন্ধে একটি উন্নততর থিওরী আবিষ্কার করেন এবং সে থিওরী হিপারকাস ও টলেমির

www.pathagar.com

ব্যবহৃত পদ্ধতির চেয়ে বিশুদ্ধ ও সহজতর ছিল। তিনি এই দুই গ্রীক বৈজ্ঞানিকের সূর্যের নির্ধারিত কক্ষ সম্বন্ধীয় গণনার নানা ভুল সংশোধনও পরিবর্তন করেন। সূর্যের গতিতে তিনি কতগুলো অসামঞ্জস্য দেখতে পান। নিউটনের থিওরী ও বর্তমানের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সেসব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টলেমির আল-মাজেস্টের মতবাদের প্রতি অন্ধ সমর্থনের জন্য তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এই নতুন কথা সহজে মেনে নেন নি। যারকালীও সংজ পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর মতবাদকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা চালিয়ে সূর্যকে ৪০২ বার পর্যবেক্ষণ করেন। যার ফলে তাঁর আবিষ্কার প্রতিপাদ্য বর্তমান যান্ত্রিক যুগেও মাত্র ১ সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের বেশী ব্যতিক্রম প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয়নি। যারকালী টলেডোতে বাস করতেন। জন্মভূমির নামানুসারে তাঁর তালিকাটির নাম রাখেন 'আল-যারকালীর টলেডো তালিকা'। তালিকাটি এত উচ্চমান সম্পন্ন ছিল যে, পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাবলীতে অসংখ্যবার তাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়। এই জিজের ৪৮টি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারতের ব্রহ্মগুপ্তের খন্দখাদ্যকের তালিকা, টলেমি ও আল-খাওয়ারিজমির তালিকার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য রয়েছে।

তিনি একটি অদ্ভুত জলঘড়ি প্রস্তুত করেন। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে এর গতি নিয়ন্ত্রণের সামঞ্জস্য ছিল।

সর্বত্র ব্যবহৃত হতে পারে—এমন একটি অভূতপূর্ব আস্তারলবও তিনি আবিষ্কার করেন। এর পূর্ববর্তী আস্তারলবগুলোর ব্যবহার শুধু স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। তাঁর আবিষ্কারের ফলে সূর্যপথ, বড় বড় নক্ষত্র, অন্যান্য গ্রহ চন্দ্রের নিখুঁত গতিবিধি প্রভৃতি বিষয় সর্বস্থান থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ সম্ভব ও সহজতর হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন ত্রিকোনমিতির বর্গ। এই বর্গের দ্বারা অতি সহজেই সোজা এবং উল্টো ছায়ার পরিমাণ বা কোণের ট্যানজেন্ট ও কো-ট্যানজেন্ট বের করা যেত।

www.pathagar.com

আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক মেডিলের সুলতান মুতামিদ বিন আব্বাসের নামানুসারে এই যন্ত্রের নাম রাখেন 'আব্বাসীয়া'। আরব বৈজ্ঞানিকগণ এই সহজ ও পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রের নাম দেন 'আস-সাফিহা আল-যারকালীয়া'। এই যন্ত্রটি ইউরোপে Shopaca নামে খ্যাত হয়ে পড়ে।

যারকালী 'সাবিহা শাফাদিয়া' নামে আর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এই যন্ত্র ও গ্রন্থকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্যই গড়ে উঠে।

জনৈক য়াহূদী বৈজ্ঞানিক এই গ্রন্থকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। খৃস্টান-রাজ আল-ফানসো স্পেনীয় ভাষায় এর অনুবাদ করান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই উন্নত যন্ত্র সম্বন্ধে উদ্ধৃত সমস্যাগুলো সংগ্রহ করে একটি পুস্তক প্রণীত হয়। কোপার্নিকাস তাঁর De Revolutionibus Orbium Cocles tium গ্রন্থে আল-বাত্তানীর সঙ্গে আল-যার কালীর গ্রন্থেরও বহু উল্লেখ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

তাঁর পূর্বে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পেনের অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের তেমন বিশেষ কোন অবদান ছিল না। তিনি সাইন ও ডার্ম-এর একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। এই তালিকায় তাঁর নিজস্ব একটি পন্থাও সন্নিবেশিত করেন। ব্যাসার্ধকে গ্রীক ও হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ পরিধির অংশ হিসাবে প্রকাশ করতেন। আল-যারকালী এর কোনটাই অনুসরণ না করে ব্যাসার্ধকে ১৫০´ ধরে নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করেন।

তিনি ত্রিকোনমিতির সমস্ত সম্বন্ধগুলোর তালিকা প্রস্তুতির পন্থা বর্ণনা করে একটি পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থটি ল্যাটিনে অনূদিত হয়।

তাঁর দ্বারা মোট কতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। উল্লেখ্য যে, রানী ইসাবেলা ও তাঁর গুরু জিমনজেজ বিজয় উল্লাসে মুসলিম বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহের ধ্বংসের অগ্নিযজ্ঞ পালন করেছিলেন। সে সময়ে অগ্নির গ্রাস থেকে অল্প গ্রন্থই রেহাই পেয়েছিল।

www.pathagar.com

হয়ত সেসব কারণেই যারকালীর শত গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৬টি গ্রন্থ ব্রুকেলম্যান খুঁজে পেয়েছিলেন।

আল কিরমানী (৯৭৬-১০৬৬)

তিনি স্পেনের বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। ঐতিহাসিক আল-কিফতী বলেন, "তিনি জ্যামিতি ও গণিত বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি হাররাম শহরে চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যামিতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। অস্ত্র চিকিৎসায় সুদক্ষ ছিলেন। 'ইখওয়ানুস সাফার' গ্রন্থগুলো তিনি তাঁর আল যাজরিতি গ্রন্থটি সহ প্রকাশ করেন। বৈজ্ঞানিক মহলে এই গ্রন্থগুলো খুবই আদৃত হয়।

ইবনুল মাসাহ্ (৯৭৯—১০৩৫)

তিনি স্পেনের অধিবাসী। অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি ব্যবসায়ী, অঙ্ক, মানসিক ক্যালকুলাস, সংখ্যার প্রকৃতি, জ্যামিতি আস্তারলব প্রণয়ন ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি আস্তারলবের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন ফল পর্যালোচনা করে একটি তালিকা রচনা করেন। এই তালিকায় গ্রীক বা পূর্বতন আরব বৈজ্ঞানিকদের পন্থা অনুসরণ না করে নিজ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করার তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁর যেসব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জ্যামিতি সম্বন্ধে দুটি, আস্তারলব সম্বন্ধে দুটি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে সাঈদ (১০২৯—১০৭০)

ইনি টলেডোর মানমন্দিরে গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষক ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ কার্যে আল-যারকালী ইবনে সাঈদকে স্থান দেন। তিনি সাঈদের পর্যবেক্ষণ ফল ও গণনা অভ্রান্ত হিসাবে তাঁর তালিকা গ্রহণও করেন। বৈজ্ঞানিকের চেয়ে ঐতিহাসিক হিসাবে ইবনে সাঈদের খ্যাতি ছিল সমধিক। তিনি 'কিতাবুত তারিফ

www.pathagar.com

বি তাবাকাতুল উসাস' নামে একটি বিশ্ব-ইতিহাস রচনা করেন। ইতিপূর্বে এমন ব্যাপক বিশ্ব ইতিহাস রচনার কথা জানা যায় না।

নিজে বৈজ্ঞানিক, সুতরাং ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসকেও বাদ দেন নি। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে পৃথিবীর ৮টি সভ্যতার অবদান। তা হলো—হিন্দু, পারসী, ব্যালডিয়ান, গ্রীক, ল্যাটিন, মিসরী, মুসলিম ও য়াহূদী। তাঁর মতে বিজ্ঞানে মুসলিম ও গ্রীকদের অবদানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

তাঁর বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থটি ল্যাটিনে অনূদিত হয়। পাদ্রী লুই চেকো ১৯১২ খৃস্টাব্দে বৈরূত থেকে ভাষ্যসহ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির এ পর্যন্ত কোন ইংরেজী অনুবাদ হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি 'আম-বারুল লুকামা'।

ইবনে আবির রিজাল (মৃত্যু ১০৪০ খৃস্টাব্দ)

অঙ্কের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞানেই তাঁর প্রতিভা বিকাশলাভ করে। জ্যোতিষবিজ্ঞানে প্রগাঢ় অনুরাগের প্রমাণ হলো তাঁর প্রধান গ্রন্থটির নাম 'কিতাবুল বারী ফি আহ্কামিল নজুম' অর্থ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির সংযোগস্থলের অবস্থান অনুযায়ী কুণ্ঠী প্রণয়নের গ্রন্থ। যদিও জ্যোতিষ গ্রন্থ, কিন্তু তখন ইউরোপে এ-টি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থটি প্রথমত জুডা বিন মোজেজ আরবী থেকে স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। পুনরায় এটি ল্যাটিনে অনূদিত হয়। এই ল্যাটিন অনুবাদের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এর মূল আরবী গ্রন্থের কপি বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস, প্যারিস, বার্লিন, এসকুরিয়ান প্রভৃতি লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে। এত-দ্ব্যতীত জ্যোতিষ সম্বন্ধে 'উরজুজাও' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল-হাসান এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই বৈজ্ঞানিক কতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন জানা যায় না। হয়ত তাঁর অনেক গ্রন্থই অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল। ব্রকলম্যান মাত্র ৩টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

আহমদ বিন ইউসুফ

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর রচিত দুটি বিজ্ঞান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

আহমদ বিন ওমর

জ্যামিতি ও গণিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ৫টি। ব্রক্‌লম্যান শুধু একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন।

উমাইয়া বিন আবদুল আযীয

তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। কবিতায় তিনি আস্তারলব সম্বন্ধে যে বর্ণনা করেন তাতে তাঁকে কবি এবং আস্তারলব বিজ্ঞানীও মনে করা যেতে পারে। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৮টি।

আল-হাসান বিন মেসবাহ

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন।

আবু মুহাম্মদ আল-হাসান

এই বৈজ্ঞানিকের রচিত মাত্র ১টি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইবনে কারনিব

তিনি দর্শন ও গণিত বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর রচিত ৩টি বই-এর সন্ধান পাওয়া যায়।

দাউদ আল মুনাজ্জিম (মৃত্যু ১০৩৮ খৃস্টাব্দ)

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় বুয়াইদ সুলতান ইমাদউদ্দীন তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। ব্রক্‌লম্যান তাঁর একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

রেজকুল্লাহ আল-মুনাজ্জিম

তিনি মিসরের অধিকাংশ যাদুকর ও হাইয়াত সাধকের ওস্তাদ ছিলেন। মিসরের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তিনি খুব সুরসিক ছিলেন।.

আল হাররামী

তিনি গণিত বিজ্ঞানী ছিলেন এবং ৬টি বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করেন।

আস-সাইদ নামী

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও গণিত বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ৩টি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল-দামদামী

তিনি একটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

আবদুল হামিদ

তিনি অঙ্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর রচিত ৩টি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আলী ইবনে ইসমাঈল

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কবিও ছিলেন।

আলী বিন আন নজর

তিনি মিসরের কাযী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, সাহিত্য, কাব্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

আল-মারওয়ার রোজী

বংশানুক্রমিক বৈজ্ঞানিক পরিবার। পূর্বপুরুষদের আদর্শ অনুযায়ী তিনি একটি তাকবিম তৈয়ার করেন। এ থেকেই তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান

www.pathagar.com

গবেষণার ঝোঁক চাপে। এর ফলে তিনি বিজ্ঞানের উপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর গবেষণা ও প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল—এমন সব অপেক্ষাকৃত কর্মখ্যাতি সম্পন্ন মুসলিম বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে স্থানাভাবে পরিচয় বর্জিত নাম ও গ্রন্থ সংখ্যার শুধুমাত্র একটি তালিকা তুলে ধরা হলো :

১. আবু বরমা, রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩টি, ২. আল ফতেহ (মৃত্যু ১০১৪ খৃস্টাব্দ), গ্রন্থ ১টি, ৩. আল-কামরানী, গ্রন্থ ৯টি, ৪. আত-তানুসী, ৫. ইবনুল বাজিয়ার, গ্রন্থ ৫টি, ৬. ইবনে নাজিযাত, গ্রন্থ ১টি, ৬. মুহাম্মদ বিন আকদাম, গ্রন্থ ১টি ৮. মুহাম্মদ বিন নুররাত, গ্রন্থ ১টি, ৯. মুহাম্মদ বিন ঈসা, ১০. ইয়াহিয়া বিন মহল, ১১. ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ গ্রন্থ ৮টি, ১২. ইউহান্না আলকাম, গ্রন্থ ৩টি, ১৩. আল হারুনী, গ্রন্থ ১টি, ১৪. আবু সাঈদ আল ইমানী, গ্রন্থ ৩টি, ১৫. আবু সাঈদ আল বুযজামী, গ্রন্থ ১টি, ১৬, আবু আলী বিন আবি কুররাহ, গ্রন্থ ১টি, ১৭. আবুল আব্বাস গ্রন্থ ২টি, ১৮. আর-রাযী, গ্রন্থ ৪টি, ১৯. আবুল কাসেম, ২০. ইবনে সিমুবিয়া, গ্রন্থ ২টি, ২১. ইবনুস মনবদী, ২২. আবু সাদ, গ্রন্থ ১টি, ২৩. মুহাম্মদ বিন আহমদ, ২৪. আবু জাফর মুহাম্মদ, ২৫. আবু জাফর আল-হাসান, গ্রন্থ ১টি, ২৬. আবু আবদুল্লাহ আহমদ, গ্রন্থ ২টি।

আল গাযালী (১০৫৮ —১১১১ খৃস্টাব্দ)

খুরাসানের অন্তর্গত তুন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু সমস্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রক্‌লম্যান এ পর্যন্ত মোট ১৭টি গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। এসব গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই সাহিত্য ও দর্শন হিসাবে ইসলামের মৌলিক সম্পদ।

অঙ্কশাস্ত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানেও গাযালী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। নক্ষত্রাদির গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সম্ভবত দ্বিতীয় গ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অধ্যাপক মারটনের মতে দ্বিতীয় গ্রন্থটি খুব সম্ভব প্রথম গ্রন্থের অন্যতম সংস্করণ।

www.pathagar.com

জ্যোতিবিজ্ঞান ছাড়া অঙ্কশাস্ত্রের দিকেও গাযালী মনোযোগ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল ম্যাজিক স্কোয়ার। উল্লেখ্য যে, গাযালী এবং সাবিত ইবনে কোরা ছাড়া ম্যাজিক স্কোয়ার মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

গাযালীর পুস্তকগুলো প্রায় সবই আরবীতে রচিত। সঙ্গে সঙ্গেই সেসব গ্রন্থ পারসীতে অনূদিত হয়ে যায়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে গাযালীর গ্রন্থগুলো ইউরোপে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। এ সব গ্রন্থের অনেকগুলোই ল্যাটিন অনূদিত হয়। ইউরোপের সমস্ত প্রধান ভাষায় এসব গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে। গাযালীর শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থগুলোর নাম নীচে দেওয়া গেল ঃ

১. 'ইহিয়া-উল-উলুমুদ দীন' বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। ম্যাকডোনাও Emotional Religion in Islam as effected by Music and Singing' নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ২. 'কিতাবুদ-দুররা আল-ফখিরা ফি কাশফুল উলুম খিরা' ৩. 'কিমিয়ায়ে সাআদাত'। এই গ্রন্থটি ক্লড ফিণ্ড The Alchemy of happiness নাম দিয়ে ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থটি 'সৌভাগ্যের পরশমণি' নামে বাংলা ভাষাতেও অনূদিত ও বহুল প্রচারিত হয়ে আছে। ৪. 'মিশকাতুল আনোয়ার'। গেরডনার এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ৫. 'কিতাবুল তাহাফাতুল ফালাসিফা' The Internal Contradiction of Philosophy নামে এবং ৬. 'কিতাবুল মনকিদলিন আদ-দালাল' The Liberation From error নাম দিয়ে ক্লড ফিল্ড এই দুটি গ্রন্থই ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

ওমর খৈয়াম (১০১৯—১১২৩-২৪ খৃস্টাব্দ)

গ্রীসের সর্বপ্রথম অংক বিশারদ মেলস মেসব ছিলেন দার্শনিক, পদার্থবিজ্ঞানী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ। তিনি ছিলেন মহাদার্শনিক এরিস্টটল অনুরূপভাবে জ্যোতিবিজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম পরিচিত হয়ে গেলেন মহাকবি হিসাবে। ওমর খৈয়াম কিন্তু কবি হিসাবে তাঁর জন্মভূমিতে তেমন খ্যাত ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর ৭৩৪ বছর পরে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ফিজরাল্ডের রুবাইয়াতের ইংরেজী অনুবাদের

www.pathagar.com

দ্বারা ইউরোপে তাঁর রুবাইয়াত ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি কবি হিসাবে বিশেষ পরিচয় লাভ করেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কাব্য প্রতিভাকে উপেক্ষা করেছেন। এর কারণ হলো ধর্মীয় গোড়ামী এবং ধর্মদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রাণদণ্ডের আইন।

ওমর খুরাসানের রাজধানী নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর গুরু কবি আসাদী, আনওয়ারী, আউলিয়া-কবি ফরিদ-উদ্দীন আত্তার, কবি নিজামই আমিরী, কবি ও সাহিত্যিক নিজামই আরুজী, কবি রফিই নিশাপুরী, জ্যোতির্বিদ হাকিমি মওসিলি, দূর-বীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক আবুল হাসান, সাহিত্যিক ও রাজ-নীতিবিদ হাসান ইবনে ইসহাক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু ইমাম গাযালী, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সমালোচক আল-বায়হাকী দার্শনিক ও দার্শনিকদের বিবরণী লেখক আন-শহরুস্থানী প্রমুখ জন্মগ্রহণ করেন খুরাসান ও নিশাপুরে।

আমীর আবু তাহির ওমর খৈয়ামকে বহু অর্থ সাহায্য করেন এবং রাজ্যের সুলতান মালিক শাহের প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলকের সঙ্গে ওমরের পরিচয় ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। সুতরাং গরীব ওমর খৈয়াম অচিরেই প্রধান মন্ত্রীর বন্ধু হয়ে বিভিন্ন প্রকারে রাজকীয় সুযোগ লাভ করেন এবং দারিদ্র্যের কবল থেকে রেহাই পান।

সুলতান মালিক শাহের নেক নজরের ফলে নিশাপুরের পর্ণ কুটীর থেকে রাজধানী মার্ভ নগরে রাজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বিজ্ঞান গ্রন্থগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনমানব তাঁকে সে যুগের ইবনে সিনা বলে মনে করত।

সুলতান তাঁকে রাজ-জ্যোতিষ পদে নিয়োজিত করেন। তাঁর গ্রীক ভাষাতে অগাধ অধিকার ছিল। তাঁর ধীশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একটি দর্শন গ্রন্থ ৭ বার পাঠ করে মুখস্থ করে ফেলতেন। ওমর খৈয়ামের প্রতিভার সামনে ইউক্লিড, এরিস্টটলের প্রতিভা ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। একদিন ইমাম গাযালী ওমর খৈয়ামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে, গোলকের সমস্ত অংশ এক প্রকার হওয়া সত্ত্বেও ঐ অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে পৃথকভাবে জানা কিরূপে সম্ভব?'

www.pathagar.com

গাযালীর অনুরোধে ওমর তখনই অঙ্কের ব্যাখ্যা শুরু করেন। বেলা দ্বিপ্রহর থেকে অপরাহ্ন পর্যন্তও তাঁর ব্যাখ্যা শেষ হয়নি। গাযালী মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে মন্তব্য করেন, সত্য সূর্যের দর্শন পেয়ে ······ মিথ্যা যবনিকা অপসারিত হয়েছে। পূর্বে আমার যে ধারণা ছিল, সেই মিথ্যা ধারণা সত্য সাধক ওমরের ব্যাখ্যায় অপসারিত হয়েছে এবং সত্য প্রকাশিত হয়েছে।'

কিন্তু এই সত্য প্রকাশের জন্যই ওমরকে ধর্মোন্মাদরা কাফির মনে করত। সুলতান ও প্রধান মন্ত্রীর বন্ধুত্বের কল্যাণে হয়ত তিনি রেহাই পেয়েছিলেন।

ওমর মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে তাঁর শিষ্যদের শেষ উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে আহ্বান করেন। তাঁরা এলে তিনি তাঁদের কথা ভুলে যান। এই সময় নামায আদায় করতে রুকুতে বা সিজদায় গিয়ে তিনি জোরে জোরে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ্! আমি যথাসাধ্য তোমাকেই চেয়েছি। আজ এই ভিক্ষা জানিয়ে আত্মনিবেদন করছি, যেন তোমার করুণা ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত না হই।' এরপর আর মাথা তুলতে পারেন নি। সিজদাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বীজগণিত যে তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি একটি রুবাইয়াতে অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করেন।

'আস্তি নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান।'
বীজগণিতের সূত্র রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।

অর্থাৎ তাঁকে আস্তিক, নাস্তিক এবং গভীর জ্ঞানী দার্শনিক—যা-ই কিছুবলা হোক, এইসব শেষ করে দিয়েই তিনি বীজগণিতের সত্যোদ্ধারের সূত্র রেখা ধরে যৌবনে নিমগ্ন ছিলেন। বস্তুত মুসলিম বিশ্বের নিকট আজ আর এ জন্য অবিদিত নয় যে, ওমর খৈয়াম একজন সত্যিকারের আল্লাহ্-প্রেমিক, গণিতবিদ, বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কোন মুসলমানকে কখনও কাফির মনে করা উচিত নয়।

চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যায় ওমর পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে বীজগণিতই তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর ৭৩৪ বছর পরে ইউরোপ তাঁর আংশিক কাব্য প্রতিভাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তাঁর মৌলিক বিজ্ঞান প্রতিভাকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে দেয়। গণিত জগতে এনালিটিক জিওমেট্রির কল্পনা তিনিই

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম করেন। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে জনৈক গণিতবিদ এঁকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। বেশি অবশ্যক যে, ওমর খৈয়ামের এই আবিষ্কারকে ফ্রান্সের দে-কার্তের নামে বেনামী করা হয়েছে।

ওমর সর্বপ্রথম এলজাবরার সমীকরণগুলোর শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা করেন।

জ্যামিতিক সমাধানে বীজগণিত, বীজগণিতের সমাধানে জ্যামিতিক পদ্ধতি মুসলমানদেরই আবিষ্কার। কারণ, গ্রীকদের জ্যামিতির মধ্যে বীজগণিতের কোন প্রকার আভাসই পাওয়া যায় না।

ভগ্নাংশীয় সমীকরণের উল্লেখ ও সমাধান করে ওমরই সর্বপ্রথম বীজগণিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

বাইনোমিয়াল থিয়োরাম বীজগণিতের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। দুইটি সংখ্যার যোগফল, যে কোন শক্তি মাত্রায় উন্নত হলে সংখ্যাগুলোর গুণক নির্ধারণ করবার এ হলো সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা।

ওমর খৈয়ামই এর পথ প্রদর্শক। তিনি যে কোন সংখ্যা হোক না কেন, সহজভাবে a ও b-এর গুণক নির্ধারণ করার এক সাধারণ সূত্র উদ্ভাবন করেন। এই হলো বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের সূত্রপাত। এই বাইনোমিয়াল থিয়োরামের আবিষ্কর্তা হিসাবে নিউটন বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। অথচ নিউটনের বহু শত বছর পূর্বে ওমর খৈয়ামই-এর প্রথম আবিষ্কর্তা।[১]

সুলতান মালিক শাহের নির্দেশে ওমর খৈয়াম ১০৭৪ খৃস্টাব্দে রাজকীয় মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৭জন সহকর্মী বৈজ্ঞানিক নিয়ে তিনি 'জালালী অব্দ' নাম দিয়ে একটি নিখুঁত অব্দ প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের মতে, জুলিয়াস সিজারের প্রবর্তিত পঞ্জিকার চেয়ে জালালী পঞ্জিকা গণনার সূক্ষ্মতায় ভ্রম-শূন্য হিসাবে অধিকতর উৎকৃষ্ট। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরী বর্তমান খৃস্ট পঞ্জিকা সংস্কার করেন। তাঁর আদেশেই ইংরেজী মাসগুলোর কোন্ মাস কত দিনে যাবে, তা নির্ধারিত হয়ে

---

১. বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান: এম. আকবর আলী।

www.pathagar.com

এখনও বলবত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে গ্রেগরী পঞ্জিকার চেয়ে জালালী পঞ্জিকা আরো নির্ভুল, উন্নত ও নিখুঁত ছিল। ওমর খৈয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ফল লিপিবদ্ধ করে অন্যান্য সহকর্মী সহ একটি তালিকা (Astronomical Table) প্রস্তুত করেন। এর নাম রাখা হয় 'জিজ-ই মালিক শাহী'।

ওমর খৈয়ামের ছাত্র ও সুপণ্ডিত নিযামী বলেন, "৫০৬ হিজরীতে ওমর খৈয়াম ···বলখ নগরে অলীব আবু সাদের গৃহে উৎসব আমন্ত্রণে গমন করেন। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে ওমর খৈয়াম বলেন, আমার এমন স্থানে কবর হবে যে, মৌসুমী বায়ুর প্রতিটি প্রবাহ্ আমার কবরে ফুল ঝরিয়ে দেবে।······এই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে······এ বাণী কতদূর সফল হয়েছে, দেখবার জন্য ···(নিশাপুর) তাঁর কবর যিয়ারতে যাই। হীরা গোরস্থানের বাম দিকে দেওয়ালের কোণে তাঁর কবর। কবরের চার ধার লাল পীচ এবং ন্যাসপাতি ফুলে এমন আচ্ছাদিত যে, সেটাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ফুল ঝরে পড়ছে কবরের উপর। তাঁর বলখ নগরের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ল। তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁর প্রত্যেকটি বাণী সফল হয়েছে দেখে আমি আর ক্রন্দন সম্বরণ করতে পারলাম না।"[১]

নিজামীর বর্ণিত ওমরের ভবিষদ্ববাণী, আর একটি ঘটনা নিম্নরূপ: বুখারার সুলতান শিকারে যাওয়ার জন্য মেঘমুক্ত শুভ দিন গুণে বের করে দেখার জন্য ওমর খৈয়ামকে বলেন। ওমর খৈয়াম গণনা গণে একটা শুভ দিন ঠিক করে দেন এবং তিনি নিজেও শিকারে সুলতানের সঙ্গী হন। বেশ কিছু অগ্রসর হওয়ার পর সমগ্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠে। তা দেখে সুলতানের সঙ্গীরা ওমর খৈয়ামকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করেন। স্বয়ং সুলতানও ম্রিয়মাণ। খৈয়াম দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন—এক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ মুক্ত হয়ে যাবে এবং ৫ দিন পর্যন্ত মেঘ বা বৃষ্টি হবে না। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। আবুল মাশারের মতই ওমর খৈয়ামও জ্যোতিষ-বিজ্ঞান সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

---

১. চাহার মাকালা: নিজামী আরুজী।

www.pathagar.com

নানা গ্রন্থে তাঁর রচিত ২২টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ থাকলেও ২০টির বেশী পুস্তকের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রন্থগুলো এই:

১. রুবাইয়াত ২. আলজাবরা ওয়াল মুকাবিলা ৩. আল জিজ-ই-মালিক শাহী ৪. আল-কাউল ওয়াল তাকলিফ ৫. আল-ওয়াজুক ৬. লাওয়াজিমুল আসকিনা ৭. মিজান-উল-হিকাম (রসায়ন বিজ্ঞান) ৮. মুসকিলাত-ই-হিসাব ৯. নিজাম-উল-মুলক (রাজনীতি) ১০. দার ইলমে কুল্লিয়াত ১১. নওরোজনামা ১২. A Hand Book on Natural Science (আরবী নাম অজ্ঞাত) ১৩, The exactitude on the Indian Method of extracting square and cube roots (আরবী নাম অজ্ঞাত) ১৪. এরইয়ানুন নাফিসা ১৫. (বাংলা অনুবাদে) মনিরত্ন বিজ্ঞান ১৬. রিসালা ফি বারাহিন আলজাবর ওয়াল মুকাবিলা ১৭. রিসালা ফি মারহু মা উশকিলা মিন মুসদারাত কিতাবু উকলিদাস ১৮. কিতাবুল বুরহান আলা তুরুক ইসতিখরাজ আজলা আল মুরাব্বাত ওয়াল মুকাআবাত ১৯. রিসালা মুকাবাহ ২০. ইলমুল মাসাইয়া ওয়াল মুকাবাত।

ওমর খৈয়ামের একমাত্র রুবাইয়াত ছাড়া সমুদয় বিজ্ঞান গ্রন্থ সংগ্রহ করে বুদ্ধিমান ইউরোপ জ্ঞান আহরণ ছাড়া অনুবাদ ও প্রচার-প্রকাশে অনাগ্রহী ছিল। অথচ বহু অখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুবাদ ও প্রকাশ-প্রচারে মুক্তমনা ছিলেন। ওমর তো বিশ্ববিখ্যাত। ওমরের কবিতাগুলোর এত আদর, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য রহস্যজনকভাবে নীরব। ওমরকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে বেশি তুলে ধরলে বিশেষত তাঁর বিজ্ঞান পুস্তকসমূহের সঠিক অনুবাদ প্রকাশ পেলে যে সর্বনাশ হবে, কারণ নিউটন আর দে-কার্তে যে দুটি বিখ্যাত থিয়োরী বা থিয়োরাম ভিত্তি করে জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারকের শাহী মসনদে সমাসীন আছেন, তার মূল আবিষ্কারক যে ওমর খৈয়াম সেই সত্য-যে ফাঁস হয়ে যাবে?

আল-ফাজারী (মৃত্যু ১১২২ খৃস্টাব্দের পূর্বে)

ওমর খৈয়ামের মানমন্দিরের যে ৭ জন সহকর্মী ছিলেন, আল-ফাজারী তাঁদের অন্যতম। অঙ্কশাস্ত্র, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান,

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউক্লিডের চতুর্দশ খণ্ড পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ রচনায় তাঁর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রয়েছে। বইটির নাম হলো 'ইখতিয়ার নিত্‌-মুল উকলিদাম' গ্রন্থটির চতুর্দশ খণ্ডটি স্যাডিলো কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তুলাদণ্ড প্রস্তুত করেন এবং তুলাদণ্ডের নির্ভুল ব্যবহার ও ওজন সম্পর্কে বিশদ আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা যান্ত্রিক উপায়ে চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যন্ত্রটি বিনষ্ট করে দেয়। ফলে বৈজ্ঞানিক খুবই হতাশ হয়ে কিছুদিন পরেই মারা যান।

আল-খাজিমী

তিনি জনৈক ধর্মীয় ক্রীতদাস ছিলেন। শিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও প্রতিভা দৃষ্টে মনিব তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গণিত-শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান সঞ্জর সেলজুকীর রাজত্বকালে তিনিও পঞ্জিকার সংস্কার করেন। এই পঞ্জিকার নাম হলো 'সঞ্জরী পঞ্জিকা'। মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ ফলের একটি তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন। এই তালিকার নাম হলো 'আল-জিজ-আল-মুতাহার আস-সঞ্জরী'।

হাকিম লুকরী

হাকিম লুকরী ছিলেন একজন ধনী আমীর গণিতবিজ্ঞানী। তিনি খুবই সুপণ্ডিত ছিলেন। পঞ্জিকা সংস্কারে ওমর খৈয়ামের সহায়ক ছিলেন এবং নিজেও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

মুহাম্মদ কাজীম

তিনি গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞানী হিসাবে ওমরের মানমন্দিরের অন্যতম সহকারী ছিলেন।

নাজিম ওস্তী

তিনি গণিতবিদ ও সুচিকিৎসক হিসাবে সর্বজনমান্য ছিলেন। মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলক তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি গণিত সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

www.pathagar.com

মান্সুরী বায়হাকী

তিনি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পরিমিতিতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান মালিক শাহ ইস্পাহানের মানমন্দিরে গবেষণা কার্যের জন্য সরকারী তহবিল হতে বৃত্তি দিয়ে তাঁকে নিয়োগ করেন। বায়হাকী ইসমাইলী সম্প্রদায়ের ধর্মোন্মাদের হাতে নিহত হন।

ইবনে কুশাক

গণিত ও জ্যোতির্বিদ হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে কতগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তকগুলো সুলতান সঞ্জরের লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

তুসী, বাজ্জা, রুশ্দ, প্রমুখ যুগস্রষ্ঠা বিজ্ঞানী

আবদুল বাকী

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে তিনি জ্যামিতিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইউক্লিডের দশম পুস্তকের একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য গ্রন্থটি শুধু জ্যামিতি অঙ্কনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করায় গ্রন্থটি সুধী সমাজে খুবই আদৃত হয়। জিরার্ড এটি ল্যাটিনে অনুবাদ করেন।

ওমর খৈয়ামের অনন্য প্রতিভার প্রভাব কাটিয়ে উঠার মত বৈজ্ঞানিক সে যুগে খুব কমই ছিলেন। যা কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক স্বাধীন সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন সেই কয়েকজন সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে। তন্মধ্যে বাকীও অন্যতম।

বদি আস্তারলবী (মৃত্যু ১১৩৯-৪০ খৃস্টাব্দ)

আস্তারলব যন্ত্র প্রস্তুতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার জন্য তাঁকে এই নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য তিনি যারকালীর আস্তারলব যন্ত্রের চেয়েও কোন উন্নততর সংশোধন বা সংস্কার করতে পেরেছিলেন কিনা, জানা যায় না। কিফতী প্রমুখ ঐতিহাসিক তাঁর আস্তারলব যন্ত্র প্রস্তুতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। তৎকালে তিনি উচ্চস্তরের জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং আস্তারলবের দক্ষতা তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানে দক্ষতারই নামান্তর।

ইরাকের সেলজুক বংশীয় সুলতান মুখিতউদ্দীন মাহমুদ মালিক শাহের আদর্শ অনুসরণে তাঁর প্রাসাদে একটি মানমন্দির স্থাপন করে আস্তারলবীকে তাঁর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আস্তারলবী তাঁর সহকারীদের নিয়ে ১১২০—১১৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নানা

www.pathagar.com

ধরনের পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন এবং এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল নিয়ে 'মুহাম্মদীয় তালিকা' নামে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন।

আল-খারাকী (মৃত্যু ১১৩৮-৩৯ খৃস্টাব্দ)

খুরাসানের মার্ভের নিকটবর্তী খারাক নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে খাওয়ারিজমের শাহ কুতুবউদ্দীন তাঁকে মার্ভে আনয়ন করেন এবং রাজদরবারে পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে স্থান দেন। তিনি শুদ্ধ গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভৌগোলিক ও দার্শনিক ছিলেন। গণিত বিজ্ঞানে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে মাত্র ৪টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

আবদুল মালেক আশ-শিরাজী

গণিতশাস্ত্রের মধ্যে কনিকের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। তিনি সাবিত ইবনে কোরার এবং হিখাল আল-হিমসীর এপোলোনিয়াসের কনিকের অনুবাদের উপর ভিত্তি করে সুন্দরভাবে একটি কনিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি অক্সফোর্ডে সংরক্ষিত আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি আল-মাজেস্টের একটি সংক্ষিপ্তসারও প্রণয়ন করেন।

ইবনুদ-দাহ্হাম (মৃত্যু ১১৯১ খৃস্টাব্দ)

তিনি মসুলে মন্ত্রী জালালউদ্দীন ইস্পাহানীর অধীনে একটি চাকরী পান। এখানে টিকতে না পেরে সুলতান সালাহ্উদ্দীনের অধীনে মাইয়াফারিকিনের দপ্তরের ডিরেক্টরে নিযুক্ত হন। স্থানীয় গভর্নরের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১১৯০ খৃস্টাব্দে মিসরেও জীবিকানেষণের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। তিনি 'ফারাজ' বা সম্পত্তি বন্টন বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এতে গণিতশাস্ত্রে দক্ষ থাকতে হয়। তিনি ১১৬৬-৬৮ খৃস্টাব্দে সম্পত্তি বন্টনের সহজ উপায় উদ্ভাবন করে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তালিকাটির নাম রাখা হয় 'তাকবিম আন-নজর বিল মাসায়েল আল-খিলকিয়া'।

www.pathagar.com

তালিকাটির ভূমিকায় ব্যাকরণ ও লজিক সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন।

তিনি 'গরিবুল হামিদ' নামে ২৬ খণ্ডে বিভক্ত একটি বৃহৎ গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। বইটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এত বড় পুস্তকের যে কোন শব্দ ইচ্ছা মাত্রই সহজে বের করতে কোন অসুবিধে ছিল না। তাঁর রচিত একটি ইতিহাসও ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান তালিকা ব্যবহারে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ও পরিব্রাজক ছিলেন।

আহমান আল-আইনজরবী (মৃত্যু ১১৫৩—৫৪ খৃস্টাব্দ)

তিনি কায়রোতে খলীফা জাফিরের দরবারে রাজ-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহায়ক হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কতটা কাজে লাগানো যেতে পারে, এ সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আবুস-সালাত (১০৬৭—১১৩৪ খৃস্টাব্দ)

জন্মস্থান দেমিয়া থেকে তিনি সেভিলে গমন করেন। কায়রো ও তিউনিসেও তিনি অবস্থান করেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে গ্রন্থ প্রণয়নের অসাধারণত্বের প্রমাণ রাখেন। গণিত, ন্যায়শাস্ত্র ও সঙ্গীত বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। গণিত শাস্ত্রের মধ্যে 'রিসালা ফিল আমল বিল আস্তারলব' গ্রন্থটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে তিনি মেকানিকস ও হাইড্রোস্টেটিক সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা করেন। তিনি জ্যামিতি সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতবিজ্ঞান গ্রন্থ 'রিসালা ফিল মুসিকি' তৎকালে খুব খ্যাতি লাভ করে। এই গ্রন্থটি হিব্রুতে অনূদিত হয়।

জাবির ইবনে আফলাহ্ (মৃত্যু ১১৪০—৫০ খৃস্টাব্দ)

তিনি স্পেনের সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ত্রিকোনমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির এতদিনের সর্বজনমান্য মতবাদ ভুল প্রমাণ করে তাঁর ভিত্তি ধূলিসাৎ করে দেন।

www.pathagar.com

গোলীয় ত্রিকোনমিতিতে এতদিনকার টলেমির সর্বজনমান্য অভ্রান্ত নামে অভিহিত মতবাদ Rule of six quantities-এর ভুল ঘোষণা করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্তরায় সম্বন্ধে সুনিপুণভাবে আলোচনা করেন এবং এর পরিবর্তে 'Rule of four quantities' প্রচলন করেন।

এই থেকেই তিনি গোলীয় সমকোণী ত্রিভুজের ত্রিকোনমিতিক ফরমুলাগুলোও উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই নব উদ্ভাবনী পদক্ষেপই তাঁকে বিজ্ঞান জগতে অমর করে রাখবে। অবশ্য তাঁর বহু পূর্বেই ত্রিকোনমিতির এসব ফর্মুলার প্রচলন হয়ে আসছে। সাবিত ইবনে কোরাই সর্বপ্রথম মুসলিম বিজ্ঞান জগতে-আইন ফর্মুলার প্রবর্তন করেন। ক্রমশ জটিল ও সূক্ষ্মতর বিষয়ে অগ্রগতির সাথে সাথে পূর্বেকার অনুসৃত ত্রুটিগুলো বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে ধরা পড়তে থাকে। আল বেরুনীও ত্রিকোনমিতির এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আবিষ্কার করেন। কিন্তু তা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু জাবিরের নব উদ্ভাবন ও অভিনবত্ব বিশেষত ত্রিকোনমিতির ফর্মুলাগুলোর ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই ফর্মুলা জাবিরের ফর্মুলা বলে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

জ্যোতিবিজ্ঞানেও টলেমির এতদিনকার সর্বজনমান্য মতবাদকে জাবির ইবনে আফলাহ ভুল প্রতিপন্ন করেন। জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি ৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। টলেমির মতে বুধ আর শুক্র গ্রহের কোন দৃশ্যে লম্বন নেই এবং এরা সূর্যের চেয়ে পৃথিবীরই নিকটবর্তী। জাবির তাঁর পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এ মতবাদ ভুল। নিশ্চয়ই বুধ আর শুক্র গ্রহের কিছু লম্বন রয়েছে এবং শুক্র পৃথিবী ও সূর্যের সংযোগ রেখার মধ্যেই অবস্থিত। শুধু উপপত্তিকতায় না থেকে সত্যকে উদঘাটনের জন্য তিনি যন্ত্রপাতির দিকে মনোযোগ দেন। এর ফলে turquet যন্ত্রটি আবিষ্কার হয়। জাবিরের জ্যোতিবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থ জিরার্ড ল্যাটিন ভাষায় ল্যাটিন নাম দিয়ে অনুবাদ করেন।

ইবনে বাজ্জা (জন্ম ১১০৬ খৃস্টাব্দ)

গ্রানাডা ও পরে সারাগোজার গভর্নর আবু বকর ইবনে ইবরাহীমের মন্ত্রীপদে ২০ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। খৃস্টান-রাজ আল-ফানসো

www.pathagar.com

সারাগোজা দখল করার পর তিনি ফেজ নগরীতে চলে আসেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

বিতাড়িত যাযাবর জীবনে সেভুবা নামক স্থানে অবস্থানকালে তাঁর স্বাধীন দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ-প্রচারের ফলে স্থানীয় আমীর আবু ইসহাক ইবরাহীম কর্তৃক তিনি ধর্মদ্রোহী হিসাবে কারারুদ্ধ হন। প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি ইসলামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। অসামান্য প্রভাব প্রতিভার জন্য তিনি অনেকেরই বিদ্বেষের পাত্র ও শত্রুতে পরিণত হন। মন্ত্রী অবস্থায় তিনি একবার প্রাণদণ্ডেরও নির্দেশ দেন। অনেকেরই ধারণা, ফেজ নগরীতে তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি বিষ প্রয়োগের দ্বারা নিহত হন। দার্শনিক হিসাবে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি যে কেবল চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন, তা নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁর মৌলিক অবদানে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান, সর্বোপরি সঙ্গীত বিজ্ঞানে তাঁর অবদান বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে। জ্যোতি-বিজ্ঞানে তিনি টলেমির নানা মতের বিশেষ সমালোচক ছিলেন। এই সমালোচনার ফলেই বিতরুজির Theory of Spiral Motion আবিষ্কারের সহায়ক হয়।

তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান বা জ্যোতিবিজ্ঞানে কিরূপ সাফল্য অর্জন করে-ছিলেন, তা তাঁর ঘোর বিরোধী সমালোচক ফতেহ ইবনে মাকানের মন্তব্য থেকেই আভাস পাওয়া যায়। ইবনে মাকান তাঁর 'মাতমাহল আনফুস' নামক গ্রন্থে ইবনে বাজ্জা সম্পর্কে বলেন, 'তিনি (বাজ্জা) এই সমস্ত (বিজ্ঞান বিষয়ক) বিষয় খুব ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছেন এবং মনকে গোলকের পরিধি ও জলবায়ুর সীমার দিকে প্রভাবিত করেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কিতাবকে অবজ্ঞা ভরে পরিত্যাগ করেছেন। ঐশী বাণীকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন এবং সম্পূর্ণভাবেই নিজকে জ্যোতিবিজ্ঞানের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন।

অবশ্য মাকানের এই মতকে ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান অতিশয়োক্তি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয়ে ও ধর্মোন্মাদদের চরম প্রতিকূল অবস্থার দরুন পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। তিনি

www.pathagar.com

যশস্বী কবিও ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান তাঁর কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইবনে রুশদ (১১২৬—১১৯৯ খৃস্টাব্দ)

তিনি কর্ডোভার একটি বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ স্পেনের রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন আন্দালুসিয়ার প্রধান বিচারপতি।

তিনিও ছিলেন পূর্বপুরুষদের মত আইনজ্ঞ। ১১৬৯ খৃস্টাব্দে তিনি মেভিলের কাজ পদে নিযুক্ত হন। দুই বছর পরে তিনি কর্ডোভার কাযী পদে উন্নীত হন।

শুধু আইনজ্ঞ নন, তিনি বিখ্যাত চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে মুগ্ধ হয়ে মোওয়াহেদ খলীফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ ১১৮২ খৃস্টাব্দে তাঁকে মারকমে ডেকে পাঠান এবং বৃদ্ধ চিকিৎসক দার্শনিক ইবনে তোফায়েলের স্থানে তাঁকে রাজ-চিকিৎসক নিয়োগ করেন। পরবর্তী খলীফা ইয়াকুব মনসুরও তাঁকে প্রধান চিকিৎসক পদে নিযুক্ত রাখেন।

এরূপ রাজকীয় পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর দার্শনিক মতবাদের জন্য গোঁড়া মুসলিম, খৃস্টান ও য়াহুদী ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। গোঁড়া মুসলমানরা বলেন, 'তিনি শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।" খৃস্টান পাদ্রীরা প্রচার করেন, "তাঁর নাম পাপের প্রতিশব্দ।" ইয়াকুব আল-মনসুরের সময় ধর্মোম্মাদের প্রচারণা চরম আকার ধারণ করে। দার্শনিকের প্রতি জনমনও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে খলীফা তাঁকে কর্ডোভার নিকটবর্তী ইলিসানা নামক স্থানে নির্বাসন দেন এবং তাঁর চিকিৎসা, অঙ্ক ও জ্যোতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত ছাড়া, অন্যসব পুস্তক পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এভাবে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইবনে রুশদ চরম অপমান ও দুরবস্থায় পতিত হন। ১১৯৮ খৃস্টাব্দে খলীফা আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে পূর্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনি এই সুযোগ দীর্ঘদিন ব্যবহারের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.pathagar.com

তিনি জীবনের সমস্ত অবসর সময়ে দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। কথিত আছে, তিনি বিবাহ ও পিতার মৃত্যুর রাত্রি ছাড়া আর কোন রাত্রিতেই অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নি। সঙ্গীতের বিজ্ঞান ভিত্তিক কয়েকটি পুস্তক তিনি রচনা করেন।

বিজ্ঞানে তাঁর স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় টলেমির চিন্তাধারার ত্রুটি-বিচ্যুতির সুনিপুণ সমালোচনার মধ্য দিয়ে। বোসের মতে, তিনি টলেমির গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। পুরাতন মতবাদের বিরোধিতায় তাঁর মতবাদে যে বৈজ্ঞানিক অভিনবত্ব ফুঠে উঠে, তা সবাইকে আকৃষ্ট করে। পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের তাঁর মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবেই প্রভাবিত করে। তিনি গোলকের গতি সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার নাম 'কিতাবু ফি হারকাতুল ফালাক'। গ্রন্থটি জ্যাকব আনাতোলি কর্তৃক হিব্রুতে অনূদিত হয়। স্মিথের মতে তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান ছাড়া ত্রিকোনমিতি সম্বন্ধেও পুস্তক প্রণয়ন করেন।

এই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—তার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে বেঁনা তাঁর Averroes গ্রন্থে ইবনে রুশদের সর্বমোট ৬৭টি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে (১) দর্শন ২৮টি (২) ধর্মতত্ত্ব ৫টি (৩) আইন ৪টি (৪) জ্যোতিবিজ্ঞান ৪টি (৫) ব্যাকরণ ২টি এবং (৬) চিকিৎসা বিজ্ঞান ২০টি।

ইবনে তোফায়েল (জন্ম ১১০০ অথবা ১১২০ খৃস্টাব্দের মধ্যে)

তিনি ছিলেন ইবনে রুশদের গুরু। দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর মনীষা ও বিখ্যাত চিকিৎসা খ্যাতির জন্য ১১৪৭-৪৫ খৃস্টাব্দে তিনি কিউটা ও তাঞ্জিয়ারের গভর্নরের সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মোওয়াহেদ সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি নাকি তাঁর মন্ত্রীও ছিলেন। বার্ধক্যের জন্য ১১৮২ খৃস্টাব্দে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর শিষ্য ও তরুণ বন্ধু ইবনে রুশদ তদস্থলে চিকিৎসক নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

তাঁর দার্শনিক উপন্যাস 'হাই ইবনে ইয়াকজান' তখন খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইবনে বাজ্জা ও জাবির যখন টলেমির নানা ভ্রান্ত মতের সংশোধন শুরু করেন, তখন ইবনে তোফায়েল তাদের নানা দিক থেকে সহায়তা দিতে থাকেন। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তোফায়েল ও অন্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পেঁৗছেন যে, টলেমির মতবাদ ভুল। তোফায়েলের সমালোচনার আদর্শ গ্রহণ করেন তাঁর শিষ্য বিতরুজী। টলেমির Epicycle এবং eccentric-এর থিওরী সম্বন্ধে বিতরুজীর যে সমালোচনা, তা আসলে ইবনে তোফায়েলের অভিমতেরই প্রতিধ্বনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও ইবনে তোফায়েলের মনীষা ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আর-রাযী (১১৪৯—১২১০ খৃস্টাব্দ)

ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর ২৭ বছর পরে খুরাসান প্রদেশের রাই নগরে তাঁর জন্ম।

দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার প্রতিফলন ঘটে। ইতিহাস ও বিজ্ঞানে তিনি বিশ্বকোষ রচনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে। জ্যামিতিতেও তাঁর দান অতিশয় উচ্চস্তরের।

তাঁর রচিত ১০টি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। এসব গ্রন্থ জ্যামিতি, জ্যোতিষ, রাজনীতি, ইতিহাস, আইন, কুরআন শরীফের ভাষ্য, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, ২টি বিশ্বকোষ, অঙ্কশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ভিত্তিতে রচিত।

কামাল উদ্দীন ইবনে ইউসুফ (১১৫৬—১২৪২ খৃস্টাব্দ)

পেণ্ডুলাম আবিষ্কারের গোড়ায় তিনি ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পেণ্ডুলামের দোলনের সমকালীনতা আবিষ্কার করে পর্যবেক্ষণ কার্যে ব্যবহার করেন। অথচ পাশ্চাত্যের অভিমত হলো এই আবিষ্কারটি নাকি গ্যালিলিওর এবং তাঁর পূর্বে কেউ নাকি পেণ্ডুলাম সম্পর্কে কিছু জানতেন না।

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক ইবনে ইউনুসের জন্ম গ্যালিলিওর জন্মের ৪০৮ বছর পূর্বে। ল্যাটিন অনুবাদের মারফত ইবনে ইউনুসের আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর উপর গ্যালিলিও আরো গবেষণা করতে পারেন; কিন্তু কামাল ইবনে ইউনুসের নামকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে পেণ্ডুলামের মূল আবিষ্কর্তা হিসাবে গ্যালিলিওর একতরফা প্রচার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

পেণ্ডুলামের দোলনের সঙ্গে সঠিক সময় নির্দেশের মূল আবিষ্কর্তা যে ইবনে ইউনুস, তা পাশ্চাত্যের পণ্ডিত স্মিথও স্বীকার করেন।[১]

কামাল ইবনে ইউনুস ২০ বছর বয়স পর্যন্ত বাগদাদের নিজামী কলেজে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষে তিনি মসুলে এসে পিতার অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। জ্ঞানী হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেড়ে যায় যে, তিনি যে হাইমিয়া কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর নাম অনুসারে সেই কলেজ 'কামালিয়া কলেজ' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

তিনি রাযীর মত সর্বতোমুখী প্রতিভাধর ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র, অঙ্ক, বিশ্বকোষ, কুরআন শরীফের ভাষ্য, ইবনে সিনার গ্রন্থের ভাষ্য, আরবী ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বীজগণিত, বিশেষ স্কোয়ার নাম্বার, ম্যাজিক স্কোয়ার, জ্যামিতি, সুষম সপ্তভুজ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

তাঁর খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মিসরের সুলতান কামিলের মারফত তার নিকট কয়েকটি বিজ্ঞান-সম্মত প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করেন। তাঁর ছাত্র আল-আভারী এসব প্রশ্নের সমাধান করে উত্তর পাঠিয়ে দেন।

অঙ্কশাস্ত্রের থিওরী অব নাম্বার একালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-স্তরের পাঠ্য। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বলে এই থিওরীর উন্নতি সাধন করে যান। প্রকৃতপক্ষে 'থিওরী অব নাম্বার' সম্বন্ধে আলোচনাই তাঁকে বিশেষ অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

---

১. হিস্টরী অব ম্যাথ: স্মিথ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৩।

www.pathagar.com

শরফ উদ্দীন তুসী (মৃত্যু ১২১০ খৃস্টাব্দ)

বর্তমানে Tusis Staff নামে যে আস্তারলব বিজ্ঞান জগতে পরিচিত, শরফ উদ্দীনই তার আবিষ্কারক। এই আস্তারলব সম্বন্ধে আল-মুসাত্তাহ্ নামে একটি পুস্তক তিনি রচনা করেন। সুতরাং 'তুসীজ স্টাফ আস্তারলব'-এর নাম পরিচিতি নাসিরউদ্দীন তুসী নন, শরফউদ্দীন তুসীর নামানুসারেই হয়েছে।

বীজগণিতে শরফউদ্দীন তুসীর অবদান ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর মূল বীজগণিত গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু অজ্ঞাতনামা জনৈক বিজ্ঞানীর ভাষ্য থেকে এর অস্তিত্ব ও অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জ্যামিতি গ্রন্থটিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কতগুলো নির্দিষ্ট অবস্থায় একটি বর্গকে চার ভাগে ভাগ করার বিষয় সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনুল লুবিদি (১২১০—১২৬৭ খৃস্টাব্দ)

তিনি হিমসের সুলতান ইবরাহীমের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি তাঁর মন্ত্রীত্বে নিয়োজিত হন। ইবরাহীমের মৃত্যুর পর তিনি মিসরের শাসনকর্তার অধীনে আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। মিসর থেকে সিরিয়াতে এসেও এমনি উচ্চ স্তরের চাকুরীতে তিনি নিযুক্ত হন।

ইবনুল লুবিদি পেশায় চিকিৎসক হলেও অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। দুইটি বিজ্ঞান তালিকা প্রণয়ন ছাড়াও তিনি বহু বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করেন। অঙ্ক, বীজগণিত, ম্যাজিক স্কোয়ার, ইউক্লিড গ্রন্থ, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান তালিকা প্রভৃতি সম্বন্ধেও ৮টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কাশিমি (মৃত্যু ১৩৫০—৫১ খৃস্টাব্দ)

জ্যোতিবিজ্ঞানেই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। তাঁর রচিত দুটি বিজ্ঞান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এতে জ্যোতিবিজ্ঞানের তালিকাসমূহের দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর সহজ-সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি 'জিজ-ই-মুহাম্মদ……' নামে জ্যোতিবিজ্ঞানের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন।

www.pathagar.com

নাসিরউদ্দীন তুসী (১২০১—১২৭৪ খৃস্টাব্দ)

তাঁর প্রতিভার সুখ্যাতির জন্য সমসাময়িক সকল শাসকই তাঁকে তাঁদের রাজদরবারে পেতে চাইতেন। এজন্য তাঁর প্রতি বল প্রয়োগও করা হয়। কুহিস্থানের গভর্নর আবূ মনসুর তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে আলামুতে প্রেরণ করেন।

মঙ্গোল দলপতি মাঙ্গো খান হালাকু খানকে পারস্য আক্রমণের আশংকা বুঝেই আলামুতের শাসনকর্তা রুকনউদ্দীন কুরশাহ্ তুসীর পরামর্শে হালাকু খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

বাগদাদ দখলের পূর্বে তুসীর জ্যোতিষী গণনায় হালাকু এত মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজেই অগ্রসর হতেন না। এই প্রভাবের ফলেই তুসীকে হালাকু খান মন্ত্রীত্ব দান করেন। পক্ষান্তরে ১২৫৮ খৃস্টাব্দে হালাকুর বাগদাদ দখলের সময় পাইকারীভাবে বর্বর নরহত্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রন্থ সহ বাগদাদ নগরীর পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞের সময় নাসিরউদ্দীন তুসী যদি হালাকুর মন্ত্রী পদে থেকেও থাকেন, তবে আমাদের মনে করতে হবে যে, এ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত-বহির্ভূত ব্যাপার।

১২৫৯ খৃস্টাব্দে তিনি হালাকু খানের সঙ্গে মারাঘায় আসেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

তুসীই মারাঘার মানমন্দিরের পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চীন থেকেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে মারাঘায় আনয়ন করা হয়। তাঁদের একজনের নাম ফাও-মন-জী। চীনের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যে মুসলিম বিজ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, এই সব চীনা বৈজ্ঞানিকের প্রভাবই হয়ত তার মূল কারণ। তুসী নিজেও ফাও-এর নিকট কৌণিক জ্যোতিবিজ্ঞান ও পঞ্জিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। মারাঘার লাইব্রেরীতে ছিল খলীফা মামুনের 'বায়তুল হিকমা' এবং কায়রোর খলীফা হাকিমের 'দারুল হিকমার' লুণ্ঠিত বই-পুস্তক। এ ছাড়াও অন্যান্যভাবে সংগৃহীত বই-পুস্তক মিলে এই লাইব্রেরীর পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষাধিক।

মারাঘার মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি বাগদাদ ও কায়রোর লুণ্ঠিত যন্ত্রপাতি। এই উন্নত যন্ত্রপাতির একটি তালিকা বৈজ্ঞানিক উরদীর

www.pathagar.com

গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। এই যন্ত্রপাতির মধ্যে তুসী স্বয়ং একটি মূল্যবান যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

তিনি উচ্চস্তরের আরবী, ফারসী ও গ্রীক ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, সঙ্গীত, ভূগোল, চিকিৎসা, ন্যায়-শাস্ত্র, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েই আলোচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর ৬৮টি গ্রন্থ এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর রচিত হয়েছিল।

ব্রকলম্যান তাঁর ৫৬টি এবং অধ্যাপক মারটন তাঁর ৬৪টি গ্রন্থের নাম পরিচয় উল্লেখ করেন।

হালাকু খান তুসীকে জ্যোতিবিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি 'জিজ' প্রস্তুত করতে আদেশ দেন। তার উত্তরে তুসী জানান—কমপক্ষে ৩০ বছর সময়ের কমে পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত তালিকা প্রস্তুত সম্ভব নয়। কারণ গ্রহ-উপগ্রহগুলোর এক সাবিক আবর্ত শেষ করতে ৩০ বছর সময় লাগে। শেষ পর্যন্ত হালাকু খানের সঙ্গে তুসী আপোস মীমাংসায় ৩০ বছরের স্থলে ১২ বছরের সময় নিয়ে জিজ প্রস্তুতের কার্যে ব্রতী হন।

তুসী যতদিন জীবিত ছিলেন. মারাঘার বিজ্ঞানচর্চার কার্যেই নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্ররা মারাঘার মানমন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাঁরা তা যোগ্যতা সহকারেই পরিচালনা করেন। তুসীর পুত্রদের পরে মারাঘার মানমন্দির বন্ধ হয়ে যায়।

উরদী

হিমসের সুলতান মনসুর ইবরাহীম জ্যোতিবিজ্ঞানের যন্ত্র প্রস্তুতের জন্য তাঁকে দামাস্কাসে ডেকে পাঠান। সেখানে তিনি যন্ত্র নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি ঠিকমতই প্রয়োগ করেন। এর ফলে আরব ও পারস্যে তাঁর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যই মারাঘার মানমন্দির প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই তাঁর ডাক পড়ে। তুসী সহকর্মী বন্ধুরূপে একটি গ্রন্থের ভূমিকায় তুসী তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। মানমন্দির সংস্কার ও তালিকা প্রণয়নে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

www.pathagar.com

তিনি বৈজ্ঞানিক কারখানাটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। যন্ত্রগুলো যে শুধু বিজ্ঞানসম্মত ছিল, তাই নয়। সে সবের সূক্ষ্ম কারুকার্যও ছিল বিস্ময়কর। মানমন্দিরের নির্মাণ ও ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করে তিনি একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতে ১১টি যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া আরো দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একটির নাম হলো 'রিসালা ফি আমালুল কোবা আল-কামিলা'। অন্য গ্রন্থটি হলো সূর্যের কেন্দ্র এবং apoge-র মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় সম্পর্কে। টলেমির জ্যোতি-বিজ্ঞান আলোচনা করে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং জ্যোতি-বিজ্ঞান তালিকা প্রস্তুত করেন।

উরদীর পুত্রদ্বয়

শামসউদ্দীন মারাঘার বৈজ্ঞানিকদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নাসিরউদ্দীনের পুত্র সদরউদ্দীন যখন মারাঘার মানমন্দিরের ডিরেক্টর, তখন তিনি সেখানে গবেষণা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আল-উরদী

তিনি পিতার মত যন্ত্রকুশলী ছিলেন এবং মানমন্দিরের জন্য একটি Celestial globe প্রস্তুত করেন। এটিতে দুটি পিতলের গোলক খণ্ড ছিল। এর মধ্যে ক্রান্তিবিন্দুসহ জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই অঙ্কিত ছিল।

মহিউদ্দীন আল-মাগরিবী

তিনি মারাঘার মানমন্দিরে তুসীর সহকর্মী ছিলেন এবং অনেকগুলো বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। স্পেনের আন্দালুসিয়া তাঁর জন্মস্থান।

শামস উদ্দীন সমরকন্দী

তিনি হালাকু খানের আমন্ত্রণে মারাঘার মানমন্দিরে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিজ্ঞানের উপর তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ

www.pathagar.com

রচনা করেন। এগুলো কয়েক ভাগে ভাগ করে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো ঃ

১. জ্যামিতি-ত্রিকোনমিতি ২. গ্রীক গ্রন্থগুলোর সংস্কার ভাষ্য ৩. Chronology ৪. জ্যোতিষ ৫. আস্তারলব।

আরবের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৬টি।

দ্বিতীয় শামসউদ্দীন সমরকন্দী

তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'রিসালা ফি আদাবুল বাহাস'। এছাড়াও তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উপর দুটি গ্রন্থ লেখেন। একটির নাম হলো 'কিতাবুল কাসতান'। অন্যটি হলো 'কিতাবু আইনুন-নজর বিল্ মনতেক'। তাঁর জ্যামিতি গ্রন্থের নাম হলো 'কিতাবু আশকালোতি তাসিস'। জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে ১২৭৬—৭৭ খৃস্টাব্দে তিনি যে বার্ষিক নক্ষত্র পঞ্জিকা তৈরী করেন তার নাম হলো। 'আমালি তাকবিনই কাওয়াকিবি সাবিতা।'

আবহারি (মৃত্যু ১২০৬ খৃস্টাব্দ)

তাঁর মোট ৮টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের উপর লেখা।

কাতিবি

মারাঘার বৈজ্ঞানিক কার্যালয়ের অন্যতম বৈজ্ঞানিক। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কিতাব আইনুল আওয়াহেদ ফিল মনতেক ওয়াল হিকমা'। এতে অঙ্কশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কাজবিনি (১২০০—১২৮৩ খৃস্টাব্দ)

তিনি ইরাকের ওয়াসিত এবং দিল্লীর কাযী ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি গ্রন্থের একটির নাম হলো 'আজায়েবোল মখলুকাত ওয়া গারায়েবুল মাওজুদাত'। এর প্রথম খন্ড গ্রহ, নক্ষত্র, ফেরেশতা

www.pathagar.com

সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে খনিজ দ্রব্য, লতা-পাতা, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি হলো ভূগোল সম্বন্ধে।

মামুনুর রশীদ

বোসোর মতে তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ। তিনি জ্যামিতি-বিজ্ঞানে বিখ্যাত ছিলেন। জ্যামিতির প্রতি তিনি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, জামার আস্তিনে তিনি কোন-না-কোন জ্যামিতিক চিত্র সব সময় অঙ্কন করে রাখতেন। তিনি ইউক্লিডের একটি ভাষ্য রচনা করেন।

ইবনুল ইয়াসিমিনি (মৃত্যু ১২০৩—৫ খৃস্টাব্দ)

তিনি মরক্কোর অধিবাসী। ভারত ছাড়া অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে কাব্য প্রীতি পৃথিবীর কোথাও ছিল না। কিন্তু ইয়াসিমিনি ছিলেন এ দিক দিয়ে ব্যতিক্রম। তিনি কবিতায় একখানি সুন্দর বীজগণিত রচনা করেন। সাধারণত নীরস বিজ্ঞান এবং সরস কাব্য—এ দুটো সংমিশ্রণ করলে দুটোই নিম্নমানের হয়ে যায়। সে হিসাবে তাঁর কাব্য বীজগণিত মৌলিকতায় তত উন্নত নয়। কিন্তু কাব্যের মধুর রস সৃষ্টি আকর্ষণে তাঁর কাব্য বীজগণিতটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। গণিতটির নাম 'আরজুজা'। এই 'আরজুজা' কাব্য তাঁকে পৃথিবীর প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমান আসন দান করেছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি এখনও বর্তমান আছে।

কায়সার ইবনে আবুল কাসেম (১১৭৮—১২৫১ খৃস্টাব্দ)

তিনি ছিলেন আইনশাস্ত্রজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ার। হামাহর সুলতান মুজাফফর তাকিউদ্দীন মাহমুদের (১২২৯—১২৪৪) অধীনে চাকরীতে নিযুক্ত হন। নৃপতির আদেশে তিনি একটি জলকল তৈয়ার করেন। এই যন্ত্রটি ছিল হামাহরের জাতীয় গৌরব।

ক্রুসেড বিজয়ী খৃস্টানগণ হামাহর বিজয় করে এই জলকলটি তুলে নিয়ে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত করে। এরই যান্ত্রিক আদর্শের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় ইউরোপে জলকলের ব্যাপকতা গড়ে উঠে। অন্তত

www.pathagar.com

মুসলমানদের যান্ত্রিক কলাকৌশলের দ্বারাই ইউরোপে যে হাতেখড়ি লাভ করেছিল এবং পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মস্তকোত্তলন করেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ··

১২২৫—২৬ খৃস্টাব্দে তিনি একটি Celestial globe প্রস্তুত করেন। ১৮০৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভোলগ্রিতে কার্ডিনাল বর্জিয়ার দরবারে এই গ্লোবটি রক্ষিত ছিল। বর্তমানে এটি নেপালের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ৪টি পায়ের উপর দুটি পিতলের গোলক অংশ, দিগন্ত এবং মাধ্যন্দিন বৃত্ত ইত্যাদি সংযোগে এটি প্রস্তুত করা হয়। একটি তালিকায় বৈজ্ঞানিকের নাম এবং গ্লোবের নির্মাণ তারিখ ৬২২ হিজরী উল্লেখ রয়েছে।

আল-হাসান মাররাকুশী

অঙ্কশাস্ত্র ও ভূগোলে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। জ্যোতি-বিজ্ঞানে তিনি বেশ কয়েকটা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম জাইবুত তামাম (Complementary Sine) এবং জাইবোফদলের (exceeding Sine) চিহ্নটি বিশেষভাবে প্রমাণ করেন। তিনি ore Sine তালিকাটিকে আল-খাওয়ারিজমের তালিকা বলে উল্লেখ করেন।

আবুল আব্বাস আহমদ (মৃত্যু ১২২৫ খৃস্টাব্দ)

তিনি গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন। দোয়া-কালাম তাবিজ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বহু বই ছিল। একদিকে তাঁর যেমন ছিল ইলমে তাসাউফের উপর লেখা পুস্তক, অন্যদিকে তেমনি ছিল অঙ্কশাস্ত্রের উপরেও লেখা গবেষণামূলক একাধিক পুস্তক। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো: 'শামসুল মাআরিফ ওয়া লতায়েফেলে আওয়ারিফ' 'কিতাবুল খাওয়াম', 'মিরুল হিকম' প্রভৃতি।

হামসার

তাঁর নাম হলো ইবনে আবদুল্লাহ্। হামসার অর্থ গণনাকারী। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবেই পৈতৃক নামের পরিবর্তে গণনাকারী

www.pathagar.com

বা অঙ্কবিদ (হামসার) নামেই তিনি সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত হয়ে পড়েন।

তাঁর রচিত বীজগণিত গ্রন্থগুলো জোসেফ বিন তিব্বন কর্তৃক ১২৭১ খৃস্টাব্দে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইবনুল বান্নার 'তালখিন' হামসার গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই প্রণীত।

বিতরুজী

কর্ডোভার উত্তরে পেড্রিক নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর 'কিতাবুল হাইয়া' গ্রন্থে টলেমির মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেন। তাঁর মূল বক্তব্য হলো এই—"প্রত্যেক গ্রহের মেরুই নিজের পথে ক্রান্তিবৃত্তের চারদিকে ঘোরে" বৈজ্ঞানিকের এই মতবাদ আরব বিজ্ঞান জগতে 'হরকাতুল লাওলাবি' নামে পরিচিত। 'কিতাবুল হাইয়া' গ্রন্থের মাধ্যমেই এই মতবাদ প্রচলিত হয়ে পড়ে এবং বিজ্ঞান জগতে তাঁর মতবাদ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থটি ল্যাটিন ও হিব্রুতে অনূদিত হয়ে যায়। হিব্রু অনুবাদে তাঁকে 'হা মারিশ' বা মতবাদ পরিবর্তক সম্মানে অভিহিত করা হয়। মাইকেল স্কট ১২১৭ খৃস্টাব্দে 'কিতাবুল হাইয়া' ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। ১২৫৯ খৃস্টাব্দে মোজেস বিন তিব্বন এটিকে হিব্রুতে অনুবাদ করেন। ১৫২৮—২৯ খৃস্টাব্দে কালোনিমন বিন ডেভিড হিব্রু থেকে পুনরায় এটি ল্যাটিনে অনুবাদ করেন।

ইবনে বিদার

তিনি স্পেনে মেডিনে জন্মগ্রহণ করেন। বীজগণিতের সারমর্ম 'ইখতিসার' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে দ্বিঘাত সমীকরণ, করণ, অনুপাতের আঙ্কিক থিওরী প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

ইবনুল কাতিব (মৃত্যু ১২৯১ খৃস্টাব্দ)

তিনি অঙ্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন। অঙ্ক, জ্যামিতি ও পরিমিতি সম্বন্ধে তাঁর দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ইবনুল শাতিব (১৩০৪—১৩৮০ খৃস্টাব্দ)

ত্রিকোনমিতি, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান সহ অঙ্কের প্রায় সব বিভাগেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু গৌরব যুগের স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকদের মত অবদান রাখার মত তাঁর কোন ভূমিকা পালনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র যখন নৈরাশ্যে হতাশায় অধঃপাতি, তখন তাঁর প্রতিভার শিখাটি ক্ষীণ হলেও চতুর্দিকে আলো ছড়িয়েছিল।

কুতুবউদ্দীন শিরাজী (১২৩৬—১৩১২ খৃস্টাব্দ)

তিনি ছিলেন চিকিৎসক এবং অভিজাত বংশের সন্তান। মারাঘার মানমন্দিরের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ যোগ দেওয়ার পর তিনি তুসীর প্রিয় শিষ্যে পরিণত হন। শিক্ষা সমাপনের পর তিনি জ্ঞানান্বেষণে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সফর করেন। অতঃপর পারস্যের ইলখান আহমদ (১২৮১—১২৮৫) এবং আরগুনের অধীনে কাষীর পদ লাভ করেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে ইলখান তাঁর সাবেক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁকে মামলুক সুলতান মনসুর সইফউদ্দীন কালাউম (১২৭৯—১২৯০)-এর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর বিজ্ঞান মতামতের সঙ্গে আরবের বহু বৈজ্ঞানিকই একমত ছিলেন না। তিনি সর্বমোট ২১টি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল-জাবমিনি (মৃত্যু ১৩৪৪ খৃস্টাব্দ)

তিনি কতগুলো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা জানা যায় না। তবে জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'আল মুলাখস ফিল হাইয়া' বইটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কাষী-জাদা রুমী, জুরজানী প্রমুখ-এর ভাষ্য রচনা করেন। রুডোলফ পুস্তকটির জার্মান অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'কিমাল কাওয়াকি ওয়াদান আফলিয়া'। 'কানুন' নামে তাঁর একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইবনে সিনার 'কানুন' গ্রন্থের কতকাংশ অবলম্বনে রচিত।

ইবনুল বান্না (১২৫৬—১৩২১ খৃস্টাব্দ)

তিনি মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। সাধারণ শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ফাস নগরে গমন করেন। সেখানে চিকিৎসা,

www.pathagar.com

অঙ্ক ও জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর চরিত্র ছিল উন্নত ধরনের। হাজিমীর নিকট আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেন। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই, বরং একাত্মতা আছে—ইবনুল বান্নার জীবনীই তার অন্যতম প্রমাণ। বীজগণিত, পরিমিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিভাগেই তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা সম্পর্কে কেউ বলেন ৫১টি এবং কেউ বলেন ৭৪টি। কিন্তু তাঁর প্রায় সকল গ্রন্থই যে অঙ্ক জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে রচিত, সে বিষয়ে একমত।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম হলো 'তালখিস ফি আসাল্লোন হিসাব'। অনেকের মতে এই গ্রন্থটি আল-হাসসার গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচিত। ভগ্নাংশের উন্নততর আলোচনা, পাশ্চাত্য প্রণালীতে ভারতীয় সংখ্যা ব্যবহার, বর্গ এবং ঘন সমষ্টি নয়, আট এবং সাত বাদ দেওয়ার পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর গ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে ভাষ্য প্রণয়ন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তাঁর ছাত্র ইবনে দাউদ, মিসরের ইবনুল মাজিদি, কালামদি আল-ইসাবিলি প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই গ্রন্থটির ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও এর ভাষ্য রচনা করেন।

www.pathagar.com

সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের জনক ইসলাম

সক্রেটিস খৃস্টপূর্ব (৪৬৯—৩৯৯) তদানীন্তন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের অভিশাপ থেকে মনুষ্যত্বকে পরিপূর্ণ উদ্ধারের জন্য নিজ হাতে বিষ পান করে প্রাণ দান করে সাহসিকতার ঐতিহাসিক নযীর স্থাপন করেন।

হয়ত এই দৃষ্টান্তই গণতন্ত্রের বুনিয়াদ স্থাপন করে। তাঁর স্বনামধন্য শিষ্যদের মতবাদ সমন্বয়ে মানুষের মৌলিক অবদানের স্বীকৃতির ভিত্তিতে তাদের স্বকীয়তা ও বিকাশ-বিবর্তনের জয়ধ্বজা আজো বিশ্বব্যাপী উড্ডীন হয়ে চলছে।

সক্রেটিস ৭০ বছর জীবিত ছিলেন। জন্মের ৮৫ বছর পরে এরিস্টটল (৩৮৪—৩২২ খৃস্টপূর্ব) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫ বছর পর্যন্ত সক্রেটিসের সান্নিধ্যে ছিলেন। সক্রেটিসের জন্মের ৪২ বছর পরে প্লেটো (৪২৭—৩৪৭ খৃস্টপূর্ব) জন্মগ্রহণ করেন। প্লেটো ২৮ বছর পর্যন্ত সক্রেটিসের সঙ্গ লাভে ধন্য হন। উভয় দার্শনিকই ছিলেন সক্রেটিসের প্রভাবে প্রভাবিত। সামন্তবাদ ও আভিজাত্যের স্তূপীকৃত আবর্জনা থেকে মনুষ্যত্বকে পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে সক্রেটিসকে রাষ্ট্র ও তথাকথিত ধর্মের তরফ থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সক্রেটিস নিজে ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন তবুও বুদ্ধিমান শত্রুপক্ষ তাঁকে ধর্মদ্রোহী রূপে চিত্রিত করার সুযোগ পান। তাঁর প্রাণদণ্ডের রায়ের মধ্যে ধর্মদ্রোহিতা ছিল অন্যতম অপরাধ।[১] তিনি ধর্মদ্রোহী হোন বা না হোন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মগুলোর উৎপীড়ন থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য স্বকীয় মুক্তির একটা পন্থা উদ্ভাবনের প্রয়াস আজীবন চালিয়ে গেছেন।

---

১. প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

খৃস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে মিসরীয় সভ্যতা হযরত মূসা (আ) র অভ্যুদয় এবং খৃস্টপূর্ব ৬১২ অব্দে ব্যাবিলোনিয়ান সভ্যতায় হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর অভ্যুদয় মানবিক বিবর্তনের উৎকৃষ্ট বিকাশ লাভ ঘটেছিল। সক্রেটিস সেই সুসভ্য মানবিক গুণকে স্বীকৃতি দেন নি। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নি ঠিকই। কিন্তু ঐশী আদর্শভিত্তিক সত্যকে উপেক্ষা করার ফলে মানব সভ্যতাকে একদিন ভাস্কর পরিণতির সম্মুখীন হতে বাধ্য—তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কারণ, তিনি পয়গম্বর ছিলেন না। মানুষ যত মহাজ্ঞানী হোন, কখনও তাঁরা ভ্রান্তির গণ্ডীর বাইরে যেতে পারেন না। এজন্য দার্শনিক মতবাদ যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন সে মতবাদ কখনও মানুষের জন্য অভ্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।

সক্রেটিসের অবর্তমানে তাঁর নিকট সান্নিধ্য ব্যক্তি প্লেটোর ধর্ম দর্শন কিছুটা মার্জিত রূপ ছিল। সক্রেটিসের ৮৫ বছর পরে জন্ম লাভ করে একটু দূরবর্তী শিষ্য এরিস্টটল নাস্তিকতার পথে একটু এগিয়ে গিয়ে মানুষকে বুদ্ধিমান জানোয়ারের মর্যাদায় স্থান দিলেন।

সক্রেটিস জন্মের ১২৮ বছর পরে এপিকিউরাস (৩৪১—২৭০ খৃস্ট-পূর্ব) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিরুদ্ধে পূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদের গুরু, প্রাচীন নাস্তিক দার্শনিক।

এপিকিউরাস জন্মের ২১৫৯ বছর পরে কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৪১ খৃস্টাব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এপিকিউরাসকে পূর্ণ সমর্থন করে থিসিস পেশ করেন।[১]

এরপর কার্ল মার্কস তাঁর আরো কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এপিকিউরাস আদর্শের (নাস্তিক) আন্দোলন শুরু করেন।

লেনিন বলছেন, 'হেগেল দর্শন থেকে এঁরা নাস্তিক ও বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেন।" ১. মানুষের আর্থিক মুক্তি ও বিপ্লবী প্রগতির নামে তাঁর এই আন্দোলনে সঙ্গী ছিলেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০—১৮৯৫) লুদভিগ ফয়েরবাখ, (১৮০৪—১৮৭২) ল্যুদভিগ কুগেল মান (১৮৩০—১৯০২) প্রমুখ। এঁরা সবাই জার্মান যুবক দার্শনিক। এর পরে এই নাস্তিক আদর্শের ধারায় এগিয়ে আসেন

১. ভ. ই লেনিন, ৫ পৃষ্ঠা, প্রগতি প্রকাশনা, মস্কো, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

আরেক নাস্তিক মনীষী। তাঁর নাম হলো ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০—১৯২৪)। তিনি রাশিয়াতে একটি সমাজতান্ত্রিক নাস্তিক রাষ্ট্র স্থাপন করেন।

তাহলে দেখা গেল, সক্রেটিসের ধর্মীয় বিরূপ সমালোচনার যুক্তি প্রক্রিয়াগুলোই প্লেটো-এরিস্টটলের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করে। এপিকিউরাস নাস্তিকতাবাদে পূর্ণ রূপ ধারণ করে। হয়ত এরই প্রক্রিয়ায় খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ইরানে মাজদকের মারফত যৌন নৈরাজ্যের প্লাবন বয়ে যায় এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় কার্ল মার্কস-লেনিনের বদৌলতে পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা পায়। যা মূলত একটি বিকৃত বিকলাঙ্গ অগণতান্ত্রিক পথভ্রষ্ট মতবাদ। এতে মানবতা ও মানবাত্মার মুক্তির পরিবর্তে সক্রেটিসের গ্রীক সম্রাটের চেয়েও কঠোর বন্ধন এবং গণতন্ত্রের পরিবর্তে রয়েছে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র। অর্থাৎ অগণতান্ত্রিক স্বপ্ন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম ক্ষমতাসীন জ্যাকুবিন ১৭৯১ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল সেটা স্বৈরাচারী বৈরী হত্যা ও নির্যাতনের হত্যার ভয়াবহ সন্ত্রাসতন্ত্র। তাতে গণতন্ত্রের কোন পাত্তা ছিল না। এর ফলে মানুষ নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানকে মেনে নেয়। ১৮০৪ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়ন নিজকে ফরাসী সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। কারণ, জ্যাকুবিনের পাইকারী নরহত্যার গণতন্ত্রের চেয়ে জনগণ নেপোলিয়নের রাজতন্ত্রকে বহু উন্নত ও নিরাপদ মনে করেছিল। যাহোক ফরাসী বিপ্লব গণতন্ত্রের জনক বলা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ফরাসী দেশে কোন দিন প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না বা পৃথিবীর কোথাও কোন ছিল না। গণতন্ত্রের এত বিশ্বব্যাপী আধুনিক প্রচারণা সমাজতন্ত্রের মতই অস্তিত্বহীন, অলীক কাহিনী মাত্র। 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্রের' প্রকৃত সংজ্ঞানুযায়ী এর অস্তিত্ব পৃথিবীর কোথাও কোন দিন ছিল না বা নেই।

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যা কিছু কল্যাণকর ও মঙ্গলময়, যা কিছু মানবিক কেবলমাত্র ইসলামের ইতিহাসেই এর কার্যকরী প্রতিফলন দেখা যায়। তাও খুলাফায়ে রাশেদীনের মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে।

ওই স্বল্প শাসনে সামন্তবাদ ও গণতন্ত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং বিশ্বের ইতিহাসে সেই অধ্যায়টি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

আরও কয়েকজন মুসলিম নৃপতি বিজ্ঞানী ও মনীষী

ভীষণ মরুভূমির তলদেশ দিয়ে যেমন শান্তির ফল্গুস্রোত বিনয় ঝির-ঝির করে বয়ে যায়, তেমনি দেখা যায় ভয়ঙ্কর নৃশংস মুসলিম নৃপতির মধ্যেও জ্ঞানের তৃষ্ণা ও সাধনার ধারা বহমান। এই যে চরিত্র বৈচিত্র্য, ইসলামের বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক গঠন প্রভাবই এর মূল কারণ।

উলুঘ বেগ (১৩৯৪—১৪৪৯ খৃস্টাব্দ)

তৈমুর লং একদিকে যেমন অসীম সাহসী, প্রচণ্ড শক্তিশালী রণ-কুশলী এবং দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তেমনি ছিলেন অন্যদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কিন্তু তারও আড়ালে ছিল তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহা। হালাকু খান ও তৈমুর লং প্রমুখ ছিলেন একই অদ্ভুত চরিত্রের লোক। তৈমুরের রাজ্যের রাজধানী সমরকন্দ ছিল জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ। বিজ্ঞান ও কাব্যের প্রতি ছিল তাঁর অদম্য আকর্ষণ। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বিদুষী ও বিদ্যুৎসাহী। তৈমুর তাঁর স্ত্রীর নামে 'বিবি খানম' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

তৈমুর লং-এর দৌহিত্র হলেন উলুঘ বেগ। তৈমুরের ছেলে এবং উলুঘ বেগের পিতার নাম হলো শাহরুখ মির্জা। তৈমুরের জ্ঞানস্পৃহা বংশানুক্রমিকভাবে উলুঘ বেগের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

উলুঘ যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, তৈমুর সেদিন মারদান দুর্গজয়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। মারদান দুর্গাধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করেছে। রক্তলোলুপ তৈমুরের নিকট আত্মসমর্পণ করলেও রেহাই পাওয়া

www.pathagar.com

যায় না। কোন্ সময় গলাকাটা শুরু হবে—এই আতঙ্কে সবাই নিশ্চুপ-নিশ্চল।

এর মধ্যে তৈমুর লং সংবাদ পেলেন—তাঁর নাতি জন্মগ্রহণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ পাষাণ কঠিন হৃদয় আবেগে তিনি উদ্বেল হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারদান দুর্গের অধিবাসীদের ক্ষমা করে দিলেন।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহরুখ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট শাহরুখ বিজ্ঞানী না হলেও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। বিজ্ঞানের চর্চায় ছিলেন অত্যুৎসাহী। উলুঘ বেগকে তিনি বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র ও আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদান করেন ; যুবরাজ উলুঘ বেগ তুর্কিস্তান ও ট্রান্স অক্সিয়ানার শাসনকর্তা থাকাকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থাকেন এবং বিজ্ঞানের নানা শাখায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় অন্যান্যদের প্রতি তাঁর উৎসাহ প্রদানেও তিনি পরাঙমুখ ছিলেন না।

পিতা শাহরুখের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজনৈতিক ইতিহাসের মত তাঁর বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসও সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সম্রাট উলুঘ বেগ জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোনমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

তিনি সহকর্মীদের নিয়ে রাতের পর রাত জাগ্রত থেকে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ফল নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তার নাম হলো 'জিজ-ই-জাদিদই-মুলতানি'। এতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে—১. বিভিন্ন গণনা ও বর্ষ, ২. সময় জ্ঞান, ৩ নক্ষত্রের গতিপথ, ৪. স্থির নক্ষত্রের অবস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তালিকাটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রই বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। Ulugh Beg's Table নামে এখনও তা বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

এতে পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন তথ্যফল সহ তাঁদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ফলাফলও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই জিজ প্রস্তুত কার্যে সালাউদ্দীন মুসা, মোল্লা আল-কুশজী,

www.pathagar.com

গিয়াসউদ্দীন জামশিদ, মঈনুদ্দীন কাশানী, কাজীজাদা রুমী প্রমুখ তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক গ্রীভস তালিকাটির প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে মিঃ হাইড-এর ল্যাটিন অনুবাদ করেন। ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে শার্প এই অনুবাদের অন্য একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৪৭—৫৩ খৃস্টাব্দে মিঃ মেডিলো এর উপক্রমণিকার অনুবাদ প্রকাশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জয়পুর রাজ্যের মহারাজ জয়সিংহ উলুঘ বেগ প্রণীত নক্ষত্র তালিকার অনুবাদ প্রকাশ করে রীতিমত গবেষণা শুরু করেন।

সম্রাট বৈজ্ঞানিক উলুঘ বেগের তালিকায় শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষবিজ্ঞান সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা 'আরবাই চেঙ্গিস' চেঙ্গিসের চার পুত্র গ্রন্থ প্রণয়নের মধ্যে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মিঃ মেডিলোর মতে উলুঘ বেগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচ্যের জ্যোতি-বিজ্ঞান চর্চাও শেষ হয়ে গিয়েছে।

ত্রিকোনমিতির সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট প্রভৃতি পূর্বাবিষ্কৃত বটে, কিন্তু সবগুলোই ছিল এলোমেলো—প্রক্ষিপ্ত। উলুঘ বেগই প্রথম বৈজ্ঞানিকদের সুবিধার জন্য সবগুলো সংগ্রহ করে তালিকাভুক্ত করেন। এর পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই তা করেন নি। এই তালিকায় তাঁর মৌলিক অবদান ছিল প্রচুর। তিনি অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেসব মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি অবস্থায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

প্রাচ্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ সম্রাট বৈজ্ঞানিককে অন্য কেউ নয়, তাঁর পুত্র আবদুল লতিফ স্বয়ং হত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির অকেজো হয়ে পড়ে।

আল-কাশী (মৃত্যু ১৪৩৬ খৃস্টাব্দ)

অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পূর্বে দশমিক ভগ্নাংশ কেউ ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর রচিত 'আর-রিসালাহ আল-মোহতিজি'

www.pathagar.com

গ্রন্থে সর্বপ্রথম দশমিক ভগ্নাংশে x-এর মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। তিনি ১৬শ সংখ্যা পর্যন্ত এর মূল্য নির্ধারণ করেছেন।

এই বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থের সংখ্যা জানা যায়। এ পর্যন্ত ৫টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবই অঙ্ক এবং বিজ্ঞান গ্রন্থ। এর মধ্যে একটি তালিকাও আছে। তাঁর নাম 'জিজ আল-মাকানী'।

আল-কুশজী (মৃত্যু ১৪৭৪ খৃস্টাব্দ)

উলুঘ বেগের জনৈক কর্মচারীর পুত্র। তবু সম্রাট উলুঘ বেগের সমান আসনে বসে তিনি বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত থেকেছেন। এরকম নজীর ইসলামের ইতিহাস থেকেই পাওয়া সহজতর।

উলুঘ বেগের গবেষণা কালেই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসাবে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সুখ্যাতি শুনে কিরমানের সুলতান আবু সাঈদ তাঁকে গুরগাঁও-এ আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁকে উচ্চ রাজ-পদে চাকরী দেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি 'তাজারিদুল কালাম' নামে নাসিরউদ্দীন তুসীর একটি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আবার তিনি সমরকন্দ ফিরে গিয়ে উলুঘ বেগের তালিকার অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন।

আরাকুনলুর সুলতান হাসান তাঁকে আমন্ত্রণ করে তাব্রিজে নিয়ে যান এবং তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের নিকট তাঁকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করেন।

তুরস্কের সুলতান বৈজ্ঞানিক কুশজীর গুণজ্ঞান শুনে পূর্ব থেকেই গুণমুগ্ধ ছিলেন। এখন হাতের কাছে পেয়ে তিনি তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞান সাধনার জন্য অনুরোধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কনস্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার নিতে অনুরোধ করেন। বৈজ্ঞানিক কুশজী তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দৌত্য কার্য সমাপন করে তিনি তুরস্কে ফিরে এসে আয়াসোফিয়ার অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হন। ওখানে অবস্থানকালেই তিনি আরবী ও ফারসী—উভয় ভাষাতেই কতগুলো বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

www.pathagar.com

ইবনুল মাজিদি (জন্ম ১৩৬৯ খৃস্টাব্দ)

জন্মস্থান মিসর। জ্যোতিবিজ্ঞান, ত্রিকোনমিতি, পঞ্জিকা, নানা প্রকার তালিকা প্রণয়নে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ত্রিকোন-মিতি ও জ্যোতিবিজ্ঞানে তাঁর অবদান সমধিক।

কালামাদি (১৪৮৬ খৃস্টাব্দ)

জন্মস্থান স্পেন। অঙ্কশাস্ত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'থিওরী অব নাম্বার' সম্বন্ধে তাঁর অবদানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ইবনে ইউনুস। তারপর এ নিয়ে যা আলোচনা হয়, তা গতানুগতিক ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কালামাদিই এই বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন।

শুধু তাই নয়, বীজগণিতে প্রথম চিহ্নাদি ছাড়া, পরে সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা আলোচিত হতো। পাশ্চাত্যের অন্যান্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকের মত কালামাদি বীজগণিতে শুধু চিহ্নাদির ব্যবহারে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনে বিজ্ঞান সাধনার স্তিমিতা-বস্থায় কালামাদির বিজ্ঞান প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত ও গৌরবোজ্জ্বল করে রেখেছে।

মুহম্মদ ইবনে মারুফ (১৫২৫ – ১৫৮৫ খৃস্টাব্দ)

তিনি তুরস্কের অধিবাসী। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে মুরদের পতনের পর মুসলিম বিশ্ব দ্রুত অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। তখন তুরস্ক ও ভারতের বুকে চলছিল মুসলমানদের জয়যাত্রা। ভারতে স্থাপত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কীর্তিকলাপ যা ই থাক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না। তুরস্কের চতুষ্পার্শ্বে মিসর, বাগদাদ, স্পেন, পাশ্চাত্য প্রভৃতি স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্যুদয় মুহাম্মদ ইবনে মারুফকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তিনিই তুরস্কের নব-জাগরণকে বিজ্ঞানের মৌলিক অবদান দ্বারা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করেন। অঙ্কশাস্ত্রের সকল শাখাতেই তাঁর কৃতিত্ব ছিল। তবে বীজ গণিত, অঙ্ক ও জ্যোতিবিজ্ঞানেই তাঁর কৃতিত্বের পরিমাণ অধিক।

www.pathagar.com

বাহাউদ্দীন (১৫৪৭—১৬২২ খৃস্টাব্দ)

তিনি পারস্যের অধিবাসী। প্রাচ্যের বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে শেষ ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে। তাঁর সম্বন্ধে আমরা তেমন কিছু জানতে না পারলেও তাঁর গ্রন্থ রচনার সংখ্যাই তাঁর প্রতিভার প্রমাণ বহন করে। তাঁর বেশীর ভাগ গ্রন্থই রচিত হয়েছে অঙ্কশাস্ত্রের উপর। 'খুলাসাতুল হিসাব' তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কলিকাতা, বার্লিন, ও রোমে এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ হয়। পারসী ভাষাতেও এটি অনূদিত হয়। তাঁর অন্য গ্রন্থটির নাম 'বহরুল হিসাব'। গ্রন্থটি অসমাপ্ত। কিন্তু গ্রন্থটি যে উচ্চস্তরের মৌলিক উপাদান ও অবদানে সমৃদ্ধ ছিল, রচনা থেকেই তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুস্তকটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি মারা যান। তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাশাকুল'। এতে তিনি জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভারতের মুসলিম বাদশাহগণ সাহিত্য, কাব্য, দর্শন প্রভৃতির পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছেন এবং অনেকেই এ সবের সাধনায় ছিলেন বিখ্যাত ও অনুরাগী। কিন্তু হুমায়ুন ও শাহজাহান ছাড়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যদের সাধনা ও গবেষণার তেমন কোন অবদান ছিল না।

বাবর তাঁর আত্মজীবনী লেখার দ্বারাই যে কেবল অমর সাহিত্যিক ছিলেন, তাই নয়, স্বভাবতই তিনি রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই গভীর সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন। রাজকীয় লাইব্রেরী বাদেও তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী ছিল।

শেরশাহ্ দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। আকবর অশিক্ষিত হলেও বিদ্যুৎসাহী ছিলেন সবার ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর পণ্ডিতমণ্ডলীর মারফত বৈজ্ঞানিক ভাস্করের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'লীলাবতী' অনুবাদ করান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'জিজ-ই-উলুঘ বেগ' আরবী থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করান। 'আইন-ই-আকবরী' বৃহত্তম গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। 'আইন-ই-আকবরী'র ২৫নং আইনে অঙ্ক, আঙ্কিক চিহ্ন, কৃষিবিদ্যা, পরিমিতি, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, Physiognomy, গার্হস্থ্যবিদ্যা, রাজ্য শাসন, আইন, চিকিৎসা, ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস এবং তাবিই, রিয়াজিই ও ইলাহী বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ইলাহী বিজ্ঞান, ধর্ম শাস্ত্র

www.pathagar.com

সংক্রান্ত। রিয়াজি বিজ্ঞান অঙ্ক, জ্যোতিবিজ্ঞান, সঙ্গীত এবং মেকানিকস সম্পর্কিত। তাবিই বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্যানুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি গ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রহের জন্য ছিলেন সবিশেষ আগ্রহী। সে যুগে তিনি একটি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য তিন হাজার মোহর বা ১০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করতেও দ্বিধা করতেন না। উল্লেখযোগ্য যে, আল-মামুন একটা পাণ্ডুলিপির সমওজনের স্বর্ণমুদ্রা দিতেন। সুলতান মাসউদ 'কানুনে মাসুমী' নামক একটি মাত্র গ্রন্থের জন্য একটি রাজ-হস্তীর সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য দান করেছিলেন। সুলতান কাবুস ইবনে সিনাকে তাঁর রাজ্যের অর্ধেক দান করতে চেয়েছিলেন। শুধু জ্ঞান গবেষণার জন্য মামুন ৬ বছর পর্যন্ত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য শাসন থেকে দূরে সরেছিলেন।

আওরঙ্গজেব তাঁর ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জনগণকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা খুবই কার্য-কর করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা এ শিক্ষার গতি তেমন প্রবল ছিল না।

হুমায়ুন পূর্ব হতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে ১৫ বছর পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ নির্বাস জীবন যাপন করেন। তখন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইলিয়াস আর্দবেলী এবং আবুল কাসিম গিরজানীর নিকট জ্যোতিবিজ্ঞান শিক্ষালাভ করেন। এই সময় কুতুবউদ্দীন শিরাজীর বিশ্বকোষ 'দুররাতোত তাজ' তাঁর বিশেষ পাঠ্য ছিল। সে যুগে জ্যোতিবিজ্ঞান জ্যোতিষ এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অঙ্কের বিভিন্ন বিভাগেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

হুমায়ুনের রাজকার্য ছিল জ্যোতিবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী। দর-বারের সমস্ত কাজ জ্যোতিষীর মতানুসারে সময় বিভাগ করে পরিচালিত হতো।

তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান চর্চার জন্য কয়েক স্থানে কয়েকটি মানমন্দির তৈয়ার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে কতগুলো যন্ত্র তৈরী করেন। আস্তারলব তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি অনেক সময় অন্যান্য

www.pathagar.com

বিদ্যার্থী জ্যোতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। জায়গীরদার মোল্লা নূরুদ্দীন তুরখান জ্যোতিবিজ্ঞানে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ও বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুও তাঁর বিজ্ঞান-প্রীতির সঙ্গে জড়িত। কোন এক রাতে শুক্রগ্রহ পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হতে পারে—এ ছিল বাদশাহ এবং তাঁর সহকর্মী জ্যোতির্বিদদের ধারণা। সন্ধ্যার পূর্ব হতেই তিনি তাঁর সহকর্মী জ্যোতিবিদদের নিয়ে রাজবাড়ীর সর্বোচ্চ তলার বুরুজে প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরে সদলবলে অবস্থান গ্রহণ করে আযান ধ্বনিতে ত্রস্ততার সঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞান চিন্তায় নিমগ্ন ও অন্যমনস্ক বিজ্ঞানী বাদশাহ হঠাৎ হতচকিত হয়ে নামাযের জন্য দ্রুত নীচের দিকে সিঁড়ি বেয়ে অবতণের সময় পদস্খলিত হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। এই আহত অবস্থায় থেকেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁর সময় থেকেই ভারতে আস্তারলব যন্ত্র প্রস্তুত পর্যবেক্ষণের জন্য হুমায়ুন নিজে একটি নতুন ধরনের আস্তারলব আবিষ্কার করেন। এটি আস্তারলবী হুমায়ুনী বা হুমায়ুনের আস্তারলব নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

মাওলানা মকসুদ হিরারী 'আইনে আকবরী'র মতে মকসুদ হিরারী ছিলেন হুমায়ুনের ভক্ত শিষ্য। তিনি এমন সুন্দর আস্তারলব ও গ্লোব তৈয়ার করতেন যে, সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারতেন না।

শেখ আল্লাদাদ তখনকার শ্রেষ্ঠ যন্ত্রকুশলী ছিলেন। শুধু তাই নয়। তাঁর পরবর্তী চার পুরুষের সবাই বিজ্ঞানের এই শাখায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শেখ আল্লাদাদ, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ঈসা, পৌত্র মুহাম্মদ বায়রাম, প্রপৌত্র জিয়াউদ্দীন—সবাই ছিলেন যন্ত্রকুশলী। এদেঁর যন্ত্র কুশলতা জ্যোতিবিজ্ঞান কেন্দ্রিক ছিল বলে মনে হয়। কারণ ওরা আস্তারলব প্রস্তুতে সুদক্ষ ছিলেন। এই আস্তারলবগুলো হুমায়ুনী আস্তারলবের নমুনা অনুযায়ী তৈরী হতো। এই বংশের ১২টি আস্তারলব পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে বার্লিনে ১টি ও লণ্ডনে রয়েছে ১টি। অবশিষ্টগুলো ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

শাহজাহান মারাঘার মানমন্দিরের পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে আনয়নের জন্য মুল্লা মুহাম্মদকে মারাঘায় প্রেরণ করেছিলেন এবং সংগৃহীত সব তথ্য দিল্লীতে এসে পৌঁছেছিল। ইচ্ছা ছিল মারাঘায় অনুরূপ একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা। মুসলিম ভারতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। কিন্তু তাজমহল নির্মাণ ও বিজ্ঞান চর্চা দুটো পরিকল্পনার অর্থ ব্যয় একসাথে সম্ভব নয় বিবেচনা করে তাজমহল তৈরীকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্বিতীয় বিজ্ঞান পরিকল্পনাটি মুলতবী রাখা হয়। অবশেষে এটি চিরতরেই মুলতবী হয়ে যায়।

মোল্লা ফরিদ ইবরাহীম শাহজাহানের বৈজ্ঞানিক সহচর, গণিতবিদ এবং রাজজ্যোতিষ ছিলেন। 'জিজ-ই-শাহজাহানী' নামে তিনি একটি বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

আহমদ নাদির (মৃত্যু ১৩৫৯ হিজরী)। তাজমহলের ইঞ্জিনিয়ার এবং গণিতবিদ ছিলেন। তাঁর পুত্র লুৎফুল্লাহর লিখিত একটি গ্রন্থে তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়। মোল্লা ফরিদ ইবরাহীমও তাঁর 'জিজ' গ্রন্থ প্রণয়নে আহমদ নাদিরের নিকট হতে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন।

আতাউল্লাহ শেখ আল্লাদাদের বংশধরগণ যেমন বংশানুক্রমিকভাবে আস্তারলব নির্মাণের ক্ষেত্রে সুনিপুণ কারিগর ছিলেন, তেমনি তাজমহল নির্মাণের চীফ ইঞ্জিনিয়ার আহমদ নাদিরের পুত্রগণও ছিলেন সেরা ইঞ্জিনিয়ার। নাদিরের পুত্র আতাউল্লাহ রুশদী লুৎফুল্লাহ এবং নূরুল্লাহ্ বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের মত গণিত বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন।

আতাউল্লাহ্ সম্রাট শাহজাহানের দরবারের সভাসদ ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একটির নাম 'পাঞ্জগণিত' (এলজাবরা), অন্যটির নাম 'খুলাসহীরাজ' (অঙ্কের সারমর্ম)। প্রথম গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি হায়দ্রাবাদের মাইদিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

লুৎফুল্লাহ জ্যোতিবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের উপর তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত

www.pathagar.com

গ্রন্থ হলো 'খুলাসাতুল হিসাব'। এটি বাহাউদ্দীন আমলির অঙ্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষ্য। তাঁর অন্য গ্রন্থের নাম হলো 'খুলাসায়ে মুনতাসহিব'। 'রিসালাই খাওয়ামি আদাদ'—ইবনে সিনার একটি গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবদুর রহমানের 'সুয়ারী সুফী গ্রন্থেরও তিনি ফারসী অনুবাদ করেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁর রচিত 'আসমানি সুমান' ও 'সিহরী হালাল' দুটি কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এ দুটো গ্রন্থ শূন্যবর্জিত অক্ষর দিয়ে রচনা করা হয়।

মৌলানা ইমানউদ্দীন লুৎফুল্লাহর পুত্র। তাঁকে সাধারণত 'ইমানুর রিয়াজি' অঙ্কশাস্ত্রের নায়ক নামে অভিহিত করা হতো। তিনি কবি ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর উপদেশে তাঁর একজন ছাত্র আল-মাজেস্টের একটি ভাষ্য রচনা করেন।

খয়ের উল্লাহ্ লুৎফুল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুদক্ষ ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য পিতার মত তাঁকেও ভগ্নাংশসূচক 'মোহান্দিস' নামে অভিহিত করা হতো। বৃন্দাবন ঘুসগো প্রণীত 'মফিনাহি ঘুসগো' গ্রন্থে বলা হয় খয়েরউল্লাহ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মুহাম্মদ আলী খয়েরউল্লাহর একমাত্র পুত্র। তাঁকে 'রিয়াজি' (গণিতবিদ) নামে অভিহিত করা হতো। তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'তাকরিরুত তাহরির' পুনরায় সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, তিনিও অঙ্কশাস্ত্রের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

www.pathagar.com

মুসলিম রসায়ন বিজ্ঞান

খৃস্টজন্মের কয়েক শত বছর পূর্ব থেকে গ্রীক সভ্যতা বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদান দিয়ে যে বিশ্বসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে, একথা সর্বজনস্বীকৃত। বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, নাটক, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানদানে গ্রীকরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। খৃস্টজন্মের পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে মানব ইতিহাসের যেদিকেই তাকানো যাক, সর্বত্রই গ্রীক মনীষীদের অবদানের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

খৃস্টজন্মের পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে রোমান সভ্যতার অবদান গ্রীক সভ্যতার তুলনায় অনেক কম। এভাবে জ্ঞানের প্রদীপটি মিটমিট করে জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গিয়ে পুরাপুরিভাবে নিভে যায়।

এরপর ১৪৯২ খৃস্টাব্দের পর থেকে চলল আধুনিক সভ্যতার জয়যাত্রা। বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বিমান, রেল ইঞ্জিন, ইলেকট্রন, বিস্ফোরক, এ্যাটম বোমা প্রভৃতি আবিষ্কারের পর মানব সভ্যতা ক্রমান্বয়ে চাঁদে গিয়ে পৌঁছল।

কিন্তু প্রায় সব আবিষ্কারের কেন্দ্রস্থল হলো ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী। ১৮শ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে যান, আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের পরিমাণ কমতে থাকবে। ১৭শ, ১৬শ, ১৫শ ও ১৪শ শতাব্দীগুলোতে গিয়ে দেখুন—আবিষ্কারের পরিমাণ এত কম যে, উল্লেখ করার মত তেমন কিছুই মেলে না। দ্বাদশ শতাব্দীতে আধুনিক সভ্যতার জনক ইউরোপ আবিষ্কারের দিক দিয়ে একেবারেই শূন্য।

একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, তৈল না থাকলে কখনও প্রদীপ জ্বলে না। আধুনিক পাশ্চাত্যের আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত যে বিকীর্ণ আলোকমালা, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা যে একেবারে তৈলশূন্য ছিল—এটা

www.pathagar.com

এক ঐতিহাসিক সত্য। এখানেই প্রশ্ন—তৈলবিহীন এই পাশ্চাত্য সভ্যতা কিভাবে আধুনিক যুগে এসে সহসাই এ তথ্য প্রদীপ হলো, দীপ্তিমান হতে পারল ? আমরাও ত দেখি ১২৮৫ খৃস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ও স্পিনা চশমা আবিষ্কার করেন। ১২৭৫—১৩২১ খৃস্টাব্দে ইটালীতে মহাকবি দান্তের আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন বিষয়ে আবিষ্কারক রোজার বেকন ১২১৪—১২৯৫ খৃস্টাব্দে আবির্ভূত হন। এসবই তো ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনা। দ্বাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও আবিষ্কারের বাতি প্রায় নির্বাপিতই ছিল। ইটালীর সনেট রচয়িতা কবি ফ্রান্সিসকো পেটরার্ক (৩০৪—৩৭৪) এই সভ্যতার আওতায় পড়েন না। তিনি রোমান সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত কবি ছিলেন। মহাকবি চসারকে (১৩৪০—১৪০০ তাও তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর কবি) কাব্যের স্বপ্নরাজ্য আমরা যৎকিঞ্চিত বিচরণশীল দেখতে পাই। সে যুগে সেটা ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে কতটুকু পিছনে ছিল এবং আরব সভ্যতা ইউরোপের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা তাঁর লেখাতেই ফুটে উঠে। রসায়ন বিজ্ঞানের দুর্গন্ধময় দ্রবণ পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাজ হতে পারে না বলে চসার ঘৃণা প্রকাশ করে গেছেন। পায়খানা-প্রস্রাব থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক কুৎসিৎ কদর্য পদার্থ নিয়ে যারা চর্চা গবেষণা করেন, তাঁরা অবশ্যই ঘৃণিত ব্যক্তি অর্থাৎ তৎকালীন অন্ধকার ইউরোপের শিরোমণি গ্রেটবৃটেনের দাম্ভিক, নৃশংস ও বর্বর অভিজাত শ্রেণীর জ্ঞানবিজ্ঞান-বিমুখ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনগ্রসরতার জ্বলন্ত প্রমাণই ফুটে উঠেছে চসারের এইসব লেখায়। চসারের কবিতায় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, আরবদের চিকিৎসাবিজ্ঞান বৃটেনে এমন অনুকরণীয় প্রভাবে পরিচিত হয়েছে যে, বৃটেন তার নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। চসার আক্ষেপ পর্যন্ত করেছেন। অর্থাৎ ইবনে সিনার 'কানুন' তখন বৃটেনের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বৃটেন যেভাবে আঁকড়ে ধরছে, ইসলামী সভ্যতার সেই সর্বগ্রাসী এভাবেই ছিল চসারের আতঙ্কের মূল কারণ। কিন্তু শুধু বৃটেন নয়, সমগ্র ইউরোপই তখন মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপ্লাবিত হয়ে উঠছিল, সেই মৌলিক সত্যই চসারের লেখায় প্রমাণিত হয়ে যায়।

সুরম্য হর্ম্য যেমন ভিত্তিহীন শূন্যের উপর গড়ে উঠে না, তেমনি কোন সভ্যতাও বুনিয়াদ ছাড়া শুধু শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

সুতরাং এটা শুধু আমাদের অভিমত নয় বরং ইতিহাসেরই নিরপেক্ষ রায় যে, মুসলিম সভ্যতার পোথিত বুনিয়াদের উপরই উঠেছে আজকের আধুনিক সভ্যতা প্রকৃত পক্ষে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে গোটা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সাড়ে ৫শ বছর মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগকে ইউরোপ 'অন্ধকার যুগ' বলে ধামাচাপা দেবার ফলেই আধুনিক সভ্যতার এই বুনিয়াদ এভাবে শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়।

আমরা শুধু এই শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যেই মুসলিম সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারা বিবরণী যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপ সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করতে থাকে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পরবর্তী শতাধিক শতাব্দীর উর্ধ্বকাল পর্যন্ত ইউরোপের এই প্রয়াস থাকে অব্যাহতভাবে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা।

মুসলিম সভ্যতা যখন পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছু আবিষ্কার অবদান দিয়ে উদ্ভাসিত করছিল, তখন এই বিস্ময়কর আবিষ্কার পূর্ববর্তী সভ্যতাকেও ম্লান করে দিয়েছিল। বর্তমান সভ্যতার এতসব আবিষ্কার সমুজ্জ্বল অবদানের পূর্ববর্তী মুসলিম সভ্যতা ম্লান হয়ে গেছে। এতে বৈচিত্র্যের কিছু নেই। আরো উন্নত অনাগত কোন ভবিষ্যৎ সভ্যতার নিকটেও সভ্যতা যে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে না, তা কে বলতে পারে? এই ভাবেই বিশ্বসভ্যতা এগিয়ে যায় এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু অতীত কোন সভ্যতার কাছে আধুনিক কোন সভ্যতার সবকিছু শিখবার থাকলেও কোন আধুনিক সভ্যতার পক্ষেই অতীতের সব শিখে ফেলা সম্ভব হয় না। যা শেখা হয় না বলে অবশিষ্ট থাকে, তা-ই-পৃথিবীতে সপ্ত আশ্চর্য বা ছত্রিশ আশ্চর্য নাম অভিহিত। মিসরের মমি প্রস্তুত প্রণালী, তাজমহল, ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, অতীত সভ্যতার এমনি অবশিষ্টাংশ, এমন কি মুগল আমলের কৃত্রিম ফোয়ারাগুলো শত শত বর্ষব্যাপী দিনরাত একটানা কি চলছে। এসব সৃষ্টির আশ্চর্য কলাকৌশল আবিষ্কারে আধুনিক বিজ্ঞান এখনো সমর্থ হয়নি।

মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। অন্ততঃ জাবির ইবনে হাইয়ান কেবল

www.pathagar.com

স্বর্ণ নয়, 'পরশমণি' পর্যন্ত প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে, মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ হযরত আলী (রা) থেকেই স্বর্ণ প্রস্তুতের এই সূত্রটি পেয়েছিলেন। হযরত আলী (রা) বলেছিলেন, "যদি পারদ ও অভ্রকে বজ্র সদৃশ (আগুনের) বস্তুর সঙ্গে সংশ্লেষণ করা যায়, তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হওয়া যেতে পারে।" এটি স্বর্ণ প্রস্তুতেরই ইঙ্গিসূচক অভিমত। খুব কম কথা হলেও এটি বিশ্ববিজ্ঞানের একটি বিশেষ মূল সূত্র।

প্রথমেই খলীফা খালিদ বিন ইয়াযিদ এই মূল সূত্রটিকে কেন্দ্র করে রাজ্য নেশা ছেড়ে দিয়ে আজীবন বিজ্ঞান সাধনা চালিয়ে যান। এ সম্বন্ধে পূর্বেও কিছু আলোচনা হয়েছে। এখনও বলতে হয়।

৭০৪ খৃস্টাব্দে এই খলীফা বিজ্ঞানী খালিদ মারা যান। মিঃ হোম ইয়ার্ডের মতে জাবির ইবনে হাইয়ান ৭৩০—৩৫ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করেন। সুতরাং তাঁকে বৈজ্ঞানিক খালিদের শিষ্য মনে করা সঠিক নয়। তবে বৈজ্ঞানিক খালিদের কোন শিষ্যের নিকট কিংবা অন্য যে কোন সূত্রে হাইয়ান তাঁর বিজ্ঞান সাধনা যে হুবহু অনুসরণ করতে পেরেছিলেন একথা প্রকৃতই সত্য। হযরত আলী (রা)-র সঙ্গে খালিদ বংশের রাজ্য বিরোধ থাকলেই যে তাঁর সঙ্গে খালিদের বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেও বিরোধ থাকবে—একথা অর্থহীন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হওয়ার ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-র স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর উপরই খালিদ প্রথম বিজ্ঞান সাধনা শুরু করেন। তিনি এই সাধনায় কৃতকার্য হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে দেখা যায়। খালিদও পরশ পাথর পর্যন্ত প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্যে গ্রীকদের বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো সর্বপ্রথম অনুবাদ কার্যে তিনি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। হয়ত গ্রীকদের পদার্থ বিজ্ঞানকে তিনিই রসায়ন বিজ্ঞানে টেনে আনেন।

কিন্তু নিছক অনুমান নয় বরং জাবির ইবনে হাইয়ানের ক্ষেত্রে এতদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রমাণ এত স্পষ্ট যে, আধুনিক বিজ্ঞান জগতে আজ তাকে রসায়ন বিজ্ঞানের জনক বলে মেনে নিতে আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

জাবিরের মূলনীতিই ছিল—কোন সিদ্ধান্তই পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুদ্ধ ফল না পাওয়া পর্যন্ত গ্রহণ ও প্রকাশ না করা। এজন্য তাঁর কোন অভিমতকে

www.pathagar.com

বেশীও মনে করা যাবে না, কমও মনে করা যাবে না। যা আছে তাই মনে করতে হবে। এই ছিল শিষ্যদের প্রতি তাঁর নির্দেশ। তাঁর সম্বন্ধে এখানে আরো একটু পরিষ্কার করেই বলতে হয়।

জাবির ইবনে হাইয়ান (৭৩৫—৮১৫ খৃস্টাব্দ)

জাবিরের পিতার নাম হাইয়ান। তিনি কুফার অধিবাসী এবং গোড়া শিয়াপন্থী ছিলেন। স্বভাবতই তিনি উমাইয়াদের ঘৃণা করতেন। তিনি পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। পারস্যে কয়েকটি প্রভাবশালী গোত্রকে আয়ত্তে আনার জন্য আব্বাসীয়গণ হাইয়ানকে গোপনে দৌত্য কর্মে প্রেরণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পারস্যের তুস নগরে বসতি স্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, এই তুস নগরেই জন্মেছিলেন জাবির ইবনে হাইয়ান।

হাইয়ানের গুপ্তচরবৃত্তির কথা উমাইয়া খলীফার কর্ণগোচর হয় এবং হাইয়ান ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর হাইয়ান পরিবার দক্ষিণ আরবে চলে যান এবং সেইখানেই হাইয়ানের পুত্র জাবির গণিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক খালিদ তাঁর প্রত্যক্ষ গুরু না হলেও জ্ঞান-গুরু ও বিজ্ঞান সাধনার অগ্রপথিক ছিলেন। উমাই-য়াদের প্রতি তিনি পিতৃহত্যা বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে থাকার কারণ, উমাইয়া খালিদকেও সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তাছাড়া বিশেষভাবে নির্দোষ এবং মহাজ্ঞানী খালিদকে নয়, তাঁর বিজ্ঞান-গৃহকে ভালবাসতে মহাজ্ঞানী জাবিরের মনে কোন প্রশ্নই দেখা দেয়নি।

জাবির ইবনে হাইয়ান ইমাম জাফর সাদিক (৬৯৯—৭৬৫)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় জাবিরের অদ্ভুত বিজ্ঞান প্রতিভাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে উল্লিখিত খলীফা হারুন-অর-রশীদের সবচেয়ে জ্ঞানী, বিশ্বস্ত ও বিপুল জনপ্রিয় বারমাক বংশীয় মন্ত্রী ইয়াহিয়া খালিদের সঙ্গে জাবিরকে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি পিতার মত সুদক্ষ চিকিৎক ছিলেন। অন্যান্য রাজকীয় চিকিৎসক ব্যর্থতা বরণের পর ইয়াহিয়ার জনৈক সুন্দরী বাঁদীকে তিনি চমৎকার চিকিৎসা দ্বারা কঠিন রোগ থেকে দ্রুত মুক্ত করে সুস্থ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে দেওয়ায় ইয়াহিয়া খুবই খুশী হয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

বারমাকী বংশ নিজেরাই পণ্ডিত বংশ ছিলেন। কাজেই সত্য সত্যই মহাজ্ঞানী না হলে তাঁরা সহজে মাথা নত করার পাত্র ছিলেন না। অচিরেই ইয়াহিয়া এবং তাঁর জ্ঞানী পুত্র রসায়ন বিদ্যা শিখবার জন্য জাবিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

হয়ত তিনি স্বর্ণ তৈরী করতে পারতেন। স্বর্ণ তৈয়ারের সহজ পন্থা হিসাবে তাঁর ভাষায় "বৈজ্ঞানিক সাধনার ধন" পরশ পাথরও তৈয়ার করেছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক কথাই পরীক্ষা না করে বলেন না, তিনি ব্যাখ্যা করছেন, পরশ পাথর পাথরের পাত্রে ও স্বর্ণপাত্রে রাখা যায়। কিন্তু কাঁচের পাত্রে রাখা যায় না, কারণ তাতে কাঁচ নষ্ট হয়ে যায়। এ তো তিনি "বৌ নেই বিয়ের" কল্পিত কাহিনী বলছেন না, তাঁর সাধনার ধন পরশ পাথরটি কি করে রাখেন, তাই বলছেন। খালিদ যে স্বর্ণ তৈয়ার করতে পারতেন, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। হযরত আলী (রা) এবং ইবনে সিনা প্রমুখ স্বর্ণ তৈয়ারের ফরমুলা সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এ সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান এখানে ব্যর্থতা বরণ করে আছে। কাজেই আরব সভ্যতা এখনও এখানে অগ্রবর্তী আছে। আমাদের কথাটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখানে একটি অবিকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"তাঁর (জাবির ইবনে হাইয়ান) মৃত্যুর একশত বছর পরে কুফার এক প্রান্তে অবস্থিত দামাস্কাস গেটের (বাব আম শম) নিকট রাস্তা নতুন করে তৈরী করতে কতকগুলি ঘর ভেঙ্গে ফেলার সময় একটি ঘরে ২০০ পাউণ্ড করে ওজনের একটি সোনার তাল ও একটি খল পাওয়া যায়। ফিহ্‌রিস্তের মতে এটি ছিল জাবিরের বাসস্থান ও ল্যাবরেটরী। ঐতিহাসিক হিট্টির মতে এই ঘটনাটি ঘটে জাবিরের মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে।"[১]

দুইজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক এই ঘটনা সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। সময়ের তারতম্য হলো অন্য প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয়ত, শুধু স্বর্ণ প্রস্তুত নয়, পৃথিবীর ধাতুদ্রব্য সম্পর্কে তিনি মূল সূত্র ধরে টান দিয়েছেন—একথা কেবল তখনকার পৃথিবী নয়, এখনকার

১. জাবির ইবনে হাইয়ান ঃ এম আকবর আলী, পৃষ্ঠা ৩০।

www.pathagar.com

পৃথিবীর জন্যও যত জটিল ও কঠিন হোক, প্রকৃতপক্ষে এটাই মূল কথা। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয়ত, জাবির এই স্বর্ণ প্রস্তুত জানার কথাটা যত গোপনই করুন, এটা তাঁর সদা গবেষণা যুক্ত ল্যাবরেটরীর কার্যকলাপ যত গোপনীয়ই রাখতেন একথা বাতাসের আগে আগে কি করে প্রকাশ হয়ে পড়ত। এজন্য তাঁকে কেবল অনুরোধ-উপরোধের নির্যাতনই নয়, অনেক সময় তাঁর হুমকি ও জীবন সংশয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ বিদ্যা এমনই বিপজ্জনক যে, একথা বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ--এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি একবার মন্ত্রী ইয়াহিয়া এবং খলীফার নিকট আত্মরক্ষার জন্য সত্য খুলে বলতে বাধ্য হন। অবশ্যি এজন্য মন্ত্রী এবং খলীফাকে তাঁর কিছুটা উপকৃত করতে হয়। তবু রক্ষা, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত খলীফা ও মন্ত্রীর রাজকীয় লোভ থেকে রেহাই পেয়ে যান। এর কিছুদিন পরেই পূর্বোল্লিখিত খলীফা যখন হঠাৎ বার্মাকী বংশকে নির্মূল করে দেন, তখন তিনি নিজকে বার্মাকী সংশ্লিষ্ট মনে করে প্রাণভয়ে বাগদাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই লোভনীয় প্রশ্নটিও লোপ পেয়ে যায়।

এখন স্বর্ণ বা ধাতুর মৌলিকতার রাসায়নিক প্রসঙ্গে আসা যাক।

জাবির 'রূহ' ও 'জিসম'—পদার্থকে এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। 'রূহ্' মানে আত্মা এবং 'জিসম' মানে দেহ। জিসমের অন্য নাম হলো 'নফস'। রূহ্ জিবিত, নফ্স মৃত। যে কোন পদার্থের পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা বা উজ্জ্বলতাকে বলা হয় আত্মা বা জীবন্ত; অপরিষ্কার ও অনুজ্জ্বল পদার্থকে বলা হয় মৃত বা নফ্স। প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে জিসমের বা জড় পদার্থের পরিমাণ কম থাকে এবং আত্মার পরিমাণ বেশী থাকে। রুক্ষ মাটির অনুরূপ অপরিষ্কার জিনিসগুলো মৃত এবং পরিষ্কার উজ্জ্বল জিসমগুলো জীবিত। প্রত্যেক রাসায়নিক দ্রব্যই অন্যসব জীবজন্তুর মত দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। এর একটি হলো দৈহিক অংশ ও অন্যটি হলো আত্মিক অংশ। রাসায়নিকের কাজ হলো দেহ এবং আত্মা সঠিকভাবে বিন্যাস করে যে, দেহে আত্মা যতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে অবস্থান করতে পারে, সেই দেহকে ততটা সুগঠিত করে দেওয়া। ধাতুর রূপান্তরের কাজটি অনেকটা আত্মাকে দেহের মধ্যে সন্নিবেশ করার মতই।

www.pathagar.com

জাবিরের মতে, সোনা-রূপা, লোহা প্রভৃতি যত প্রকার ধাতু আছে, কোন ধাতুরই মৌলিকতা নেই। এইসব ধাতুই পারদ আর গন্ধকের সমন্বয়ে গঠিত হয়। খনিজ ধাতু খনিতে যে নিয়মে গঠিত হয়, সেই নিয়মে মানুষও এইসব ধাতু তৈয়ার করতে পারে।

জাবিরের মতে এইসব রূহ বা জীবনীশক্তি সম্পন্ন পদার্থ হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নীচে চাপা পড়া অবস্থায় তাদের ক্রমোন্নয়নের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। এইসব আত্মা সমৃদ্ধ পদার্থ পূর্ণতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত মাটির নিচে বন্দী অবস্থায় নানা প্রকার স্বাভাবিক রাসায়নিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। প্রথমত, শুষ্ক ও ধোঁয়াটে জিনিসগুলো গন্ধকের মত দ্রব্যে পরিণত হয়। যেগুলো আর্দ্র ও বাষ্পময় সেসব পারদের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক ধাতুর মধ্যে গন্ধক ও পারদ—এই দুই অবস্থার জিনিসই নানা অনুপাতে বিদ্যমান এবং সেগুলো পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। ওদের প্রথম অশুদ্ধ অবস্থা ক্রমান্বয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে গন্ধক আর পারদ সংমিশ্রণে রাসায়নিক ক্রমোন্নয়নের পরিশুদ্ধির মান অনুযায়ী স্বর্ণ, লৌহ, তামা প্রভৃতি ধাতুতে পরিণত হয়। এই দুই মৌলিক পদার্থ গন্ধক আর পারদ ছাড়া স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকের কাজ হলো—খনিতে মাটি চাপা থেকে হাজার হাজার বছরে প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিবর্তনে যে প্রকার ক্রমবিকাশের পরিণতিতে পারদ ও গন্ধক থেকে স্বর্ণ-লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ প্রস্তুত হয়, সেই প্রাকৃতিক ক্রমোন্নয়নের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার প্রণালী উদ্ভাবন করা। তাঁর মতে খনিজ ধাতু এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ধাতু অনুরূপ বা এক কথাই। 'কিতাবুল খাওস'-এ তিনি আরো বলেন যে, সমস্ত খনিজ পদার্থ—ধাতু জাতীয় হোক বা না হোক—গন্ধক, পারদ, স্বর্ণ এবং নিশাদল দিয়ে গঠিত।

জাবির এবং পরবর্তীকালে ইবনে সিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই অভিমত পোষণ করেন যে, বিশুদ্ধ গন্ধক সোনালী রং ধারণ করে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পারদ ও বিশুদ্ধ গন্ধক একত্রে যদি বিশুদ্ধ

www.pathagar.com

হয় এবং পারদ যদি অপরিশুদ্ধ থাকে, তাহলে অথবা পারদ বিশুদ্ধ, গন্ধক অপরিষ্কার কিংবা গন্ধক পারদ দুটোই অপরিশোধিত অবস্থায় জড়িয়ে কঠিন করে নিলে তামা রূপা ও লৌহে পরিণত হয়। জাবিরের মতে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি খনিজ স্বর্ণ-লৌহের মত একই মান সম্পন্ন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকরা মৌলিক সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিশ্লেষণ বুদ্ধি ও সংশ্লেষণের দক্ষতার অভাবে স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুতে ব্যর্থ হয়েছেন। এরূপ নির্মাণ জটিলতা অসম্ভব মনে করে অথবা এরূপ সৃষ্টি জটিলতায় না গিয়ে একটি ধাতুর সঙ্গে আর একটি বা একাধিক ধাতুর সংমিশ্রণে আর একটি নতুন ধাতুর উৎপত্তির সহজ পন্থাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অবলম্বন করেন।

সংমিশ্রণে নতুন ধাতু সৃষ্টি সম্বন্ধে জাবিরের মত হলো, রাসায়নিক-ভাবে প্রস্তুত বা খনিজ ধাতু পারদ গন্ধক ছাড়া যার কোন মৌলিক ধাতু বা পদার্থের অস্তিত্বই নেই। সুতরাং অন্য কিছু থেকে দ্বিতীয় ধাতু তৈয়ার করা অর্থহীন। সব রকম ধাতুই যখন পারদ আর গন্ধক দ্বারা গঠিত, তখন বৈজ্ঞানিকরা যে ধাতুতে পারদ বা গন্ধকের যে উপাদান কম আছে সেটা যোগ করে দিতে পারেন অথবা যে ধাতুতে যে উপাদান বেশী আছে, সেটাকে বের করে দেওয়াই তাঁদের কাজ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সাজ তৈয়ার করতে পারেন না। এজন্য সঙ্কর পদ্ধতি ছাড়া গাছের মানোন্নত করার আর দ্বিতীয় কোন পন্থা খুঁজে পান না। জাবিরের মত হলো—পারদ আর গন্ধক সংমিশ্রণে মূল ধাতুই যখন তৈয়ার করা যায়, তখন সঙ্কর ধাতু নির্মাণ বোকামী। শঙ্কর ধাতুর দ্বারা পৃথিবীতে ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

রাসায়নিক ধাতু প্রস্তুত করার দরুন যদিও পৃথিবীর মৌলিক উপাদান বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু ধাতুর মানোন্নয়নে পৃথিবীর সুবিধা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবু আধুনিক মানুষ এ্যাটম বোমা তৈয়ার করতে পারে, চাঁদে যেতে পারে, কিন্তু তারা স্বর্ণ প্রস্তুত করতে পারে না। কথাটা জাবিরের কাছে যত সহজ, আধুনিক পৃথিবীর কাছে তত সহজ নয়। পৃথিবীর সবাই জানেন যে, ইউরেনিয়াম দিয়ে এ্যাটম বোমা তৈয়ার

www.pathagar.com

করা যায়, তবু ছয়টি দেশ ছাড়া পৃথিবীর বহু উন্নত দেশ কোন এ্যাটম বোমা তৈয়ার করতে পারে না।

এখনকার ও তখনকার পৃথিবীতে স্বর্ণ প্রস্তুত করতে পারা যে কি বিপদজ্জনক, তা ভুক্তভুগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। খালিদ নাকি স্বর্ণ ও পরশ পাথর তৈয়ার করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিজেই রাজকীয় শক্তিধর। দুর্দান্ত সাহসী জাবির ইবনে হাইয়ান স্বর্ণ ও পরশ পাথর তৈয়ার করতে গিয়ে আজীবন যেখানেই গিয়েছেন, দুর্যোগ, দুশ্চিন্তা ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ছাড়া সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পান নি। ইবনে সিনাকে সুলতান কাবুস অর্ধ রাজত্ব দান করতে চেয়েছিলেন কোন্ মোহে? ইবনে সিনাকে রাজত্ব দানের প্রস্তাব প্রদান হয়ত স্বর্ণ প্রস্তুতের ফর্মূলা হাতে পাওয়ার লোভেই। সুলতান মাহমুদের আল-বিরুনী ও ইবনে সিনাকে বল প্রয়োগে করায়ত্ত করার প্রচেষ্টার পিছনেও ছিল হয়ত এই স্বর্ণমোহ। তা না হলে ইবনে সিনাকে ধরার জন্য খাওয়ারিজম সুলতানকে হত্যা ও রাজ্য দখল করেও তৃপ্ত না হয়ে, একটি মাত্র ব্যক্তির জন্য সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ব্যাপী অনুসন্ধানের ব্যাপক তল্লাশী অভিযানের এত উত্তেজনা ও তৎপরতা কেন?

যৎকিঞ্চিৎ স্বর্ণ দ্বারা সাধারণ মানুষ সুখী হতে চায়। এই রাজা বাদশাহগণ শত মণ স্বর্ণ দ্বারা সেনাবাহিনী গঠন করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে বিশ্ববিজয়ী হতে চান। সুলতান মাহমুদ মৃত্যুর পর সুলতান মাসউদ 'কানুনে মাসউদী'-কে উপলক্ষ করে আল-বিরুনীকে একটি হস্তী পরিমাণ রৌপ্য দান করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আল-বিরুনী এই দান গ্রহণ করেন নি। তিনি জানতেন তিনি যদি এক হস্তী পরিমাণ রৌপ্য গ্রহণ করেন, তাহলে বিনিময়ে তাঁকে সুলতানকে এক হস্তী পরিমাণ স্বর্ণ তৈয়ার করে দিতে হবে। আল-বিরুনী জাবির ইবনে হাইয়ানের মত দুঃসাহসী হতে রাযী হন নি। জাবির ছিলেন আবিষ্কারের জন্য পাগল। স্বর্ণ প্রস্তুত ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেপরোয়া সাহসী।

লক্ষণীয় যে, বর্তমান দ্বন্দ্ববাদী বস্তুজগতের বিজ্ঞান এমন কি আত্মাকেও 'বস্তু' বলে অভিহিত করে। এভাবেই তারা জীবন্ত সব কিছুকে বস্তু তথা মৃত বলে ঘোষণা করে বসে আছে। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

জাবির প্রথমই সর্ব বস্তু (মেটার)-কেই প্রাণময় বলে স্বীকার করে অতি সূক্ষ্ম অন্তস্থ চিরসত্যকে উদ্ভাবনী ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যে পর্যন্ত এই মৌলিক মহা আবিষ্কার আঁকড়ে ধরা না যাবে, সে পর্যন্ত প্রকৃতির মহারহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হতে পারে না।

ধাতু প্রস্তুতে যেমন মাত্র দুটি কথা—পারদ ও গন্ধক, তেমনি বস্তু জগতেও মাত্র দুটি মৌলিক অস্তিত্ব বিদ্যমান—আত্মা ও দেহ অর্থাৎ রূহ ও জিস্ম বা নফ্স। প্রাণময় দেহে যেমন ঔষধ প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও আরোগ্য হয়, তেমনি বস্তুদেহের আত্মায় রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগে ফলোদয় হয়। এ হলো প্রকৃতির মূল তত্ত্বের উপর প্রকৃতই হস্তক্ষেপ। হাজার হাজার বছরের সাধনায় প্রকৃতি যেমন বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধকের আনবিক বিক্রিয়ায় অবশেষে খনিজ স্বর্ণ প্রসব করে, তেমনি অনুরূপ প্রক্রিয়ার অনুকরণে আল-কেমিস্টরাও স্বর্ণ প্রস্তুত করতে পারেন।

জাবির ইবনে হাইয়ান বলেছেন, "বৈজ্ঞানিকের সাধনার ধন এই মহৌষধটির নাম হলো আল-ইকসির বা পরশ মণি। মানুষের শরীরে ঔষধ নামক বিষ ঢুকে যেমন রোগ নিরাময়ের কাজ শুরু করে, তেমনি আল-ইকসির অপরিশুদ্ধ ধাতব দেহে ঢুকে আত্মার সঞ্জীবনী শক্তির ক্রিয়া শুরু করে। এর সামান্য অংশের সংস্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতুও স্বর্ণে পরিণত হয়।" এই আল-ইকসির (পরশ মণি)-টি পাথর ও স্বর্ণ পাত্রে রাখা যায়; কাঁচের পাত্রে রাখলে পাত্রটি নষ্ট হয়ে যায়। এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইবনে হাইয়ানের দ্বারা প্রস্তুত পরশ মণিটি তাঁর হাতে ছিল, যার জন্য মণেরও ঊর্ধ্বে পরিমাণ ওজনের সোনার তাল প্রস্তুত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

বিজ্ঞান যে পর্যন্ত মহাশক্তি অনুধাবনের একমাত্র হাতিয়ার প্রাণিজ শক্তি অধ্যাত্মবাদকে স্বীকার না করবে, সে পর্যন্ত মহাশক্তির উৎসমূল খুঁজে পেতে পারে না।

সমগ্র মুসলিম বিজ্ঞান জগতটাই ছিল অধ্যাত্মবাদভিত্তিক জ্ঞানের। প্রায় সব শাখাতেই হাত থাকায়, এদের দূরদর্শিতার পরিমাণ ছিল বেশী। এজন্য স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কার্যকলাপে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন প্রকৃতি জ্ঞান এসে মানসিক ক্ষেত্রকে অলক্ষ্যে উন্নত ও পরিপুষ্ট

www.pathagar.com

করতে সাহায্য করত। মানসিক গঠনে অধ্যাত্ম মনন শক্তির স্বাভাবিক প্রভাবের আধিক্য থাকায় মূল সূত্রের সন্ধান তাঁদের জন্য সহজতর ছিল, যদিও ইবনে হাইয়ান রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছেন, কিন্তু স্বর্ণ আবিষ্কারের মূল সূত্রটি অধ্যাত্মবাদী হযরত আলী (রা) থেকেই প্রথম উদ্ভাবিত। যদিও 'স্বর্ণ' শব্দটি তিনি উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু এর মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান ও ফল পরিমাণ স্পষ্টভাবেই বলে দিয়ে গেছেন। পারদ ও অভ্রকে বজ্রসদৃশ শক্তির (আগুনের) সঙ্গে সংশ্লেষণ করতে পারলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হওয়া যাবে। হযরত মুহম্মাদ (সা)-ও বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তোমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যদি আঁকড়ে ধর, তাহলে বিশ্বে নেতৃত্ব করতে পারবে।

মুসলিম সভ্যতার এসব হলো ভবিষ্যত উজ্জ্বল আধিপত্যের অধ্যাত্ম সূত্রের ইঙ্গিত। আল্লাহ্‌র আদি সৃষ্টি অধ্যাত্মবাদী মহাজ্ঞানী হযরত আলী (রা)-র মারফত স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রণালীটি সুস্পষ্টভাবেই বিশ্ব-মানবদের জানিয়ে দেওয়া হলো।

হযরত রসূল (সা) বলে দিয়েছেন—বিশ্বনেতৃত্বে বিজ্ঞানের গুরুত্ব আর হযরত আলী (রা) বলে গিয়েছিলেন, বিশ্বনেতৃত্বের মূল শক্তিটির প্রস্তুতের প্রণালীর ইঙ্গিত। উভয়ের বাণীর সারমর্ম একটাই। এই উভয় বাণীকে বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নিলেন বৈজ্ঞানিক খালিদ। প্রমাণের অস্পষ্টতার দরুন তাঁর সম্পর্কে এ বিষয়ে আমরা জোর দিয়ে মন্তব্য করতে না পারলেও তিনি যে রাজ্য লোভ ছেড়ে দিয়ে তরুণ বয়স থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিজ্ঞান সাধনা করে স্বর্ণ ও পরশ পাথর প্রস্তুত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, এ সত্য অপ্রকাশিত নয়। গ্রীক বিজ্ঞান আয়ত্ত ও অবলম্বন করে হযরত আলী (রা)-র প্রদর্শিত পথে বিশ্ব আধিপত্যের—বিশেষভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের—মূলধন যে তিনি সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন, একথা হয়ত মিথ্যা নয়।

দামাস্কাস গেটের কাছে সোয়া দুই মণ ওজনের যে স্বর্ণের তালটি পাওয়া গেল, ফিহ্‌রিস্তের সুবিখ্যাত লেখক ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক হিট্টি দুইজনই এর সত্যতা স্বীকার করেন। ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর একশত বা দুইশত বছর পরে অথবা যে কোন সময়েই পাওয়া যাক, স্বর্ণ তালের অস্তিত্বের কথাটি সত্য। ইবনে হাইয়ান স্বর্ণলোভী

www.pathagar.com

ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বর্ণ বা অন্যান্য ধাতুর সৃষ্টিতাত্ত্বিক রাসায়নিক।

আল-বিরুনীর ব্যাপারে হাতী পরিমাণ রৌপ্য এবং ইবনে সিনার হাতে পাওয়া রাজ্য এবং ইবনে হাইয়ানের স্তূপীকৃত স্বর্ণ মহাসাধকদের বিজ্ঞান সাধনাকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি।

কিন্তু খলীফা ও বৈজ্ঞানিক খালিদের স্বর্ণের প্রয়োজন ছিল। আল-মামুনের মত খালিদও রাজ্য নিস্পৃহ ছিলেন। এজন্য রাজ্য নিয়ে তাঁর আগ্রহ বা কারো সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদ ছিল না। তরুণ বয়সেই তিনি সর্বজনমান্য নিরীহ 'জ্ঞানী' হিসাবে অভিহিত হন। উমাইয়া বংশের মারওয়ানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খলীফা আবদুল মালিক তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া বংশই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে রাজ্যের পর রাজ্য বিস্তার করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হওয়ার ব্যাপারে হযরত আলী (রা:)-র ভবিষ্যদ্বাণী সফল করতে সক্ষম হয়েছিল। আব্বাসীয় বংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুবই উন্নত হয়েছিল বটে, কিন্তু রাজ্য বিস্তারের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল যদি উমাইয়াদের মত আব্বাসীয়গণও বিজয়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারত, তাহলে পরবর্তীকালে রোমানদের আধুনিক সভ্যতার মস্তকোত্তলনের অবশিষ্ট ক্ষমতা চিরতরেই বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং আরব সভ্যতার বিশ্ব আধিপত্য হয়ত বিশ্বজয়ে পরিণত হতো। উমাইয়াদের বিশ্বজয়ের বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ, জলে-স্থলে, রণ-দুর্মদ দুধর্ষ নৌবাহিনী যুদ্ধ জাহাজ ও অন্যান্য অস্ত্র নির্মাণের জন্য বিরাট বিরাট সামরিক কারখানার পেছনে জলস্রোতের মত অজস্র অর্থব্যয়ের গূঢ় কারণ হয়ত বৈজ্ঞানিক খালিদের ল্যাবরেটরীতে স্বর্ণ প্রস্তুতের সাফল্য। খলীফা আবদুল মালিক ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজকীয় সুযোগ-সুবিধায় বিজ্ঞানী খালিদ বিজ্ঞান গবেষণায় আজীবন লিপ্ত ছিলেন। খালিদ মারা যান ৭০৪ খৃস্টাব্দে। খলীফা আবদুল মালিক মারা যান ৭০৫ খৃস্টাব্দে।

বৈজ্ঞানিক খালিদের মৃত্যুর ৩১ বছর পরে উমাইয়া খলীফা হিশামের সময় বিশ্ববরেণ্য রসায়ন বিজ্ঞানের জনক ইবনে হাইয়ান জন্মগ্রহণ করেন এবং আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুনের রাজ্যলাভের প্রথম দিক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ১৫ বছর, তখন উমাইয়া

www.pathagar.com

শাসনের অবসান হয়। তখন তিনি শিক্ষার্থী মাত্র। অনাড়ম্বর বিলাস-হীন বিজ্ঞান তাপস জীবনে কমবেশী সোয়া দুই মণ স্বর্ণের তাল প্রস্তুত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনে থাকতে পারে না। বিশেষ করে এই শ্রেণীর 'জ্ঞান-পাগল' মনীষী সাধারণত 'ধন-পাগল' থাকেন না।

পিতৃ হত্যাকারীদের শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাল তাল স্বর্ণ প্রস্তুত করার ব্যাপারে রাজনীতিমুক্ত নিরীহ জ্ঞানী খালিদের আগ্রহ থাকতে পারে না। সোয়া দুই মণ ওজনের সোনার তালটি কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রস্তুত হতেও পারে না। এই প্রয়োজনটি ছিল রাজকীয়। মাত্র ১৫ বছরের একটি ছেলের পক্ষে উমাইয়া শাসনে অবস্থান করে সোনার তাল প্রস্তুত করা সম্ভবও নয়। এই তালটি যদি বাগদাদে পাওয়া যেত, তাহলেও ধরে নেওয়া যেত, তালটি ইবনে হাইয়ান তৈয়ার করেছিলেন। কারণ তিনি ১৫ বছর ছিলেন উমাইয়া শাসনামলে এবং ৬৫ বছর বেঁচেছিলেন আব্বাসীয় শাসন যুগে। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা গবেষণা পরিপূর্ণতা লাভ করে ছিল, আব্বাসীয় সময়কালে বিশেষ করে এত বড় একটি স্বর্ণ তাল কোন কালেই অরক্ষিত অবস্থায় কোন একটি জীর্ণ কুটীরেই দুই শত বছর পড়ে থাকতে পারে না। এটা কোন অনাদৃত পাথর নয় যে, শত শত বছর যাবত পড়ে থাকবে আর কে তার খোঁজ নেবে। স্বর্ণ তালটি কোন সাধারণ পরিবারেরও হতে পারে না যে, বাপ-দাদার আমলের তালটি ঘরের কোন্ কোণায় পড়েছিল কেউ বলতেই পারে না।

স্বর্ণতাল প্রাপ্ত স্থানটি জাবির ইবনে হাইয়ানের ল্যাবরেটরীও হতে পারে না। খুব সম্ভব এটি ছিল খালিদ ইবনে ইয়াযিদের রাজকীয় ল্যাবরেটরী। উমাইয়াদের দেশের পর দেশ বিজয়ে চিরদরিদ্র আরবদের পিছনে যে অজস্র অর্থ ব্যয় হয়েছিল, এর রহস্য মূলে ছিল হয়ত খালিদের স্বর্ণ প্রস্তুতের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। খালিদের প্রস্তুত স্বর্ণ দিয়েই হয়ত উমাইয়াদের বিজয়ের অভিযান অব্যাহত ছিল। এই স্বর্ণতালটি হয়ত তাঁর রাজকীয় ল্যাবরেটরীর গোপন সংরক্ষণাগারে সঞ্চিত ছিল। রাজভাণ্ডারে চালান দেওয়ার পূর্বেই হয়ত খালিদ মৃত্যুবরণ করেন। রাজা-বাদশাহ্দের ব্যাপার কেউ হয়ত খবরই রাখেন নি।

www.pathagar.com

খালিদের মৃত্যুর পরেও উমাইয়া শাসন ৪৬ বছর টিকেছিল। এই শাসনের পেছনে যদি রাসায়নিক স্বর্ণভাণ্ডার না-ই থাকবে, তাহলে খলীফা আবদুল মালিক ও খলীফা ওয়ালিদের সময় এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ—এই তিনটি মহাদেশ ব্যাপী সাম্রাজ্যের বিস্ময়কর সম্প্রসারণ লাভ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল এবং এর পরবর্তী উমাইয়া বিজয় অভিযানেই বা কেন মন্দাগতি দেখা দিয়েছিল? উমাইয়া শাসনামলে পশ্চিম ভারত হতে আরম্ভ করে ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর চীন সীমান্ত হয়ে বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের ছয়টি রাজ্য স্পেন সহ ইউরোপের কতকাংশ নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরাঞ্চল হয়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশকে নিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই বিজয় অভিযানের সাফল্যের দরুন খলীফা আবদুল মালিকের পুত্র খলীফা ওয়ালিদকে ঐতিহাসিক গিবন, 'তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট' বলে অভিহিত করেন। বিশ্ব-ব্যাপী এই বিশাল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে তারিক, মূসা, ইবনে কাসিম, হাজ্জাজ প্রমুখ সমর-বিজ্ঞানের যুগস্রষ্টা ও রণকুশলী সেনাপতির স্মরণীয় রণ অবদানই শুধু ছিল না, ছিল খালিদের স্বর্ণতাল প্রস্তুতের সকল প্রয়াস অর্থাৎ হযরত আলী (রা)-র বাণীর সার্থক বাস্তবায়ন।

মিসরে দামাস্কাসে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কারখানা থাকা সত্ত্বেও খলীফা আবদুল মালিক তিউনিসে একটি বিশাল যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেন।[১] এই অফুরন্ত অর্থস্রোতের পেছনে একটি রহস্যময় উৎস অবশ্যই ছিল।

খলীফা ওয়ালিদের পর থেকেই হয়ত মওজুদ স্বর্ণ শেষ হতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে খলীফা সুলায়মানের শাসন কালে রাজ্য সঙ্কোচও শুরু হয়ে যায়। ইবনে কাসিমকে ভারতে রাজ্য বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। খলীফা হিশামের সময় রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয় অর্থাৎ খলীফা ওয়ালিদের পর থেকে রাজ্য বিস্তারের যে মন্দাগতি দেখা দেয় আব্বাসীয়গণ সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য হাতে পেয়েও, তাঁদের সাম্রাজ্যের আকার-আকৃতি সঙ্কোচন ছাড়া সেই সাম্রাজ্য তেমন সম্প্রসারিত আর হয়নি। এর

---

১. আল-মুকাদ্দমা : ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা ১২০।

www.pathagar.com

অর্থ উমাইয়ারা যেভাবে খালিদের রাসায়নিক স্বর্ণ শক্তি ব্যবহার করতে পেরেছিল, ইবনে হাইয়ানকে হাতে পেয়েও আব্বাসীয়রা তাকে ব্যবহার করতে পারে নি। হারুন-অর-রশীদ বার্মাকী বংশ উৎখাতের চণ্ড নীতি অনুসরণ না করে ইবনে হাইয়ানের বিজ্ঞান প্রতিভাকে যদি যথাযথভাবে ব্যবহার করতেন, হয়ত বাগদাদের ইতিহাস অন্য-ভাবে লেখা হতো।

ইবনে হাইয়ান কেন, ইতিহাসের ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, আরও বহু বিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিকই স্বর্ণ প্রস্তুত করতে পারতেন। এখানে হাইয়ান প্রসঙ্গেই কথা বলছি।

বর্তমানের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকরা বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে নতুন ধাতু প্রস্তুতের পক্ষপাতী। কিন্তু ইবনে হাইয়ান মৌলিক পদ্ধতিতে ছিলেন। তাঁর মতে এক প্রকারের ভিজা এবং শুষ্ক খনিজ বাষ্প থেকে হাজার হাজার বছরের খনিজ ক্রমোন্নয়নে পারদ ও গন্ধকে পরিণত হয় এবং পারদ গন্ধক থেকেই বিভিন্ন প্রকারের ধাতু উৎপন্ন হয়। তাহলে মৌলিক পদার্থ হলো বাষ্প।

এখানে একটা কথা মনে পড়ে। খৃস্টপূর্ব ৬২৪—৫৬৫ অব্দে গ্রীক বৈজ্ঞানিক থিলিস অব মিলিটুন পানিই সৃষ্টি মূল উপাদান তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ইবনে সিনা বলছেন—মাটির উৎপত্তিও পানি থেকে। কারণ পানিতে মৃত্তিকা গুণ বেশী। পানি ক্রমশ জমাট হয়ে কাদায় পরিণত হয়। কাদা থেকে মাটি, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ইত্যাদি গড়ে উঠে। ইবনে হাইয়ান বলেন, ধাতুর উৎপত্তির মূলে পানি নয়, বাষ্প। হয়ত কেউ মনে করবেন কথা দুটি আলাদা কিন্তু আসলে তা নয়। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে মিলিটুস বলেন—পানি এবং ইবনে সিনাও বলেন পানি। আসলে পানির কোন অস্তিত্ব নেই। পানি মানেই বাষ্প। ইবনে হাইয়ান বলেন—সব ধাতু সৃষ্টির মূলে রয়েছে বাষ্প। এটাই সৃষ্টির মূল কথা না হলে সবাই এক কথা বলেন কেন- ইবনে হাইয়ান আর একটু এগিয়ে বলেন, বাষ্প মানেই আত্মা (রূহ)। অর্থাৎ সবই আল্লাহ্‌র শক্তি বা নূর।

ইবনে হাইয়ান নানাভাবেই তাঁর রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণের নামকরণ বা সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। পাতন (distillation), ঊর্ধ্ব পাতন (Sublemation), পরিস্রাবণ (Filtration), দ্রবণ (solution)

www.pathagar.com

কেলাসন (Crystalisation), ভস্মীকরণ (Calcination), গলন (Melting), বাষ্পীভবন (Evaporation) ইত্যাদি রাসায়নিক সংশ্লেষণ বা অনুশীলন গবেষণার কি কি রূপান্তর হয় এবং তার বাস্তব ফল কি, ইবনে হাইয়ান তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন।

ইবনে হাইয়ান ইস্পাত প্রস্তুত করার পদ্ধতি, চামড়া ও কাপড়ে রং করবার প্রণালী, লোহা এবং ওয়াটার প্রুফ কাপড়ে বার্নিশ করার উপায়, কাঁচ তৈয়ার করবার জন্য ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অকসাইডের ব্যবহার, সোনার জলে পুস্তকে নাম লেখবার জন্য লৌহের ব্যবহার ইত্যাদিও ব্যবহার করেন। তিনিই আর্সেনিক ও এন্টিমনি আবিষ্কার করেন।

অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্র স্বর্ণকে Cupellation পদ্ধতিতে অর্থাৎ সীসার সঙ্গে মিশিয়ে স্বর্ণ বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। তিনিই আলকালিতে দ্রব করে নিয়ে পরে ভিনেগারে অধঃক্ষেপ করে গন্ধককে বিশুদ্ধ করার পন্থা আবিষ্কার করেন।

ইবনে হাইয়ানই সর্বপ্রথম নাইট্রিক এসিড আবিষ্কার করেন। তাঁর 'কিতাবুল ইসতিতমাস' নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতের ফরমুলা রয়েছে ঃ

আধসের পরিমাণ সাইপ্রাসের মাজাত (Vitrial) নাও। এর সঙ্গে একসের পরিমাণ সল্ট পিটার এবং সিকিটাক আন্দাজ ইয়েমেনের ফিটকিরি নাও। এগুলোকে একসঙ্গে করে একত্রে একটি পাত্রে খুব জাল দিতে থাক। যতক্ষণ তা পাত্রে এলেমবিক লাল হয়ে যায়। এই বার উদ্ভূত তরল পদার্থটিকে বের করে নাও। এ প্রায় সমস্ত জিনিসকেই দ্রব করে। বৈজ্ঞানিক এর নাম দিয়েছেন 'মাআলনুলাল' বা দ্রাবক জল। এই তরল পদার্থটিই নাইট্রিক এসিড।"[১]

সিলভার নাইট্রেক, পারদের সঙ্গে 'হাইড্রোক্লোরিক' এসিড সংমিশ্রণে উদ্ভূত মারকিউরিক ক্লোরাইড ও তাঁর আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলোর অন্যতম। সালফিউরিক এসিডও তাঁর আবিষ্কার।

নাইট্রিক এসিডে স্বর্ণ গলে না। নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড সংমিশ্রণে স্বর্ণ গলানোর ফরমুলা তিনি আবিষ্কার

---

১. জাবির ইবনে হাইয়ান ঃ এম্‌. আকবর আলী, পৃষ্ঠা ৯৪।

www.pathagar.com

করেন। অবশ্য তিনি নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড সংমিশ্রণে স্বর্ণ দ্রব করতেন। নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই স্বর্ণ গলানোর পদার্থটির নাম যে 'একোয়া রিজিয়া" এই নামটিও ইবনে হাইয়ানের প্রদত্ত। তিনি অবশ্য নাইট্রিক এসিড ও সালফিউ-রিক এসিডের মিশ্র পদার্থেরই নাম দিয়েছিলেন "একোনা রিজিয়া।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—অত্যন্ত বিশুদ্ধ সোনালী রং-এর গন্ধক ও বিশুদ্ধ পারদ একত্রিত করে জমিয়ে কঠিন করলেই স্বর্ণে পরিণত হয়। পারদ-গন্ধক সহযোগে লাল রঙ্গের কার্বন পদার্থ প্রস্তুতের পদ্ধতি ইবনে হাইয়ান বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

একটি গোলাকার কাঁচের পাত্রে কিছুটা পারদও একটি সিরিয়ান মাটির পাত্রের ভিতরে বসিয়ে, মাটির পাত্রের ভিতর কাঁচের পাত্রটির চারদিকে গন্ধকের গুঁড়ো দিয়ে ভালোমতো ভর্তি করে, মাটির পাত্রটির মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করে দিয়ে, একরাত জ্বাল দিয়ে, পারদটি রক্ত বর্ণের কার্বন পদার্থে পরিণত হয়। এই তাজা রক্তের মত লাল টুকটুকে কঠিন পদার্থটিই রক্তপারা নামে অভিহিত।

ইবনে হাইয়ান চিকিৎসাশাস্ত্র, ইউক্লিড ও আল-মাজেস্টের ভাষ্য দর্শন, যুদ্ধবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান, রসায়ন ও কাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি এপোলোনিয়ামের আধ্যাত্মিকবাদ, প্লেটো, সক্রেটিস, এরিস্টটল, পিথাগোরাস, ডিমোক্রিটাস প্রমুখের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

ইবনে হাইয়ানের মতে সব ধাতুই যখন পারদ আর গন্ধক দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাহলে রাসায়নিকদের কাজ হলো যাতে যে জিনিসটির অভাব, তা পূরণ করে দেওয়া এবং উদ্বৃত্ত জিনিস বের করে দেওয়া। এজন্য প্রয়োজন তাগিত তাগলিস, তাকতির, তাহালিল প্রভৃতি প্রক্রিয়ার এবং এর কার্যকরী কর্মকর্তা হলো লবণ, ফিটকিরি, ভিট্রিওল, বোরাক্স, ভিনেগার ও আগুন।

তাঁর মতে প্রস্রাব, রক্ত, মল ও ডিম দিয়ে এলিক্সির তৈরী করা যায়।

জাবির ইবনে হাইয়ান যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, তার লিপিবদ্ধ ফল দিয়েই একেকটি গ্রন্থ রচনা করতেন। পরীক্ষায় যা সত্য পাওয়া

www.pathagar.com

গেল, তাই ছিল গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গ্রন্থের আকারের দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। ফলে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল পুস্তিকাকার। এসব পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল দু'চার, দশ, বিশ, ত্রিশ অথবা তদূর্ধ্ব। বৃহৎ গ্রন্থাবলী যে ছিল না, তা নয়। কারণ তাঁর গ্রীক গ্রন্থগুলোর ভাষ্য, প্রতিবাদ ও সংশোধন গ্রন্থসমূহ ছিল বৃহদাকার।

মোটকথা, তাঁর ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তাঁর পুস্তকের বিষয়-বৈচিত্র্যও ছিল অদ্ভুত। তিনি ব্যক্তিটাও ছিলেন অদ্ভুত, তাঁর কার্যকলাপও ছিল অদ্ভুত। কারণ তিনি কেবল যুগস্রষ্টা নন, বিজ্ঞানেরও ছিলেন সৃষ্টি-গুরু।

তিনি দুই হাজারেরও বেশী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তন্মধ্যে ২৬৭টি রসায়ন গ্রন্থ। দর্শনে ৩০০ কিতাবুত্ তাগদির জাতীয় ৩০০, যুদ্ধাস্ত্রাদি ৩০০, চিকিৎসা ৫০০, জ্যোতিবিজ্ঞান টেবল ৩০০ পৃষ্ঠা ১টি, ইউক্লিডের আলোচনা ১টি, আল-মাজেস্ট আলোচনা ১টি, দার্শনিক যুক্তি খণ্ডন ৫০০, দর্শন সম্বন্ধীয় ১টি, Book of Jorrent ১টি। ইবনে হাইয়ানের ৫০০ গ্রন্থের পৃষ্ঠার সংখ্যা ২০০০।

জাবির ইবনে হাইয়ানের নামটিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিকৃত করতে কসুর করেন নি। তাঁর নাম দেওয়া হয় 'জিবার'। তাঁর পাঁচটি বই নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে খুবই মতভেদ রয়েছে। হয়ত তাঁর এই থিসিসসমূহ কোন-না-কোন শ্বেত মনীষীর নামে বেনামী হয়ে আছে।

জার্মানীর জে. রুসকা ও পল ক্রাউস এই পঞ্চগ্রন্থ জাবির ইবনে হাইয়ানের নাও হতে পারে বলে দুর্বল যুক্তি দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি করেন। বৃটিশ মনীষী হোনইয়াউ ও আমেরিকার ঐতিহাসিক ও অনুবাদক অধ্যাপক মারটন এই পাঁচটি গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ইবনে হাইয়ানের বলে প্রবল যুক্তি পেশ করেন।

এই পাঁচটির মধ্যে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হলো 'কিতাবুস সাবঈনা'। এর মধ্যে রুসকা একটি দুর্বল যুক্তি পেশ করেন যে, আরব বৈজ্ঞানিকদের সর্বপ্রথম শূন্য আবিষ্কার করেন আল-খাওয়ারিজমি। অথচ খাওয়ারিজমির পূর্বে কি করে জিবার (ইবনে হাইয়ান) 'কিতাবুস

www.pathagar.com

সাবইনা'-তে এত প্রচুর শূন্য ব্যবহার করতে পারেন? কাজেই এই গ্রন্থটি জিবারের নয়।

আমাদের মতে 'শূন্য' আরব বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করেছেন বটে। কিন্তু কে আবিষ্কার করেছেন, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। স্বর্ণ আবিষ্কারের থিসিস ছিলেন হযরত আলী (রা) স্বর্ণের সর্বপ্রথম কার্যকরী আবিষ্কারক জাবির ইবনে হাইয়ান, না খালিদ ইবনে ইয়াযিদ এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহভাবে মত প্রকাশ করতে পারিনি। তবে অগ্রবর্তী হিসাবে খালিদকেই আমরা ধরে নিয়েছি। এমনও হতে পারে 'শূন্য' জাবির ইবনে হাইয়ান বা তাঁর পূর্ব থেকেও আবিষ্কৃত হয়ে থাকতে পারে।

অধ্যাপক মারটন ও হোম ইয়াডের মতে 'শূন্য' আবিষ্কার একটি বিতর্কমূলকে প্রশ্ন। সুনির্দিষ্ট যুক্তি নয়, অথচ 'কিতাবুস সাবইনা'র সুনির্দিষ্ট লেখক 'জিবার'। তিনি যদি এই গ্রন্থ রচয়িতা না হন, তবে কে লিখেছেন, তাও যখন বিরুদ্ধবাদীরা বলতে পারেন না এবং ভাষা থেকে ভাষান্তরে ত্রুটি-বিচ্যুতি যখন থাকেই, তখন এসব দুর্বল যুক্তি দোহাই শুনে এই পাঁচটি গ্রন্থকে জিবারের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না।

www.pathagar.com

সমর-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

গ্রীকদের মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিক উপরই আরব সভ্যতা গড়ে উঠে। গ্রীকের আর্কিমিডিস রোমানদের বিরুদ্ধে ট্রয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কাঠের বহু সমরাস্ত্র উদ্ভাবন করেন। এর ফলে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রোপকূলে ভীড়তে পারত না। আর্কিমিডিসের কাষ্ঠযন্ত্রের আওতায় আনা মাত্রই শত্রুপক্ষের জাহাজকে যন্ত্রশক্তিতে জোর করে তীরের দিকে টেনে নিয়ে আসা হতো। তলদেশে যন্ত্র এমন শক্তিভাবে আঁকড়ে ধরত যে, এর কবল থেকে যুদ্ধ জাহাজের মুক্তির ক্ষমতাই থাকত না। এ যেন অলৌকিক যন্ত্রশক্তি। এইভাবে আর্কিমিডিসের যন্ত্রশক্তির আওতায় পড়ে শত্রুপক্ষকে তাদের জাহাজ, নাবিক ও সৈনিক সবাইকে হারাতে হতো।

অন্য কথায় আর্কিমিডিস কাষ্ঠনির্মিত বহু যুদ্ধ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এই সব নির্মাণ কলা-কৌশল হয়ত তিনি গ্রন্থাকারেও লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক খালিদ আরব সভ্যতার সর্বপ্রথম গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো অনুবাদ কার্যে লিপ্ত হন। হয়ত গ্রীকদের সমর-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক তাঁর হস্তগত হয়। আমরা দেখতে পাই উমাইয়া শাসনের আমলে দেশের পর দেশ জয় করার সময় খুব উন্নত ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা হতো। নৌযুদ্ধে জাতীয় উন্নত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা হতো এবং এইসব উন্নত মারণাস্ত্রের সামনে শত্রুপক্ষ নিশ্চিত পরাজয়ের কবল থেকে সাধারণত রেহাই পেত না।

৭১০ থেকে ৭১২ খৃস্টাব্দে মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় আমরা এই শ্রেণীর অত্যন্ত উন্নতমানের শক্তিশালী কাষ্ঠ নির্মিত সমরাস্ত্রের সন্ধান পাই।

www.pathagar.com

সিন্ধুরাজ দাহির দেবলের প্রতাপ সিংহের দুর্গের প্রশস্ত দেওয়ালের উপর বর্শাধারীরা সারিবদ্ধ হয়ে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। শত্রুসৈন্য কাছে ভীড়লেই বর্শাঘাতে তাড়িয়ে দিয়ে দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করত। বিন কাসিম দূর থেকে আঘাত হেনে দুর্গপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার জন্য 'মিনজানিক'[১] নামক এক প্রকার কামান জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করেন। এই মিনজানিক কাষ্ঠ নির্মিত অস্ত্র। এর দ্বারা দ্রুতবেগে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হতো। সাধারণ কামানের চেয়ে এর আঘাত কোন অংশেই দুর্বল ছিল না। মিনজানিকের আঘাতের পর আঘাত যত পুরু ও যত শক্ত দুর্গ প্রাচীরই হোক টিকে থাকতে পারত না, ভেঙে পড়ত।

দেবল আক্রমণের সময় মিনজানিক দিয়ে দুর্গের কয়েক দিক ভেঙ্গে ফেললেও যখন দুর্গবাসী আত্মসমর্পণ করছে না, তখন একজন ব্রাহ্মণ পালিয়ে এসে মুসলিম শিবিরে সংবাদ জানায় যে, দুর্গমধ্যে ঐ যে প্রধান মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ায় বিরাট নিশানটি উড়ছে, হিন্দুদের বদ্ধমূল বিশ্বাস—এটা যে পর্যন্ত উড্ডীন থাকবে সে পর্যন্ত এই দুর্গ জয় করার সাধ্য কারো নেই। দেবতা স্বয়ং এই দুর্গকে রক্ষা করবেন। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করছে না। বরং ভাঙা প্রাচীরের দিকে ভীড়তে চেষ্টা করলেই শত্রুসৈন্য মুসলিম সৈন্যদের উপর বর্শা বর্ষণ ও উত্তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করে প্রাণপণে প্রতিরোধের চেষ্টা করে।

বিন কাসিম শত্রুর গোপন রহস্য জানতে পেরেই দুর্গের মধ্যবর্তী সর্ববৃহৎ মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়াটি মিনজানিকের আঘাতে উড়িয়ে দেন। অচিরেই সন্ত্রস্ত দুর্গাবাসী আত্মসমর্পণ করে।

মিনজানিক বাটের অস্ত্র বটে। কাষ্ঠত বন্দুক আর রাইফেলেও থাকে। মিনজানিকের মধ্যে লৌহ জাতীয় কঠিন ধাতব দ্রব্যও কিছু ছিল কি না কে জানে। পাথরের গোলাকে বিদ্যুৎ গতিতে নিক্ষেপ করার জন্য বারুদ বা এই জাতীয় কোন বিস্ফোরক দ্রব্যও ছিল কিনা বলা কঠিন।

---

১. মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ঃ নাসিম হিজাযী।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো রোজার বেকন (১২১৪—১২৯৪) সর্বপ্রথম বারুদ আবিষ্কার করেন বলে বলা হয়ে থাকে। আমরা পূর্বেই এর প্রতিবাদ করেছি। বস্তুত নির্বিচারে কোন প্রকার ইউরোপীয় আবিষ্কারককে মেনে নেওয়ার পূর্বে আমাদের একটু ভেবে দেখতে হয়।

যে বছর রোজার বেকন জন্মগ্রহণ করেন, সেই বছর চেঙ্গিস খান চীন দখল করেন। তখন পরাজিত বারুদ আর কামান বন্দুকে চীন সম্রাটের সামরিক গুদামখানা বোঝাই ছিল।

১২১৪ খৃস্টাব্দে চেঙ্গিস খান চীন দখল করেন। তখন যদি চীন সম্রাটের কামান বন্দুক, গোলাবারুদ সবই থেকে থাকে, তাহলে রোজার বেকনের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই গোলা-বারুদের (গান পাউডার) প্রচলন ছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে লর্ড আর্মস্ট্রং বন্দুক আবিষ্কার করেন, এই দাবিও অসত্য। কারণ লর্ড আর্মস্ট্রং এর বন্দুক আবিষ্কারের (৩৪১ খৃ.) পূর্বেই চীন সম্রাটের গুদামে যথেষ্ট বন্দুক যে মওজুদ ছিল এইটিই ঐতিহাসিক সত্য।

১০৯৫ খৃস্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়। ক্রুসেডের নৌযুদ্ধে মুসলমানরা যে কামান জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতেন, সে সম্পর্কে আমরা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃতি ইতিপূর্বেই দিয়েছি।

তারো বহু শত বছর পূর্বে জাবির ইবনে হাইয়ান শুধু যুদ্ধাস্ত্রাদির উপরই ৩০০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জ্ঞানগুরু খালিদ ইবনে এজিদ সমর-বিজ্ঞানের উপরে বিশেষ গবেষণা পরিকল্পনা করে-ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর ৩১ বছর পরে জাবির ইবনে হাইয়ান জন্মলাভ করেন, আরব সভ্যতাকে অক্ষত অব্যাহত রাখার জন্যই যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত গবেষণা ও পুস্তক রচনায় এত জোর দিয়েছিলেন। এ হয়ত খালিদেরই দ্বিতীয় বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা।

হয়ত অস্ত্র নির্মাণের উন্নত সূত্রগুলো আর্কিমিডিস থেকেই জ্ঞান গবেষণা সূত্রে তাঁদের নিকট এসেছিল। আর্কিমিডিসের অস্ত্রগুলো কাঠের ছিল বটে। কিন্তু এত যে প্রচণ্ড শক্তি, এই শক্তির উৎসমূল কোথায় তার সন্ধান সূত্র হয়ত আরব বৈজ্ঞানিকেরা আরও করেছিলেন। এ সম্বন্ধে হয়ত পৃথিবীকে আর কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। ইউরোপ বা পাশ্চাত্যও জানতে পারেনি। আরব সভ্যতার পতনের পর

www.pathagar.com

খালি ময়দানে ইউরোপ যা কিছু অজ্ঞাত মানিক কুড়িয়ে পেয়েছে, তার অধিকাংশই তাঁরা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে।

হয়ত আরবদের 'মিনজানিক' অস্ত্রই আধুনিক কামানের আদি পিতা। হয়ত খালিদ ইবনে হাইয়ান প্রমুখ বৈজ্ঞানিক এর উদ্ভাবক। সূত্র হয়ত আর্কিমিডিসের সামরিক যন্ত্র বিজ্ঞান থেকেই এসেছিল। আরবরা এর রাসায়নিক উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন।

যুদ্ধের প্রয়োজনে আরেকটি যন্ত্র আরবরা আবিষ্কার করেন। সেটির নাম হলো 'দব্বাবা।'[১] একে টেনে নিতে পাঁচ ছয় শত লোকের প্রয়োজন হতো। আসলে এ ছিল নীচ দিয়ে বহু চাকা লাগানো একটি কাঠের কৃত্রিম দুর্গ। এই যন্ত্রটির আকৃতি ছিল বিরাটকায়। কাঠের কলকব্জা দিয়েই যন্ত্রটি গঠিত ছিল। এর সম্মুখভাগ এমন সুদৃঢ় কাঠ দ্বারা গঠিত ছিল যে, এটাকে কোন আঘাতেই ভাঙা যেতো না। একদল সুদক্ষ সৈনিক এর কাষ্ঠ দেওয়ালের আড়ালে প্রস্তুত হয়ে থাকত। পাঁচ-ছয় শত লোক একে ঠেলে নিয়ে যেত সম্মুখ দিকে। সেনা-বাহিনী এমনভাবে এই কৃত্রিম দুর্গটিকে সুরক্ষিত করে রাখত যে, শত্রুপক্ষ কিছুতেই গতিরোধ করতে না পারে।

এইভাবে শত্রু দুর্গের প্রাচীরের উচ্চতা যতই হোক তার চেয়ে এর উচ্চতা হতো অনেক বেশী। দববাবাকে শত্রু দুর্গের প্রাচীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আরব সৈন্যরা এই কৃত্রিম দুর্গের শিখরে দ্রুত উঠে গিয়ে শত্রু-দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে দুর্গ দখল করে নিত।

বহু চাকা বিশিষ্ট এই কৃত্রিম দুর্গটি আরব জওয়ানেরা টেনে নেওয়ার সময় রহস্য করে বলত তারা 'আরূস' বিয়ের কনে নিয়ে যাচ্ছে।

মিনজানিক থেকেই যে কামান উদ্ভব হয়েছে এবং নিক্ষিপ্ত পাথরের পিছনে গোলাবারুদের একটা কিছু অস্তিত্ব ছিল, সে বিষয়ে আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন তাত্ত্বিক পণ্ডিতের অভিমত উল্লেখ করছি। "(আরবরা)" ৩০৩ হিজরীতে ভূমধ্যসাগরের কিনারায় একটি পাহাড় খুঁড়ে এক বড় জাহাজ ঘাঁটি তৈরী করে, যেখানে

---

১. ইবনে কাসিম : নাসিম হিযাজী।

www.pathagar.com

দুইশত যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন রাখা যেতো। এই জাহাজ ঘাঁটির নাম ছিল 'শীনি' এবং এর একেকটি জাহাজ এত বড় ছিল যে, (তাকে) চালানোর জন্য ১৪৩টি দাঁড় টানতে হতো। প্রত্যেকটিতে গোলাঘর ছিল।[১]

প্রত্যেক যুদ্ধ জাহাজেই' গোলাঘর ছিল। ৩০৩ হিজরীর এই গোলা-ঘরটি কিসের? ক্ষেতের ধান রাখার গৃহস্থের বাড়ীতে 'গোলাঘর' থাকে। এ তো ক্ষেত নয়, প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজ। কামানের গোলাবারুদ রক্ষণাগারকেই সাধারণত গোলাঘর বলা হয়ে থাকে।

উমাইয়া ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের পথ পরিহার করে শুধু সমর শক্তির সহায়তায় সাম্রাজ্য বিস্তার অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। এজন্য সমর-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের বিশেষভাবে ব্যবহার করে সমরাস্ত্র নির্মাণ কার্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানই তারা অধিকার করেছিল। তা না হলে খলীফা আবদুল মালিককে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে ইউরোপের ঐতিহাসিগণ মেনে নিতেন না। এর মধ্যে আমরা দুটো দিকই প্রমাণের চেষ্টা করেছি। একটি হলো স্বর্ণ প্রস্তুত, দ্বিতীয় হলো রোমান ও অন্যান্য শত্রুপক্ষের সঙ্গে মারণাস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় কামান জাতীয় শক্তিশালী অস্ত্র আবিষ্কার এবং পৃথিবীতে গোলবারুদের সর্বপ্রথম ব্যবহার তাদের এই বিস্ময়কর সমরাস্ত্র ব্যবহারে স্তম্ভিত শত্রুপক্ষ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। তৃতীয়ত, সমর-বিজ্ঞানের উপর মোটেই জোর না দিয়ে আব্বাসীয় খলীফাগণ বিশ্ব বিজ্ঞান ও বিশ্ব কল্যাণের উপর তাঁদের সাম্রাজ্য শক্তিকে সীমিত রেখেছিলেন। স্বনামধন্য আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদ খালিদের মত জাঁদরেল বৈজ্ঞানিককে হাতে পেয়েও ব্যবহার করতে পারেন নি। স্বর্ণ এবং অস্ত্র প্রস্তুতে খালিদ তখন প্রকাশ্য এবং প্রত্যক্ষ থিসিস দিয়েছেন। অথচ এই হারুন-অর-রশীদ সেই সমর-থিসিস অগ্রাহ্য করে বাগদাদকে জ্ঞানে-গুণে স্বপ্নময় কাহিনীর বাগদাদে পরিণত করতে লেগে গিয়েছিলেন। একজন সৃষ্টি সেরা বৈজ্ঞানিককে সামরিক অস্ত্র ও রাসায়নিক স্বর্ণ উদ্ভাবনে ব্যবহার করে নি। উমাইয়াদের মত আব্বাসীয়দের সামরিক ও আর্থিক যোগ্যতা ছিল না। উমাইয়ারা ৯০ বছর রাজত্ব

---

১. আরব নৌবহর: সৈয়দ সুলায়মান নদভী, পৃষ্ঠা ২৩।

www.pathagar.com

করে বিশ্বব্যাপী যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেল, আব্বাসীয়রা ৫০৮ বছর রাজ্য শাসন করেও অনুরূপ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যোগ্যতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, সংরক্ষণেও বারবার ব্যর্থতা বরণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, আব্বাসীয় বংশের প্রথম থেকে আল-মামুন পর্যন্ত ৮৩ বছর যোগ্যতার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে যদি কোন মতে যোগ্যতার আসনেও স্থান দেওয়া যায়, তাহলে আব্বাসীয় শাসন ১১৩ বছর স্থায়িত্ব কাল ধরে নেওয়া যেতে পারে। তৎপরবর্তী ৩৯৫ বছরকে বাগদাদের পুতুল শাসনও বলা যেতে পারে অথবা এসব পুতুল খলীফাদের হাতে রাজকীয় সীলমোহর ছাড়া ক্ষমতা বলতে কিছু ছিল না।

কারণ এই পুতুল খলীফাদের সাম্রাজ্য সীমার মধ্যে পর পর বুয়াইদ (পারসিক) ও সেলজুক (তুর্কী) নামে দুটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। বুয়াইদরা শাসন ক্ষমতায় ছিল ১১০ বছর এবং সেলজুকরা শাসন ক্ষমতায় ছিল ১৫৭ বছর। এই দুটি শক্তিশালী বংশ সম্রাটগণই প্রকৃতপক্ষে বাগদাদী পুতুল খলীফাদের ২৬৭ বছর ধরে নিয়ন্ত্রণ করেন।

আরব উপদ্বীপের তিনদিকে সাগর ও গরীব দেশ বাণিজ্যিক প্রয়োজন থাকলেও আরবরা সমুদ্রে সওদাগরী জাহাজে আরোহণ দূরে থাকুক, নৌকায় চড়ে এদিক থেকে ওদিকে যেতেও সাহস পেত না। নেহায়েত বেঁচে থাকার গরজে নৌকায় নদীপথে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও হিজাযের লোকেরা সমুদ্র দূরে থাকুক, নদীপথে নৌকা ভ্রমণেও ভয় পেত।[১]

ইসলামের আবির্ভাব ও অনুপ্রেরণায় এই সমুদ্রভীরু নির্বীর্য আরবরাই নৌযুদ্ধে এত দুঃসাহসী দুর্ধর্ষ হয়ে দাঁড়ায় যে, তাঁদের হামলার আতঙ্কে ইউরোপের শ্বেত-রক্ত বরফের মত হিম-শীতল হয়ে যেত। শুধু ইসলামের অনুপ্রেরণাতেই এই মৃত আরব শক্তি নব জাগরণ লাভ করেছিল।

১. আত-তমদ্দুন-আল ইসলামী : প্রথম খণ্ড, মূল লেখক জুরজি যায়েদান।

www.pathagar.com

গৃহনিষ্ক্রান্ত হয়ে সভ্যতা বিস্তারের জন্য মুসলমানরা রোমান ও পারসিকদের সাথে যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে শুরু করে, দুটি প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাঁদের বিভিন্ন প্রকারের অযোগ্যতা ধরা পড়তে থাকে। বহির্বিশ্বে দিগ্বিজয়ী ভূমিকাটা হযরত উমর (রা.)-এর সময়ই চরম বিকাশ লাভ করে। তাঁর সময় একদিকে পারস্য ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকা অন্যদিকে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া অধিকৃত হয়। এ দুটি ছিল তখনকার বিশ্বের সর্ববৃহৎ নৌকেন্দ্র।

বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তা ইবনে আল-হামরানী কর্তৃক প্রেরিত নৌপথে পারস্যের পারস আক্রমণে মুসলমানগণ শোচনীয় পরাজয় বরণে প্রমাণ হয়, প্রথমদিকে রোমান ও পারসিকরা নৌযুদ্ধে আরবদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। এই যুদ্ধই আরবদের প্রথম নৌযুদ্ধ।

এরপর সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মাবিয়া নৌযুদ্ধে রোমানদের আক্রমণ করতে চাইলে হযরত উমর (রা) নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। কারণ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী খলীফা রোমান ও আরবদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আরবদের নৌশক্তির দুর্বলতা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

এর ৪০ বছর পরে খলীফা আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫)-এর সময় আরব নৌশক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে, ইবনে খালদূনের লেখা থেকে তা উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, ···“সওদাগরী এবং যুদ্ধ—এই উভয় উদ্দেশ্যেই তারা জাহাজ নির্মাণ করতে থাকে এবং যুদ্ধ জাহাজগুলো সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলে। খলীফা আবদুল মালিক আফ্রিকার শাসনকর্তা হাসান ইবনে নুমানকে তিউনিসে নৌযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় একটি অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলার আদেশ প্রদান করেন।·· গৌরবোজ্জ্বল যুগে ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় খৃস্টান নৌবহরের আধিপত্য ছিল নগণ্য।”

এখানে আরো একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো ঃ

“মুসলিম নৌবহর এমনভাবে তাঁদের (রোমান নৌহরের) উপর গিয়ে হামলা করত, যেমন সিংহ তার শিকারের উপর লাফ দিয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ ভূমধ্যসাগর এলাকা মুসলিম জাহাজে পূর্ণ ছিল।

১. আরব নৌবহর ঃ মূল – সৈয়দ সুলায়মান নদভী, অনূদিত, হুমায়ুন খান কর্তৃক অনূদিত, পৃষ্ঠা ২৭।

www.pathagar.com

১৫৯৮ খৃস্টাব্দেও সমুদ্রে মুসলমানদের পূর্ণ সামরিক আধিপত্য ছিল। তখন ভাস্কো দা গামার ভারতে পৌঁছানোর রাস্তা আবিষ্কারের গোড়ায় ছিল মুসলিম অবদান। তখন ভূমধ্যসাগরে তুর্কীদের এত দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল যে, সাগরে ইউরোপীয় জাহাজগুলো খুব সতর্ক ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিচরণ করত। তুর্কীদের আধিপত্যের দরুনই ভূমধ্যসাগরে তাদের মুকাবিলার ভয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পানিপথে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপ একটি নতুন পথের সন্ধানে উদগ্রীব ছিল। এইরূপে ভূমধ্যসাগরকে এড়িয়ে গিয়ে ইউরোপ নতুন পানিপথ আবিষ্কারের জন্য কলম্বাস (১৪৯২) ঐ ভাস্কো দা গামা (১৪৯৮)-কে প্রেরণ করে এবং নতুন পানিপথে ভারত এবং আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়।

এই পানিপথ আবিষ্কারে ইবনে মজিদ নামক একজন স্পেনীয় (মুর) মুসলিম নাবিক ছিলেন ভাস্কো দা গামার একমাত্র অবলম্বন। এ সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ "হিজরী চতুর্থ শতকের শুরুতে মাদাগাস্কারে একটি আরব বসতি ছিল। এই উপকূলেই ১০ম হিজরী শতকে পর্তুগালীয় নাবিকরা এবং ভাস্কো দা গামা আরব নাবিকগণের দেখা পেয়েছিলেন। যারা (আরব নাবিকরা) তাদের (ভাস্কো দা গামাদের) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বলে দিয়েছিলেন।

"এইসব উপকূলে ওমানের আরবদের এমনি প্রভাব ছিল যে, এগুলো ওমান রাজ্যের অংশ হয়ে গিয়েছিল। জাঞ্জিবার দীর্ঘকাল যাবত ওমানের সুলতানের অধীনে ছিল। পরে ইউরোপীয়রা তা আবিষ্কার করে নেয়।"[১]

একে যদি আবিষ্কারই বলতে হয়, এ দাবি ইবনে মজিদ বা আরবদের প্রাপ্য, যে পথে এইসব আরব নাবিক চিরকাল চলে আসছেন, আবিষ্কারের মালিকানা স্বত্ব কারো হতে পারে না।

ইউরোপের সেই 'নাম কেনা'র নব জাগরণের যুগে যদি এভারেস্ট হিলারী আবিষ্কার করতেন, তেনজিং-এর নাম গন্ধও তাঁরা উল্লেখ করতেন না, নিধিরাম জামাতা বড় সড়কে মাত্র একদিন শ্বশুর বাড়ী

---

১. ইবনে মজিদ ঃ প্যারিস সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩-১১।

www.pathagar.com

গেলেই এর নাম হয়ে যায় 'নিধিরাম রোড' আর জঙ্গল কেটে যারা সড়ক প্রস্তুত করে চিরতরে পথ করে দিয়েছিল, তাদের কোন নাম গন্ধই রইল না। প্রকৃতপক্ষে ভূমধ্যসাগরে তুর্কীদের ভয়ে সোজা পথ বাদ দিয়ে আফ্রিকা ঘুরে পানিপথে ভারতে যাওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে গামা ভারতীয় পানিপথ নয়, প্রথম আরব নাবিকদেরকেই আবিষ্কার করেছিলেন এবং আরব নাবিকদেরই সম্পূর্ণ আশ্রয়ে তিনি ভারতে গিয়েছিলেন। আবিষ্কারকেই যদি বলতে হয়, তবে ভাস্কো দ্য গামা নয়।

বস্তুত ইউরোপীয়দের আফ্রিকা ঘুরে ভারত যাত্রার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ, অসম সাহসী স্পেনের বিখ্যাত মুসলিম নাবিক আহমদ ইবনে মজিদ ১৪৯৮ খৃস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ভাস্কো দ্য গামাকে নিয়ে আফ্রিকা ঘুরে পানিপথে ভারত যাত্রা শুরু করেন। ইতিপূর্বে গামা মজিদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ, মজিদের অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধির উপর ভাস্কো দ্য গামা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষভাবে সামুদ্রিক জাহাজ পরিচালনায় আমার চেয়ে মজিদের যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত উন্নত। তাঁর উন্নত যন্ত্র, নিখুঁত মানচিত্রের ছিল নিপুণ ব্যবহার, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাদৃষ্টে গামা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হন।[১]

এক কথায় ইবনে মজিদই ছিলেন সামুদ্রিক জাহাজে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত যন্ত্র ব্যবহারে ইউরোপের প্রথম দিক উন্মোচনকারী পথ প্রদর্শক। ইবনে মজিদ আজীবন সমুদ্র যাত্রাতেই কাটিয়েছেন। তাঁর বিচিত্র সামুদ্রিক অভিজ্ঞতার ফল তিনি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব লেখাই ছিল ইউরোপের মূলধন। মজিদকে বলা হত 'সমুদ্রের সিংহ'।

সমুদ্রে কম্পাস যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে সেকালে ইউরোপ কিছুই জানত না। চীনের উদ্ভাবনী শক্তির সহায়তায় আরবরাই এর প্রথম আবিষ্কারক। এ সম্বন্ধে একটি বর্তমানে পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি হলো ঃ

"কুতুব নুমা (চুম্বক যন্ত্র) সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের এবং আরবদের প্রদত্ত বর্ণনা পড়ার পর বলা যায় যে, এটি আবিষ্কার করে চীনারা

---

১. এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, প্রবন্ধ—শিহাবউদ্দীন আহমদ বিন মজিদ।

www.pathagar.com

এবং তারা এটি ব্যবহার করত সাধারণত গাণিতিক যন্ত্র হিসাবে। যেসব আরব নাবিক হিজরী প্রথম শতকেই (৬ষ্ঠ খৃস্টাব্দ) চীনে পৌঁছেছিল, তারা চীনদের কাছ থেকে যন্ত্রটি আনে এবং সমুদ্রে দিক নির্ণয়ের কাজে এটি ব্যবহার শুরু করে। তারা যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করে। কিন্তু অন্যদের কাছে তা গোপন রাখে। ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে চুম্বক কম্পাসের কথা জানতে পারে সম্ভবত ১৫শ শতকের পরে কিংবা তারও পরে। পঞ্চদশ শতকের আগেই ইউরোপে 'কম্পাস' শব্দটির ব্যবহার ছিল বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তাতে আমাদের বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। কেননা তখন এই শব্দটি দ্বারা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের মানচিত্র বোঝাতো।

"ভাস্কো দ্য গামার সময় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় নাবিকরা আরব নাবিকদের যন্ত্রপাতি এবং তাদের সমুদ্র বিষয়ক বই-পুস্তক থেকেই তথ্যাবলী ব্যবহার করে আসছে।"[১]

প্রকৃতপক্ষে দূরবীক্ষণ ও নৌ-কম্পাস যন্ত্র পৃথিবীতে প্রথম প্রচলন করেন আবুল হাসান। সমুদ্রে মুসলমানদের এরূপ একচেটিয়া সামরিক আধিপত্য ও নৌ-শক্তি ১০ম শতাব্দী থেকে হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে মিসরের বাদশাহ মালিক আশরাফ কান্‌স উপকূল এলাকায় পর্তুগীজদের সঙ্গে এক নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ব্যর্থ হন এবং ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে তুরস্কের সুলতান সুলায়মান গুজরাটের উপকূলে একটি নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ব্যর্থ হন। এই সব পরাজয়ের ফলেই আরব নৌ-শক্তির পতন ঘটে।

১. 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র ১১শ সংস্করণ 'চুম্বক' প্রবন্ধে উল্লিখিত।

www.pathagar.com

কুরআন ও কম্পিউটার বিজ্ঞান

জ্ঞানের বিশেষের চর্চা বা বিশেষ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা হয়। সেই হিসাবে ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ব, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি সবই বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা মাত্র। মানব জাতি বিশেষ সাধনা-চেষ্টা করে জ্ঞান ভাণ্ডারে এসব প্রতিষ্ঠিত করে যুগে যুগে বিভিন্ন সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে এসেছে। জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য এসব জ্ঞান-শাখাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে সুবিন্যস্ত করে রেখেছে ঃ আসলে এসবই বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের আত্মা হলো অঙ্ক এবং আল্লাহ্ অঙ্ককে খুবই ভালবাসেন। একথা আমরা পূর্বে বুঝতে পারিনি। এ হলো সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার।

১৯৭৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ডঃ রশিদ খলীফা কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে কেনানে আল্লাহ্র নিগূঢ় রহস্যমূলক এক বিস্ময়কর সংখ্যাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন।[১]

সম্পূর্ণ কুরআন আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ। যাতে কুরআনের একটা অক্ষরের উপরও মানুষ কোন কালেই হাত দিতে না পারে, সেই ব্যবস্থা আল্লাহ্ স্বয়ং নিপুণভাবে সম্পন্ন করেন। সেজন্য আল্লাহ্ সমগ্র কুরআনকে এমন একটি বিস্ময়কর সংখ্যাতাত্ত্বিক অঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন যে, এর একটি শব্দাক্ষরেরও হেরফের ঘটবার উপায় নেই।

ডঃ রশিদ খলীফা পূর্বে মুসলিম বিশ্ব এই সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানত না। এটাই সত্য এবং স্বাভাবিক কথা।

---

১. কোরানে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মোয়াজ্জম, পৃষ্ঠা ১০৫।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফের সর্বপ্রথম বাক্য 'বিসমিল্লাহি'-র মধ্যে ৪টি শব্দ এবং ১৯টি অক্ষর আছে। এই 'উনিশ' সংখ্যাটি হলো কুরআনের সর্বকালের সংরক্ষরণকারী অতন্দ্র প্রহরী।

'বিস্মিল্লাহ্'-র ৪ শব্দের প্রত্যেকটি কুরআনে যতবার উল্লেখ আছে, প্রত্যেকটির সমষ্টি মোট সংখ্যাকে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়। বেশীও হয় না, কমও হয় না।

যেমন কুরআনে اسم الله শব্দ উল্লেখ আছে ১৯ বার, الله শব্দ উল্লেখ আছে ২৬৯৮ বার। ১৯ দ্বারা ভাগ করলে ২৬৯৮ (১৯ × ১৪২) মিলে যায়। الرحمن ৫৭ (১৯ × ৩) বার। الرحيم ১১৪ (১৯ × ৬) বার।

কুরআনের সর্বপ্রথম বাক্যের (বিস্মিল্লাহ্) ৪টি শব্দ সমগ্র কুরআনে যতবার ব্যবহৃত হয়েছে, ১৯ দ্বারা বিভাগের আওতার বাইরে যেতে পারেনি। এতে সূরার সংখ্যা ১১Ꮥ (১৯ × ৬) বিভাগের অধীন। বিস্মিল্লাহ্ সংখ্যা ১১৪। ১৯ বিভাগের আওতায়।[1]

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হযরত মুহাম্মদ (সা) সূরা তওবায় বিসমিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করতেন না। এজন্য সূরা 'তওবা' বিস্‌বিল্লাহ্ বর্জিত। যদি এই সূরায় বিস্মিল্লাহ্ গ্রহণ করা হতো, তাহলে কুরআনে বিস্মিল্লাহ্‌র ১১৫। ১৯ দ্বারা ভাগ সম্ভব হতো না। হয়ত উনিশের প্রাধান্যের জন্যই আল্লাহ্ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সূরা থেকে বিস্মিল্লাহ্ সরিয়ে নিয়েছেন।

উনিশ-এর উপর আল্লাহ নিজেও জোর দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলছেন, "তা (দোযখের আগুন) গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে, আর তার উপর থাকবে 'উনিশ।'[2]

এখানে উনিশ বলতে কি বোঝায় এবং তিনি কেন উনিশের উপর জোর দিয়েছেন জানি না। কিন্তু এই উনিশের অঙ্ক দিয়েই যে সমগ্র কুরআন শরীফকে আল্লাহ্ বেঁধে রেখেছেন, শুধু এ রহস্যভেদই আমাদের বক্তব্য।

---

১. কুরআনে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মোয়াজ্জম, পৃষ্ঠা ৯০৩।

২. সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত ৩০।

www.pathagar.com

সূরা ক্বাফে ক্বাফ অক্ষরের সংখ্যা ৫৭। এমনিভাবে সূরা আশ-শূরায় ক্বাফের সংখ্যা ৫৭। অথচ এ সূরা-সূরা ক্বাফের চেয়ে আকারে দ্বিগুণেরও বেশি। এই দুই সূরায় মোট ক্বাফের সংখ্যা ১১৪। কুর-আনে সমুদয় সূরার সংখ্যাও ১১৪, যা ১৯ দিয়ে ভাগ করা যায়। যদি ক্বাফ অক্ষরটি কুরআনের প্রতীক হয়ে থাকে তা'হলে এটি তাৎপর্য-পূর্ণ। সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন অক্ষর বিশিষ্ট একমাত্র সূরা মরিয়ম। এর অব্যক্ত বিচ্ছিন্ন অক্ষর আছে পাঁচটি।

ك-ه-ي-ع-ص এই পাঁচটি অক্ষর যথাক্রমে ১৩৭, ১৬৮, ৩৪৫, ১২২, ও ২৬ বার সারা কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে। আলাদাভাবে এই সংখ্যাগুলো ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। কিন্তু ৫টি সংখ্যার যোগফল ৭৯৮ (১৯ × ৪২) ১৯ দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায়।[২]

এই সংখ্যাতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা, এই উনিশ সংখ্যাটি সারা কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি শব্দাক্ষরকে অঙ্কের নিয়মে এমন সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে জড়িয়ে রেখেছে যে, তাতে একটি মাত্র শব্দ বা অক্ষরও যদি কেউ নতুনভাবে যোগ করার চেষ্টা করে কিংবা বাদ দেয়, তবে এই উনিশ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্যের কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে যাবে।

ডঃ রশিদ খলীফা কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র কুরআন শরীফের যাবতীয় অক্ষর বিভিন্নভাবে নির্ভুল গণনা দ্বারা এই সংখ্যাতত্ত্বের বিস্ময়কর রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই উনিশ সংখ্যার অঙ্কের কলাকৌশলে আল্লাহ্ কিভাবে তাঁর মহা-গ্রন্থকে মনুষ্য-হস্তক্ষেপের উর্ধ্বস্তরে রেখেছেন, এও আর এক মুজিযা। সব নবীরই জীবদ্দশায় মুজিযা থাকে। মহানবী (সা)-এর এ-ও হলো একটি স্থায়ী মুজিযা। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে কুরআন শরীফের সমস্ত অক্ষর নির্ভুলভাবে গুণে গুণে ডঃ রশিদ খলীফা আল্লাহ্‌র এই সংখ্যাতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

কুরআন সাহিত্য ও কাব্যগুণে মহাসাগর সদৃশ। কিন্তু ১৯শের

২. কোরানে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মোয়াজ্জম, পৃষ্ঠা ১১৫।

www.pathagar.com

অঙ্কের বাঁধনে আবদ্ধ থেকে গুণে গুণে এ মহাগ্রন্থের ভাব-ভাষা-ছন্দ-অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে রচনা করা কোন মানুষের দ্বারা কখনও সম্ভব নয়।

আমরা বলেছি আল্লাহ্ বিজ্ঞান এবং অঙ্ককে ভালবাসেন। তাঁর রসূল (সা)-ও বিজ্ঞানকে ভালবাসতেন। সেকালের মুসলিম শাসকরাও বিজ্ঞানকে ভালবাসতেন এবং সেই সভ্যতার অনুবর্তী মুসলিম জ্ঞানী-গুণী মনীষী এমন কি জনগণও বিজ্ঞানের অনুরক্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল

আমরা সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব মুসলিম মনীষীর কথা উল্লেখ করেছি, তাঁরা যেমন ছিলেন বৈজ্ঞানিক, তেমনি ছিলেন সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। তাঁদের অনেকেই একদিকে যেমন ছিলেন বৈজ্ঞানিক তেমনি অন্যদিকে ছিলেন কবি এবং তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন সুবিজ্ঞ লেখক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

আল-কিন্দী বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে ২৭০-এর মত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আল-বিরুনী, ইবনে সিনা প্রমুখ বিজ্ঞানী দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, কবিতা, সাহিত্যের উপর শত শত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে সব গ্রন্থের বিশদ বিবরণ দেওয়া এস্থলে সম্ভব নয়। এর মধ্যে একা জাবির ইবনে হাইয়ান খুব ছোট আকারের হলেও ২ হাজারেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই একান্ত নীরস বৈজ্ঞানিকের ২ সহস্রাধিক পুস্তকের মধ্যে কবিতার গ্রন্থও ছিল। এতে বোঝা যায় সেকালে মুসলিম সভ্যতায় যেমন ছিল বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য, তেমনি ছিল সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও কাব্য, দর্শনেও পরম সমৃদ্ধ। এ সভ্যতা ছিল সর্ব জ্ঞান শাখায় সমৃদ্ধ একটি জীবন্ত সভ্যতা। এ সভ্যতার বিকাশ শুরু হয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই এবং একাদশ শতাব্দীতে এই সভ্যতা লাভ করে চরম উৎকর্ষ। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার সূচনা ঘটে ত্রয়োদশ শতকে, তখন বৃটেনই এই সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিল।

কিন্তু আমরা উপরে মুসলিম সভ্যতার যে আমলের কথা আলোচনা করেছি গ্রেট বৃটেনের উচ্চস্তরের কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক যাঁরা স্বনামধন্য ও বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন, তাঁদের একজনের নামও তো সেই যুগের খাতায় দেখতে পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি, অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৃটেন বা ইউরোপের প্রতিভা যুগের খাতাটি

www.pathagar.com

একেবারে শূন্যই ছিল। তখন ইউরোপে ছিল সত্যিকারার্থে অন্ধকার যুগ। আর তখন আরবদের ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ। ইউরোপ নিজেদের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার কৃষ্ণ রং দিয়ে এই সময়ের গোটা মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসের পাতাগুলো মসীলিপ্ত করে দিতে চায়।

ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় গ্রেট বৃটেনকেই ধরা যাক। এই বৃটেনের চতুর্দশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত তেমন কোন জ্ঞানী-গুণীর ইতিহাস নেই অথবা কোন প্রতিভার স্বাক্ষরও খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৩৩০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৪০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে আবির্ভাব ঘটে কবি ল্যাঙ্গল্যাণ্ডের। প্রায় সমসাময়িক মহাকবি চসার ১৩৪০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৪০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কাব্যরসের দ্বারা সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেন। এর পর ১৫৬৪ খৃস্টাব্দ থেকে ১৬১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মহাকবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার দ্বারা বৃটেনে যে বন্যাপ্লাবন সৃষ্টি করেন, সারা বিশ্ব তাতে তরঙ্গায়িত হয়।

এর পর পরই বৃটেনের ইতিহাসে ১৬০৮ খৃস্টাব্দ হতে ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে কবি মিল্টনের উদয়-যুগ। অতঃপর কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), কবি শেলী (১৭৯২-১৮২০), আবেগোজ্জ্বল কবি লর্ড বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪) প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক বৃটেনের কাব্য ও সাহিত্য শক্তিকে বিশ্ব-সেরা শক্তিতে রূপায়িত করেন। এ শুধু আধুনিক সভ্যতার সামনেই নবদিগন্ত খুলে দেয়নি, বিশ্ব সভ্যতাকেও বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

এখন 'ইউটোপিয়া'র লেখক স্যার টমাস মুরের প্রসঙ্গে আসা যাক। তাঁর প্রসঙ্গে বা সমর্থনে কার্ল মার্কস্ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অনেক কথাই বলেছেন। তখনকার বৃটেনের বর্বর শাসকদের জনগণের বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচারের নৃশংস কাহিনীর সত্যিকারের ইতিহাস স্যার টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫) জ্বলন্ত ভাষায় তাঁর 'ইউটোপিয়া'য় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কার্লাইল (১৭৯৫—১৮৮১), ঐতিহাসিক গিবন (১৭৩৭—১৭৯৪), ঐতিহাসিক মেকলে (১৮০০—১৮৫৯) প্রমুখ শুধু বৃটেন বা বর্তমান সভ্যতায় নয়, বিশ্ব সভ্যতায়ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন।

www.pathagar.com

এখানে যে সব বিশ্ববিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও ঐতিহাসিকের কথা উল্লেখ করা হলো, পৃথিবীতে প্রায় সবাই তাদের একান্তভাবে চিনে। এর পর বৃটেনে যে আরও কত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তাঁদের অনন্য প্রতিভায় বিশ্বসভ্যতাকে প্লাবিত করে রেখেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছাড়া তাঁদের প্রসঙ্গ উল্লেখ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মূল বক্তব্য হলো বৃটেনের বা ইউরোপের এইসব প্রতিভার উন্মেষ অভ্যুত্থানের সময়সীমা চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়, বরং পরবর্তী। চতুর্দশ শতাব্দীটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটেন বা ইউরোপে মত প্রতিভার অভ্যুত্থানের বন্যা প্রবাহ শুরু হয়ে গেল, আর এর পেছনের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীগুলো প্রতিভাশূন্য মরুভূমিতে পরিণত ছিল। কেন? তখন বৃটেন বা ইউরোপে কি শেক্সপীয়ার, শেলী, মিলটনের মত সাদা চামড়া বিশিষ্ট লোক ছিলেন না? নিশ্চয়ই ছিলেন কিন্তু সাদা চামড়ার মানুষ থাকলেও শিক্ষা সভ্যতার পরিবেশ তখন ইউরোপে ছিল না। সে ছিল ভয়াবহ রাজকীয় অত্যাচারের ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বর্বর পরিবেশ। জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত হবে কি করে?

জনগণের উপর ইংল্যাণ্ডের ভূস্বামীদের অত্যাচারের রোমাঞ্চকর কাহিনী কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এর ভাষায় বর্ণনা করাই উত্তম।

"১৬৯৮ খৃস্টাব্দে ফ্রেচার স্কর্চ (ইংল্যাণ্ডের) পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, ..." নিজেদের সংস্থান করতে যারা সক্ষম, তাদের সকলকে গোলামে পরিণত করা উচিত।[১]

যাদের ভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে তারা প্রকৃতই নিজেদের ভরণ-পোষণ সংস্থান করতে সক্ষম, তাদের গোলামে পরিণত করার জন্য মিঃ ফ্রেচার স্কর্চ পরামর্শ দেন। এ ধরনের গণবিরোধী ষড়যন্ত্রের ফল সম্বন্ধে মার্কসের ভাষাতেই বলছি:

"ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বের প্রথম বছর ১৫৪৭ খৃস্টাব্দে একটি বিধানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ কাজ করতে আপত্তি করলে, যে লোক সে সংবাদটা জানাবে, তার কাছে গোলাম হিসাবে থাকার দণ্ড

---

১. 'পুঁজির উদ্ভব' (ক্যাপিটাল) মার্কস, ১৬ পৃষ্ঠার টীকা।

www.pathagar.com

পাবে।...... চাবুক আর শেকল দিয়ে তাকে যে কোন কাজ করতে বাধ্য করার অধিকার থাকবে মনিবের, তা সে কাজটা যত জঘন্যই হোক। গোলাম যদি একপক্ষকাল অনুপস্থিত থাকে, তাহলে যাবজ্জীবন গোলামীতে দণ্ডিত হবে এবং তার কপালে বা পিঠে S অক্ষরটি (জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দ্বারা) দেগে দেওয়া হবে। তিনবার সে যদি পালায়, তাহলে দুর্বৃত্ত হিসাবে তার প্রাণদণ্ড হবে ...। কোন ভবঘুরেকে যদি তিন দিন ধরে বিনা কাজে ঘুরতে দেখা যায়, তাহলে তাকে তার জন্মস্থানে নিয়ে গিয়ে তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে V অক্ষর দেগে দেওয়া হবে ......।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ সুখী-সমৃদ্ধশীল লক্ষ লক্ষ কৃষকদের ভূমি থেকে উৎখাত করে, কৃষিখামারগুলোকে করা হলো মেষ চারণভূমি। মেষের পশমের বৃহত্তম যান্ত্রিক কারখানগুলোতে নাম মাত্র মজুরীতে এই সব কৃষককে গোলামে পরিণত করা হলো।

এ হলো ১৫৪৭ খৃস্টাব্দের গণ-অত্যাচারের কাহিনী। এর পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে সে আরও কত ভয়াবহ রোমাঞ্চকর গণনির্যাতন চলছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সমাজের সুস্থসুখী গণ্যমান্য লোকগুলোর জমিজমা কেড়ে নিয়ে ওদের দেহে জ্বলন্ত লৌহ শলাকায় 'স্লেভ' মোহর মেরে কি করে কৃতদাসে পরিণত করা যায়, এ হলো ষোড়শ শতাব্দীর একমাত্র প্রয়াস। তার পূর্ববর্তী ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষ্ণ শতাব্দীগুলো যে গণ-জীবনের জন্য আরও কত ভয়াবহ ছিল, কল্পনা করুন।

জনগণের উপর এই যে ভয়াবহ অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা, যেখানে জনগণের প্রাণ নিয়েই টানাটানি, সেখানে শিল্প সাহিত্যের সাধনা আসবে কোথা থেকে ? এজন্যই চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে বৃটেন বা ইউরোপে প্রতিভার স্বাক্ষর বিরল।

বৃটেন বা ইউরোপের সম্রাটদের এই ধরনের শাসনের তুলনায় সপ্তম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম শাসন ছিল প্রজাকল্যাণে নিবেদিত মনুষ্যত্বের বিকাশময় এক সুসভ্য শাসন। এর সমতুল্য শাসন

২. 'পুঁজির উদ্ভব' (ক্যাপিটাল) কার্ল মার্কস, পৃষ্ঠা ৩২।

www.pathagar.com

ব্যবস্থা সেকালের পৃথিবীর কোন সভ্যতাতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন আমেরিকার অস্তিত্বই কেউ জানত না। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো ছিল একান্ত অনুন্নত, অসভ্য ও কদাচারী।

পক্ষান্তরে তখন আরব সভ্যতা পৃথিবীতে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞানের মহা-প্লাবন সৃষ্টি করেছিল। এই মহাপ্লাবনের তরঙ্গ স্পর্শেই ইউরোপে নব-জাগরণ শুরু হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের সবখাতেই মুসলমানরা ইউরোপের জনক।

যেমন হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালের আলেফ লায়লা বা আরব্য উপন্যাসই হলো বর্তমান সভ্যতার উপন্যাসের জনক। তেমনি ফের-দৌসী, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদী, রুমী ছিলেন চসার শেক্সপীয়ার, শেলী, বায়রন, গেটে, মিল্টন, প্রমুখের জ্ঞানগুরু। বিশেষ করে সে যুগে প্রত্যেকে মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকই কবি ছিলেন। দু'কলম হলেও কবিতা লিখেছেন। মুসলিম সভ্যতার এই তীব্র কাব্যালোক বৃটেন বা ইউরোপে অনুবাদের হিড়িকের যুগে কোন-না-কোন প্রকারেই প্রবেশ করে, বৃটেন তথা ইউরোপের কাব্য সাহিত্যে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। অন্ততঃ নিউটনের আবিষ্কারগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়ামের বিজ্ঞান প্রতিভাকে সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর 'রুবাইয়াত' কাব্যকে ইংরেজীতে প্রচারের জোরে তাঁকে শুধু কবিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্তত তাঁর কবিতার প্রভাব যে ইউরোপে বা বৃটেনে প্রতিফলিত হয়েছে—এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। উল্লেখ্য যে, শেক্সপীয়ারের জন্মের ৫৪৫ বছর পূর্বে ওমর খৈয়াম জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের মুসলিম জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের সাধনা গবেষণাই শুধু ইউরোপে নব জাগরণ এনেছিল, তাদের কাব্যিক ও সাহিত্যিক প্রেরণা কিছুই দেয়নি, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। এভাবে ভ্রমণ শিল্প ও ইতিহাস তত্ত্বে আল-বিরুনী, ইবনে খালদুন, মাসউদী, ইবনে বতুতা প্রমুখ ইউরোপের ইতিবৃত্ত পদক্ষেপের অগ্রপথিক হিসাবে গিবন, মেকলে, কার্লাইল প্রমুখের সৃষ্টির গোড়ায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। অন্ততঃ শতশ ত পূর্বেকার আরব ঐতিহাসিকদেরই এসব পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আদর্শ ও অগ্রপথিক হিসাবে মেনে নিতে হয়। মুসলিম জ্ঞান-সাধকেরা

www.pathagar.com

সারা বিশ্ব মন্থন করে ইতিহাসের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তখনকার অজ্ঞ ইউরোপ ওঁদের কাজ ছাড়া এই জ্ঞান সাধনা শিখবে কোথায়?

ভূগোল জ্যোতিবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। মুসলিম সভ্যতার প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্র থেকে পৃথিবীর মাটি, সাগর, বাতাস, আবহাওয়া, আকার-প্রকার, মাপজোক, জরিপ—কোন কিছুই বাদ দেন নি। মুসলমানেরাই ভূগোলের গোলক ও মানচিত্র তৈয়ার করেন। এমন কি আকাশের তারকাপুঞ্জেরও জটিল ও নিপুণ মানচিত্র তৈয়ার করেন। বর্তমান ভূগোলের যতই উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাক না কেন, মুসলিম সভ্যতার প্রায় সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের প্রাণপণ সাধনাতেই আধুনিক ভূগোল শাস্ত্রের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভূগোল বিজ্ঞানের নির্ভুল প্রতিষ্ঠা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঠিক অবয়ব গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য মুসলিম বিজ্ঞানীরা ভূগোল বিজ্ঞানের উপর জোর না দিয়ে পারেন নি। কখনও মাটিকে বাদ দিয়ে আকাশে উঠা যায় না। বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয় পৃথিবীর মাটি, সাগর, আবহাওয়া ও আকাশতত্ত্ব গবেষণার জন্যই ভূমধ্যসাগরের তীরে তাঁদের গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। শুধু ওঁরাই নন, সমস্ত মুসলিম বৈজ্ঞানিকই জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রয়োজনে ভূগোল বিজ্ঞানের কমবেশী উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। যেমন অঙ্কশাস্ত্রকে বাদ দিলে বিজ্ঞানের কোন শাখার সাধনাই সম্ভব নয়, তেমনি ভূগোল শাস্ত্র বাদ দিলে জ্যোতিবিজ্ঞান সাধনা সম্ভব হয় না। মুসলমানেরা দেশ-মহাদেশ, সাগর, মহাসগর, মাপ-জরিপ শেষ করে শেষমেষ কাবা-শরীফের দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে তাদের বৈজ্ঞানিক অঙ্ক শক্তিকে ব্যবহার করেন। গ্রীকদের চেয়েও আরবদের ভূগোল বিজ্ঞান নিখুঁত ছিল।

ভাস্কো দ্য গামা বিশেষভাবে 'সমুদের সিংহ' আহমদ ইবনে মজিদের কাছ থেকেই ভৌগোলিক জ্ঞানও লাভ করেছিলেন। সাগর, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ, স্থলভূমি ও আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আরবদের উন্নত যন্ত্র ও নির্ভুল তাত্ত্বিক তথ্য ইউরোপের নিকট মহার্ঘ্য ও লোভনীয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে আহমদ ইবনে মজিদ, আরব নাবিক সোলায়মান প্রমুখের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় লিখিত মূল্যবান পুস্তক

www.pathagar.com

থেকেই ইউরোপ প্রথম ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং আরবরা ভূগোল বিজ্ঞানেও ইউরোপের জনক।

এখনকার পৃথিবীতে আমরা যা সহজলভ্য দেখতে পাই, এক সময় তা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দুঃসাহসী মুসলিম নাবিকরাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল আবিষ্কার করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ফলে এক সময়ের অনেকটা ছোট পৃথিবী আজ আমাদের সামনে এত মনোরম ও এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একটা নজীর পেশ করা গেল ঃ

বিশিষ্ট ভূগোলবিদ পাঠক এবং আরব নাবিক সুলায়মান বলছেন, 'সরণ দ্বীপ (সিংহল) সহ বিভিন্ন দ্বীপে বিয়ের কনেকে দেনমোহর হিসাবে প্রদান করতে হয় শত্রুপক্ষের কোন একজনের মাথা। একজন পুরুষ যত খুশী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, যদি প্রত্যেকের জন্যে একটি করে শত্রুর মাথা কেটে এনে দিতে পারে। ·· দ্বীপগুলোতে হাতী পাওয়া যায়, আখও জন্মে। এখানকার অধিবাসীরা নরমাংস খায়।······এখানকার নারী, পুরুষ –সবাই ল্যাংটা থাকে। মেয়েরা গাছের পাতা দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে। '······একটি দ্বীপের নাম আন্দামান। এখানকার লোকেরা ঘোর কালো রং-এর এবং নরমাংস খায়।[১] এতে বোঝা যায় আজ থেকে প্রায় ১১ শত বছর পূর্বে সিংহল এবং আন্দামান—এই দুটি আরব নাবিকরাই প্রথম আবিষ্কার করেন।

৭৩২ হিজরীতে ঐতিহাসিক আবুল খিদার বর্ণনা করেন, 'আবু রায়হান বেরুনীর লেখা এবং নাসিরউদ্দীন তুসীর 'তামারিকা' ছাড়া আর কোনখানে এই সাগর (বেরিং সাগর বা প্রণালী)-এর বর্ণনা পাইনি। তাই আমি আল-বেরুনীর লেখা থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি (বেরুনী) বলেন যে, বেরিং সাগর উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণাংশ থেকে শুরু হয়েছে। এই সাগরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যথেষ্ট। বেরিং নামক একটি গোত্রের লোক এই সাগরের উপকূলে বাস করে।'[২]

---

১. আরব নৌবহর ঃ সৈয়দ সুলায়মান নদভী, অনুবাদে হুমায়ুন খান। পৃষ্ঠা ১৮। ২২৫ হিজরীর সওদাগর, নাবিক সুলায়মানের লেখা থেকে। পৃষ্ঠা ৩—১১, প্যারিস সংস্করণ।

২. তাকলিম আল-বুলদান ঃ পৃষ্ঠা ৩৫।

www.pathagar.com

এই বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয়—আল-বিরুনী ও নাসিরউদ্দীন তুসীর মত পর্যটক ঐতিহাসিক ও ভূগোল-বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর সর্বোত্তর প্রান্তের উত্তর মেরু পর্যন্ত তথ্যানুসন্ধানে ধাবিত হয়েছিলেন। আল-বিরুনী প্রমুখ আরব ভূগোলবেত্তা সর্বপ্রথম বেরিং প্রণালী আবিষ্কার করেন। এই বেরিং সাগরের উপকূলবর্তী ভেরিং সম্প্রদায়ের নামানুসারে যে বেরিং বা ভেরিং সাগরের নাম হয়েছিল, এই তথ্যও আল-বিরুনীর লেখা থেকে প্রকাশ পায়। আবিষ্কার হয়ত তাঁরা পৃথিবীর অনেক দিক দিয়েই অনেক কিছুই করেছিলেন, কিন্তু বেরিং বা ভেরিং আবিষ্কারক হিসাবে আল-বিরুনী মর্যাদা পান নি। তাঁর বহু শত বছর পরে ভিটাম বেরিং নামক জনৈক অভিযাত্রী সাহেবকে প্রথম আবিষ্কারের মর্যাদা দেওয়া হয়। বলা হয়—ঐ অভিযাত্রী সাহেবের নামানুসারেই নাকি বেরিং প্রণালীর নামকরণ হয়েছে। অর্থাৎ সাবেক সম্প্রদায়ের ভেরিং নাম গেল, তাঁদের 'সাগর' গেল, আল-বিরুনীর প্রথম আবিষ্কার তত্ত্ব গেল; টিকে গেল শুধু পাশ্চাত্যের প্রচার মহিমা।

ভূগোল বিজ্ঞানে আরবরা যে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ছিল এবং গ্রীকদের চেয়েও যে শীর্ষস্তরে ছিল, এ সম্বন্ধে একজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি:

ফ্রান্সের মসিয়ে লে-পঁ তাঁর 'সিভিলাইজেশন অব অ্যারাবিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'টলেমি তাঁর আবিষ্কৃত শহরগুলোর বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকখানে ভুল করেছেন। যেমন ভূমধ্যসাগরকে ৪০০ ফার্লং বলে ভুল বর্ণনা করেছেন। ভূগোলের ক্ষেত্রে আরবদের অগ্রগতি যদি গ্রীক অবদানের সঙ্গে যথার্থভাবে তুলনা করা যায়, তা'হলে সে তুলনা থেকে বোঝা যাবে যে, আরবদের গবেষণায় কেবলমাত্র দ্রাঘিমাংশের ক্ষুদ্রতম বিষয়ে সামান্য হেরফের হয়; আর গ্রীকদের দ্রাঘিমাংশের হিসাব ছিল পুরাপুরি ভ্রান্তিজনক। যে সময় কোন নির্ভরযোগ্য ঘড়ি ছিল না, সে সময় দ্রাঘিমাংশ সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানা অত্যন্ত কঠিন ছিল; তাই আরবরা দ্রাঘিমাংশের হিসাবে কিছু ভুল করেছিল, কিন্তু কোনখানেই তাঁদের ভুল দুই ডিগ্রীর বেশী হয়নি, গ্রীকদের ভুলের তুলনায় তাদের ভুল অতি সামান্য। উদাহরণস্বরূপ টলেমি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তানজার অক্ষাংশ দেখিয়েছেন ৫৩°৩০´ কিন্তু সঠিক হিসাব হলো, ৩৫°৪১´ টলেমির হিসাবের সঙ্গে হেরফের হয় ১৮°০ ডিগ্রীর।

www.pathagar.com

তানজা থেকে ত্রিপলী পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের যে পরিমাপ আরবরা দেখিয়েছে, তাতে মাত্র ১° ডিগ্রী হেরফের হয়। টলেমি তাঁর মানচিত্রে ভূমধ্যসাগরকে ১৯° বেশী লম্বা দেখিয়েছেন, যার ফলে ৪০০ ফার্লং হেরফের হয়েছে।

"অনুরূপ ইবনে খালদূন লোহিতসাগরের দৈর্ঘ্য উল্লেখ করেছেন ১৪০০ মাইল। আধুনিক লোহিতসাগরের দৈর্ঘ্য হলো ১৩০০ মাইল। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরবদের পরিমাপ আধুনিক গবেষণার সঙ্গে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ।"[১]

আল-খাওয়ারিজমি ভূগোল বিজ্ঞানীও ছিলেন। তিনি খলীফা আল-মামুনের উদ্দেশ্যে মূল মধ্যরেখা ও পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন। শুধু তাই নয়, ভূ-পৃষ্ঠ-পরিমিতির উপর তিনি গ্রন্থ রচনাও করেন। আল-ফ্রাগানাম পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করেন। খাওয়ারিজমি আকাশ ও ভূমণ্ডলের মানচিত্র প্রণয়ন করেন। তাঁর মানচিত্রের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপের এইচ. ফল জিক প্রাচীন আফ্রিকার মানচিত্র প্রস্তুত করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-মাহানীই আধুনিক গোলকের সৃষ্টিকর্তা। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার ব্যাপারে তাঁর জ্যোতিষ বিজ্ঞান সূত্রগুলো ছিল খুবই নির্ভুল।

বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয় লোহিতসাগরের তীরে পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি সঠিকভাবে নির্ণয় করেন এবং অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা কল্পনা করে কেন্দ্রস্থলের গ্রীন উইচ প্রথম আবিষ্কার করেন।

বৈজ্ঞানিক হোসায়েন জোয়ার-ভাটার উপর বিশেষ গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং আল-বাত্তানী অমাবস্যার সঠিক গণনা আবিষ্কার করেন। আল-হামদানি বিখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানী ছিলেন। 'ইখওয়ানুস সাফা' (গুপ্ত বৈজ্ঞানিক সংঘ) জোয়ার-ভাটা, ভূমিকম্প, গ্রহণ প্রভৃতির বিস্তারিত গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। ভূগোলে

১. সিভিলাইজেশন অব অ্যারাবিয়া : মসিয়ে লে পেঁ। সূত্র, আরব নৌবহর, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬।

www.pathagar.com

অক্ষরেখার পরিমাণ আল-বিরুনী সর্বপ্রথম নির্ণয় করেন। আল-বিরুনীর 'কিতাবুত তাফাহুম' সম্পর্কে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক র‍্যামসে রাইট বলেন, "এই সময়কার সর্বজনসমাদৃত ভূগোল"...... সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল এই গ্রন্থে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবুল ওয়াফা স্বীকার করেন—ইবনে ইউনুস পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ইবনে ইউনুস রাজকীয় সহায়তায় একটি প্রকাণ্ড জিজ ১৮ বছরে সমাপ্ত করেন। তিনি নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের ভূগোল বিজ্ঞানী ছিলেন।

ইবনুল হায়সাম কেবল উচ্চস্তরের ভূগোল বিজ্ঞানী ছিলেন না, ভূগোল বিজ্ঞানের উপর তিনি ৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। আল-কারখি ভূগোল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নাসিরউদ্দীন তুসী ভূগোলেও উচ্চস্তরের গবেষক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক কাযবীনিও ভূগোল শাস্ত্রের উপর তথ্যমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক হাসান মাররাকুশী ভূগোল শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন।

আধুনিক সভ্যতার শত শত বছর পূর্বেকার মুসলিম সভ্যতার উচ্চস্তরের ভূগোল বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে এই সামান্য পরিচয় প্রদানের দ্বারা হয়ত একথা আর অপ্রমাণ থাকে না যে, মুসলিম বিজ্ঞানীরাই বর্তমান ভূগোল-বিজ্ঞানেরও জনক।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যুক্তিভিত্তিক

ন্যায়, সততা, নৈতিকতা প্রভৃতিকে ভিত্তি করেই মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। অন্যায়, মিথ্যা, শঠতা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেনি। নাস্তিকদের জন্য সর্বদাই ন্যায়-নীতির যে কোন ধর্মবাদী সরল-সোজা পথ বিপদজনক। সমাজের সকলের জন্যই যে গৃহ অবাধ—মুক্ত, সেই গৃহে অপরাধী ঢুকলে সে নিজেকে পলায়নপ্রবণ গৃহবন্দী মনে করবে এবং সমাজের সবাই তাকে বিপজ্জনক মনে করবেই। এ হলো অপরাধীর কৃতকর্মেরই পরিণতি মাত্র। ভাঙ্গা বেড়া ছাড়া কোন সময়ই তার জন্য বড় দরজা নিরাপদ নয়। তার কাছে সততার মর্যাদা আশা করা বাতুলতা মাত্র। সে জানে সে বিশ্ব-অসহায়। তার আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন থাকবে নিজ বাহুবল আর ডেগার! নৈতিক বল যার থাকে না, পশুশক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া তার আর উপায় থাকে না।

এখন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের আলোচনায় আসা যাক। আল্লাহ্ কখনও বিশ্বাসের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। এ সম্বন্ধে ডঃ অনড্র কনওয়ে আই. ভি. বলেন, "যুক্তি-বহির্ভূত ধর্মীয় বিশ্বাস সকল সময়ই খারাপ চরিত্র আর মন্দ স্বভাবের জন্ম দিতে বাধ্য।"[১] সুতরাং আমরা আল্লাহ্ প্রসঙ্গ কেন, জীবনের যে কোন সিদ্ধান্তে যুক্তির উপর ভিত্তি করে চলতে চাই। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলেই তাঁর সৃষ্টিতে আসতে হয়।

---

১. ডঃ অনড্রে কনওয়ে আই.ভি. পি. এইচ. ডি. এমডি. এফ-এ-সি, পি শরীর বৃত্তবিদ ঃ ডঃ আই. ভি. বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আমেরিকান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে বহু সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি এ পর্যন্ত ১৩১০ টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

দুটি প্রশ্ন—১. এই মহা প্রকৃতি বা মহাবিশ্ব কি করে এবং কে তৈয়ার করলেন? প্রস্তুতকারক যদি আল্লাহ্ হন, তাহলে তাঁকে কে তৈয়ার করেলেন? বলা হয়ে থাকে—আল্লাহ্ প্রমাণের বিষয় নয়, বিশ্বাসের বিষয়। অথচ ডঃ আই. ভি প্রমাণহীন বিশ্বাস নিকৃষ্ট কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং আমরা বিশ্বাসকে প্রমাণের ভিত্তিতেই দাঁড় করাতে চাই।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াব হলো: মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি প্রস্তুতকারক ছাড়া কোন সৃষ্টিই হতে না পারে, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। স্রষ্টা ছাড়া এই বিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে, এপিকিউরাস থেকে আরম্ভ করে কার্লমার্কস পর্যন্ত কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। সৃষ্টির স্রষ্টা কে অথবা বস্তুর প্রস্তুতকারক কে—এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বস্তুবাদকে সমর্থন অযৌক্তিক। সৃষ্টির স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেও বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক যথার্থতা প্রমাণ প্রচেষ্টাও অনুরূপ অযৌক্তিক।

কার্লমার্কস যে নাস্তিক ছিলেন, একথা সগর্বে লেনিনও স্বীকার করেন এবং ডঃ আই. ভি. বলেন, (আল্লাহ্র অস্তিত্বকে) "……… অস্বীকার করেছেন নাস্তিক কার্ল মার্কস আর লেনিন। কিন্তু নাস্তিকরা কোন দিন তাদের অস্বীকারের পক্ষে যুক্তিস্বরূপ কোন কিছু পেশ করতে পারেন নি।[১]

সৃষ্টি আছে স্বীকার করে, স্রষ্টা অস্বীকারের কোন যুক্তি তাঁরা কোন দিন পেশ করতে পারেন নি।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ আছেন—এর পক্ষে অজস্র যুক্তি পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু নাস্তিক্যবাদীরা 'আল্লাহ নাই'-এর পক্ষে এ পর্যন্ত একটিও প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি।

নাস্তিকদের হাতে প্রমাণ না থাকলেও মুখে তাদের কথার ফুলঝুরি আছে। তারা বলেন, বহু পরমাণু একদা সমবেত হয়ে এই মহাবিশ্ব অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই প্রমাণটিতে যুক্তির লেশমাত্রও থাকতে

---

১. আল্লাহ্র অস্তিত্ব: জন ক্লোভার মনজমা, পৃষ্ঠা ২১১, অনুবাদ—সৈয়দ রেদুওয়ানুর রহমান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

www.pathagar.com

পারে না। অথচ যুক্তিহীন এই দর্শনের উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এই নাস্তিকতাবাদ।

এ সম্বন্ধে এডমণ্ড কার্ল কর্নফেল্ড[১] বলেন, "প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যাবিদ অধ্যাপক এডুইন অনেকবার বলেছেন, 'দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সম্ভাবনার সঙ্গে ছাপাখানার এক বিস্ফোরণের ফলে সংক্ষিপ্ত একটি অভিধান প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনার তুলনা করা যেতে পারে।' আমি কোন প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচ ছাড়াই তাঁর এ উক্তির সঙ্গে একমত।'

অর্থাৎ কোন উন্নত স্তরের ছাপাখানার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিস্ফোরণে মহা অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার মধ্যে অকস্মাৎ একটি সুন্দর অভিধান ছাপা ও প্রকাশ হয়ে গেল। এ যদি অতি অসম্ভব কথাই হয়, তাহলে কোন আদি মহাশক্তি ছাড়াই অকস্মাৎ এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার যুক্তি আরো অবাস্তব ও অসম্ভব নয় কি?

বৈজ্ঞানিক এডমণ্ড কার্ল কর্নফেল্ড আরো বলেন, 'গবেষণাগারের শত জটিলতার মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা নিয়ে আমি যখন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সর্বদাই আমি আল্লাহর অপরিমেয় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছি। পশুর দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যে জৈবিক ও জীব রাসায়নিক কার্যরত প্রক্রিয়াসমূহ এতই জটিল যে, সেখানে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া বা রোগের অনুপ্রবেশ একেবারেই বিচিত্র নয়। এত জটিল যান্ত্রিকতা যে কখনও সঠিভাবে কাজ করতে পারে, এ দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় (এবং) সবকিছুর একজন পরিকল্পক ও অসীম বুদ্ধিদীপ্ত রক্ষাকর্তার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। ··· মানুষের তৈরী সহজতম যান্ত্রিকতায় একজন পরিকল্পক ও একজন প্রস্তুতকারকের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে এর চেয়ে দশ হাজার গুণ জটিল মেকানিজমের প্রয়োজন, তা সম্পূর্ণ নিজে থেকে সৃষ্ট হয়েছে এবং নিজে থেকে বর্ধিত হয়েছে—এ কথা চিন্তা করা আমার সম্পূর্ণ ধারণাতীত।'

নাস্তিকদের মতে, মানুষ একটি বস্তু মাত্র। তার মনমানসিকতা ইত্যাদি এ সবই নাকি বস্তু। আত্মা বলতে কিছুই নেই। ইঞ্জিন নামক

১. 'এডমণ্ড কার্ল কর্নফেল্ড, রিসার্চ কেমিস্ট। টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়, এম. এ.; পি. এইচ. ডি., হার্ভাড' বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ফলে যেমন গাড়ি চলে, তেমনি বস্তুদেহের শক্তির প্রতিক্রিয়ায় যন্ত্রের মতই বস্তুদেহটি চলে থাকে। এতে আত্মা বা আল্লাহ্‌র সম্পর্কের কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। ওই যে ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি, যাকে দেখলে সত্যি মায়া লাগে, এই মুহূর্তে যদি ছেলেটিকে ধরে চাবুক দিয়ে আঘাত শুরু করি, তাহলে অবশ্যই সে চিৎকার করে কান্না ও আর্তনাদ শুরু করবে। কিন্তু এই চাবুকটি দিয়েই যদি একটি ইঞ্জিনকে সারাদিন পিটাই তাহলে ইঞ্জিনটি একটুও কাঁদবে কি? এর দ্বারাই মানুষকে বস্তু প্রমাণের যুক্তির স্থান বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। তবু জন্মান্ধের নিকট কোন দিন সূর্য বা কোন জিনিসের চেহারা দেখানো বা প্রমাণ করা কখনও সম্ভব হয় না।

আল্লাহ্‌র ভাষায়, তিনি এমন কতগুলো মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যারা চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখে না, কান থাক সত্ত্বেও শোনে না। তাদের দলে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন। ওরা কোন দিন পরিবর্তন হবে না। তবু আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নাস্তিকরা আল্লাহ্ এবং আত্মাকে অস্বীকার করে মানুষের মনকে, হৃদয়কে, আবেগকে।

অথচ হৃদয়ের যে কি অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্য এ সম্বন্ধে একজন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও সার্জেন্টের মত উল্লেখ করা হলো। পল আর্নেস্ট এ্যাডলফ[১] বলেন, (একটি হাসপাতালের সম্পূর্ণ আরোগ্য এক রোগিণীকে ডিস্‌চার্জ করা হয়েছিল। সে মুহূর্তে রোগিণী তাঁর মেয়ের কাছে জানতে পেলেন জামাতার অস্বীকৃতির জন্য তিনি আর তাঁর মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারবেন না। তাহলে তিনি যাবেন কোথায়? এই প্রশ্নে মন ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে সার্জেন্ট-বিজ্ঞানী নিম্ন অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

---

১. পল আর্নেস্ট এ্যাডলফ, এম. এস. সি. এম. ডি. পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, চীনের সেন্টজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমীর অ্যাসোসিয়েট, রিটায়ার্ড লেঃ কর্নেল, মেডিক্যাল কোর, ইউ. এস. আর্মি চিকাগো মিশনারী মেডিক্যাল অফিসের ডিরেক্টর, বহু মেডিক্যাল মিশন সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রণেতা।

www.pathagar.com

'এ ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর আমাকে বুড়ী ভদ্র মহিলার শয্যার পাশে ডাকা হলো। আমি গিয়ে দেখলাম তাঁর সাধারণ শারীরিক অবনতি ঘটেছে। তারপর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তিনি মারা গেলেন, কোমড়ের হাড় ভাঙ্গার জন্য নয়, মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হলো।...তাঁর কোমড়ের ভাঙ্গা হাড় জোড়া লেগেছিল, কিন্তু তাঁর ভাঙ্গা হৃদয় কোনক্রমেই জোড়া লাগেনি।'

মিঃ আর্নেস্ট এ্যাডলফ বলেন, 'তার ভাঙ্গা হাড়ের দুটি প্রান্ত জোড়া লেগেছিল, তাঁর কোমড়ের হাড় শক্ত হয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি আরোগ্য লাভ করেন নি কেন? তাঁর আরোগ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন ছিল, তা ভিটামিন নয়, তাঁর ভাঙ্গা হাড় জোড়ানো নয়, তাঁর প্রয়োজন ছিল আশার। সে আশা যখন চলে গেল, তখন আরোগ্য লাভের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।'

মন জীবনের জন্য কত প্রয়োজন? সেই মনকে ব্যাপক পদদলিত করা কত বিপজ্জনক অমানুষিকতা?

এই মন সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) বলেন, 'মানুষ যদি নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে আর সারা পৃথিবী তার বিনিময়ে লাভ করে, তাহলে কি লাভ হবে?

ডঃ পল আর্নেস্ট এ্যাডলফের মতে, মন বিজ্ঞানানুযায়ী 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে রয়েছে, অপরাধ, প্রতিহিংসা (ক্ষমা না করার প্রকৃতি) ভয়, উৎকন্ঠা, হতাশা, সিদ্ধান্তের অভাব, সন্দেহ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ও বিরক্তি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে, মনচিকিৎসাবিজ্ঞানী আবেগের বিশৃঙ্খলা সম্পর্কিত রোগ নিরূপণে যদিও ঠিক পথে অগ্রসর হন, কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম হন। তার কারণ হচ্ছে, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের ব্যাপারটি একেবারে বাদ দিয়ে থাকেন।

এই বিজ্ঞানীর মতে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আত্মা এবং আত্মার সঙ্গেই মানব জীবনের মানবিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সবকিছু জড়িত।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আত্মা অবমাননা সম্পর্কে আরো কঠোর মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'যে মানুষ নিজের এবং সেই

www.pathagar.com

সঙ্গে অন্যান্য জীবের জীবনকে অর্থহীন বলে বিবেচনা করে, সে শুধু হতভাগ্য, তাই নয়, অধিকন্তু তার জীবনের কোন মূল্যও নেই।'

এই যে আত্মা অস্বীকার বা অবমাননার বিরুদ্ধে মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানী কণ্ঠের এত প্রতিবাদ ধ্বনি, তবু নাস্তিকরা এ ব্যাপারে মোটেই কর্ণপাত করে না কেন? কারণ, আত্মা স্বীকার করলেই যে এই বস্তু-জগত বা মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে মেনে নিতে হয়। কুতর্কের আর মোটেই অবকাশ থাকে না।

এই অর্থহীন যুক্তির বিরুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ আই. ভি.ও বলেন, 'আকস্মিকভাবে এর (মহাবিশ্বের) উৎপত্তি ঘটেছে 'একথা বিশ্বাস করা মেঝে পানি ছড়িয়ে দিলে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী হতে পারে একথা কল্পনা করার চাইতে অতি মাত্রায় অবাস্তব।'

এই অযৌক্তিক বিশ্বাস অর্থাৎ নাস্তিকতা আঁকড়ে ধরে রাখা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে ডঃ আই. ভি. বলেন, 'মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত ধারণার অভাব ঘটলে, তার ফলে নৈতিক অপরাধ ও নৃশংসতা দেখা দেয় এবং তা 'উন্নত ক্রম' সম্পর্কিত মতবাদ ও রাষ্ট্রই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের একমাত্র উৎস, এই উক্তিকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করা।'

ডঃ আই. ভি. আরো খোলাখুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, 'যদি কোন একটি মানুষ একটি রাষ্ট্রের জীব হয়, তখন কি করে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকতে পারে? যদি মানুষের তৈরী আইনই মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের একমাত্র উৎস হয়, তাহলে নাৎসীগণ কর্তৃক কেন য়াহুদী, জিপসী, পোলিশ ও রাজনৈতিক শত্রুদের হত্যা করার কাজকে অন্যায় বলে দোষারোপ করা হয়ে থাকে?'

দূরদর্শী ডঃ আই. ভি. সমাজতান্ত্রিক নাস্তিক শিবিরেরই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পরোক্ষ ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী তাঁর নিজেরস রকারের সমালোচনা করে বলছেন, 'ক্রমশঃ মার্কিন গণতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হচ্ছে এবং এতে এর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্য (জগত) বিশ্বমানবীয় অধিকারের ঐশী সূত্রকে অস্বীকার করে মানবীয় অধিকারের সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হচ্ছেন।'

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতা-নাস্তিক্যবাদেরই রয়েল এডিশন। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম ও ঐশীবাদ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য জগত সমাজতন্ত্রেরই পরিবেশ সৃষ্টি করে আত্মঘাতী পথে বোকার মত এগিয়ে চলছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতা আত্মা বা আল্লাহ্ অস্বীকারের প্রাথমিক ভূমিকা মাত্র। মানব দেহ যদি শুধু বস্তু ছাড়া আর কিছুই না হয়, তাহলে মানব মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিকে কি করে বস্তু বলা যেতে পারে? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মেরিন স্ট্যানলী কংডন [১] বলেন, আমার ছাত্রদের কাছে আমি একটি চিন্তার 'যথার্থ' রাসায়নিক ফর্মুলা কি হতে পারে, জানতে চেয়েছি। জিজ্ঞেস করেছি, ঠিক কত সেন্টিমিটার চিন্তার দৈর্ঘ্য, কত গ্রাম এর ওজন, কি এর রং, কেমন গঠন বা আকার, কি এর প্রচ্ছন্ন চাপ বা অভ্যন্তরীণ টান। 'এর কর্মক্ষেত্র এবং এর অবস্থান বা দিক, আর চলার শক্তিই বা কি?'

মানবদেহের এই চালিকা শক্তি চিন্তার এই গঠন অধিবিদ্যার কোন প্রশ্নেরই উত্তর থাকতে পারে না। সুতরাং মানবদেহ কখনও নিকৃষ্ট বস্তু হতে পারে না।

এখন দেহ কি করে বস্তু হতে পারে, তা আলোচনা করা যাক। দেহ গঠনেও আমিষ বা প্রোটিন উপাদান অপরিহার্য। দেহটাকে দেখতে স্থূল দৃষ্টিতে বস্তুর মত দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে বস্তুর পরিবর্তে আল্লাহ্ত্বের সর্বময় উপাদানেই মানবদেহ গঠিত। এসব বিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিকের ভাষাতেই বলা দরকার। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক এ্যালেন[২] বলেন, 'আমিষ উপাদানগুলো (প্রোটিন) সকল জ্যান্ত জীব-কোষের অপরিহার্য উপাদান এবং পাঁচটি মূল উপাদান অংগারক, উদযান, যবক্ষার-যান, অম্ল জান এবং গন্ধক নিয়ে গঠিত। সেই সঙ্গে সম্ভবত অতীব ভারী একটি অণুতে ৪০,০০০ পরমাণু থাকে। ·· ···

---

১. অধ্যাপক মেরিন স্ট্যানলী কংডন, পি. এইচ. ডি.; এম. সি. ডি. ওয়েব স্টার বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্টন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিক।

২. অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক এ্যালেন. এম. এ.; পি. এইচ. ডি., কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, জীব ও পদার্থ বিজ্ঞানী, কানাডার স্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

www.pathagar.com

'কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে আমিষ উপাদানগুলি প্রাণহীন। যখন রহস্যজনক প্রাণ এই উপাদানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখনই তারা জীবিত হয়। এইরূপ (মৃত) অণু যে প্রাণের আধার হতে পারে ··· একমাত্র আল্লাহ্ পারেন অণু সৃষ্টি করতে ··· এবং জীবন্ত করে রাখতে।'

অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক এ্যালেন আমিষের জীবন্ত অণু সৃষ্টি যে অকস্মাৎ বা মানুষের দ্বারা অসম্ভব, সে-সম্পর্কে একটি হিসাবও পেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমিষ উপাদানের একটি অণু সৃষ্টি করার জন্য যে পরিমাণ পদার্থ নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন রয়েছে, তার পরিমাণ সমগ্র বিশ্বের পরিমাণ অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণ বেশি। তার পর একমাত্র এই পৃথিবীতে অনুরূপ একটি অণু সৃষ্টি হতে বহু বহু—প্রায় সীমাহীন লক্ষ কোটি (১০.২৪৩) বছরের প্রয়োজন হবে।'

অধ্যাপক জে. বি. লেথস (ইংল্যাণ্ড) বলেন, 'একটি মামুলী আমিষ উপাদান সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, তাকে লক্ষ লক্ষ উপায়ে একত্রিত ($১০^{৪৮}$) করা যেতে পারে। কিন্তু আমিষ উপাদানের একটি মাত্র অণু সৃষ্টি করার জন্য এসব সুযোগের যুগপৎ মিলন ঘটানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।'[১]

তাহলে এসব বৈজ্ঞানিকের যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বোঝা গেল যে, জীব দেহগুলোও আল্লাহ্র ধারণাতীত কুদরতের দ্বারাই গঠিত। দেহ-শুধু কাঠ-পাথরের মত গঠিত কোন বস্তু নয়।

অধ্যাপক মেরিন স্ট্যানলি কংডন বলেন, 'অধুনা বিজ্ঞানের চোখে আল্লাহ্কে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।'

জন ক্লীভল্যাণ্ড কথর‍্যান[২] বলেন, 'সামগ্রিকভাবে এ বিশ্ব সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা নাকি জানা রয়েছে, কৌশলী এবং পরিজ্ঞাত বিবেচনা দ্বারা তৎসম্পর্কে একথাই প্রকাশ পায় যে, উক্ত বিবেচনার অবশ্য যথা তথ্যের

---

১. আল্লাহ্র অস্তিত্ব ঃ জন ক্লোভার মনজমা, পৃষ্ঠা ১২।

২. অধ্যাপক জন ক্লীভল্যাণ্ড কথর‍্যাল, পি.এইচ-ডি. কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক; গাণিতিক রাসায়নিক।

www.pathagar.com

তিনটি প্রধান জগতকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই তিনটি জগত হচ্ছে ঃ জড় (পদার্থ), বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত (মন) এবং আধ্যাত্মিক (আত্মা) জগত।'

বিশ্বের অন্যতম প্রধান পদার্থবিদ লর্ড কেলভিন বলেন, 'আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্'তে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।'

জন ক্লিভল্যাণ্ড তাঁর গবেষণায় কেবল জীবদেহ নয়, স্থবির পদার্থের উপরও আল্লাহ্র কুদরতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বলেন, 'এই গবেষণায় অতীতে বারংবার এ-ই প্রতীয়মান হয়েছে এবং এখনও এ-ই দেখাচ্ছে যে, অনুভূতিহীন জড় পদার্থেরও আচরণ পর্যন্ত আদৌ লক্ষ্যহীন নয়। 'আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির ইবনে হাইয়ানের অভিমতও অনুরূপ। বরং আরও স্পষ্ট ঃ তিনি বস্তুকে অধিকতর প্রাণময় বলে প্রমাণ করেছেন।

আল্লাহ্র অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কেবল নাস্তিকগণ নন, পাশ্চাত্যের কোন কোন শাসকও আল্লাহ্র আইনের শাসনের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী মানব শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। এই উভয় শিবিরের বিরুদ্ধে ডঃ আই. ভি আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে মন্তব্য করেছেন যে, মার্কস্-লেনিন নাস্তিক শিবিরের লক্ষ্য হচ্ছে 'পুঁজিবাদ' ও নাস্তিকতা ধ্বংস করা এবং এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং সকল প্রকার নৃশংসতাকে তাদের নীতি বলে মনে করে। পুঁজিবাদ নিশ্চিহ্ন হলে আল্লাহ্কে ঘিরে মানুষের যে সকল নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা জন্মেছিল, তা মানুষ ভুলে যাবে এবং তখন হবে এটি একটি নতুন নশ্বরতার শ্রেণী বা রাষ্ট্র।'

তিনি তাঁর স্বদেশের শাসকদেরকেও সমালোচনা করে বলেন, 'খৃস্ট-ধর্মের আধ্যাত্মিক মূলধন ও ফল আসল বৃক্ষ মূল কেটে ফেললে অথবা বিনষ্ট করলে অথবা অকর্ষিত অবস্থায় রাখা হলে কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না।'

অর্থাৎ এমনি ধর্মনিরপেক্ষতার কসরৎ অধিককাল চলতে দিলে নাস্তি-কতার অগ্নিপ্রবাহে পাশ্চাত্য সভ্যতাও জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আধুনিক এই মহাবিজ্ঞানী এরূপ ধ্বংসাত্মক আশঙ্কার সঙ্কেতই জ্ঞাপন করেছেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, মুসলিম মনীষী আল-বিরুনী, ইবনে সিনা, আল-কিন্দী, ইবনে রুশদ প্রমুখ একদিকে বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈজ্ঞানিক, অন্যদিকে এরিস্টটলের সমতুল্য প্রায় সবাই জাঁদরেল দার্শনিক। এঁদের সম্মুখে নাস্তিকতাবাদীদের কথা বলবার বা মাথা তুলবার সাধ্যই ছিল না। মাথা তুলতে চাইলেও ইসলামী দর্শনের প্রবল প্রবাহে ওরা শুধু যে ভেসেই যেত, তাই নয়, শাসকরাও এদের শক্তি চূর্ণ করে দিতেন। মাজদাকী, জিন্দিক প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদীদের ইতিহাস এর প্রমাণ।

বস্তুত মুসলিম সভ্যতায় ৯২২ বছর নাস্তিকরা মোটেই প্রশ্রয় পায়নি। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার কয়েকশত বছর যেতে না যেতেই নাস্তিকতার আগ্রাসন ব্যাপকতর হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় পাশ্চাত্য যেমন একবার মুসলিম সভ্যতা ও বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছিল, এখন আবার ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনকে সর্বশক্তি দিয়ে পুনরুদ্ধার করে তুলে না ধরলে নাস্তিকদের করাল কবল থেকে ভবিষ্যৎ বিশ্বের পরিত্রাণ নেই। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন বড় একপেশে, সংকীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ।

এজন্য এডওয়ার্ড লুথার কেমেল[১] দুঃখ করে বলেন, 'এ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় (যে) একজন ভাল বৈজ্ঞানিক সব সময় ভাল দার্শনিক হন না। অনেকে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয় খুব অস্পষ্ট চিন্তা করেন। আবার অনেকে আছেন, যারা এই মহাবিশ্ব আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে—এমনি একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে আসছেন।'

তিনি স্বয়ং দার্শনিক হিসাবে দর্শনের প্রাঞ্জল সংজ্ঞায় পৃথিবীকে বুঝতে না পারলেও বিজ্ঞানের ভাষাতেই মহাবিশ্ব আদিস্রষ্টা ছাড়া অকস্মাৎ সৃষ্টির মত একটা আজগুবি ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ সত্যটি প্রকাশ করে বলেন, 'অবশ্য আল্লাহ বা তাঁর মত একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোন ক্রমেই এমন একটি (বিশ্বসৃষ্টি) সম্ভব নয়।'

---

১. 'এডওয়ার্ড লুথার কেমেল, পি. এইচ. ডি., ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সানফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণীতত্ত্ববিদ ও কীটপতঙ্গবিদ।

www.pathagar.com

বিশেষভাবে একদিকে জীবন সম্পর্কে নাস্তিকদের অচেতনতা এবং অন্যদিকে আস্তিকদের সচেতনতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তাঁর (মানুষের) নিজের আয়ুষ্কাল চলমান মহাবিশ্বের অসীমতার মাঝে যে এক সেকেণ্ডেরও নিরতিশয় ক্ষুদ্র সময়ের সমান, সে সম্বন্ধে তাঁরা (আস্তিকরা) সচেতন।'

তাঁর গবেষণার সত্যিকারের ফল সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "প্রতিটি আবিষ্কার, আল্লাহ্ সম্পর্কে সাধনার আরও অতিরিক্ত অর্থ এবং তাৎপর্য—দুই-ই বৃদ্ধি করে।"

স্রষ্টাহীনভাবে এই মহাবিশ্ব হঠাৎ সৃষ্টি হয়ে গেল, এই আজগুবি যুক্তির বিরুদ্ধে অধ্যাপক থমাস ডেভিস পার্কস[১] বলেন: "আমি বিশ্বাস করি না—আকস্মিকভাবে ও ভাগ্যক্রমে পরমানুর একত্রিত হওয়ার ফলে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার চারদিকে তারা বিরাজ করছে। তার কারণ হিসাবে মনে করি পরিকল্পনার জন্য মনীষার প্রয়োজন আর সেই মনীষাকেই আমি আল্লাহ্ বলে অভিহিত করি।"

আকাশে স্পুটনিক উড়লে, এ্যাটম বোমার প্রলয়কাণ্ড দেখলে, চাঁদে পদার্পণ করলেই আমরা আত্মহারা হয়ে যাই, এই হয়ত আল্লাহ্র রাজত্ব দখল করা হয়ে গেল। অথচ নাস্তিকরা একবারও ভেবে দেখে না যে, এরূপ লক্ষ-কোটি পৃথিবী দিয়ে আল্লাহ্ মহাবিশ্ব তৈরী করেছেন। এর বিরুদ্ধে যাবতীয় কুতর্ক অচল করে দিয়ে অধ্যাপক পলক্লারেন্স ইবারসোল্ড[২] বলেন, "বিজ্ঞান……ছায়াপথ, নক্ষত্র, সব কয়টি গ্রহ এবং পরমানু সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করতে পারে, কিন্তু কোথা থেকে এই সৃষ্টির জন্য জড় পদার্থ আর শক্তি এসেছে, কেনই মহাবিশ্ব এমনিভাবে গঠিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, সে বিষয়ে কোন ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানের জুটবে না।"

---

১. অধ্যাপক থমাস ডেভিস পার্কস, পি. এইচ. ডি., ইলিনিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ কেমিস্ট।

২. পলক্লারেন্স ইবারসোল্ড, এম. এ.; পি. এইচ. ডি., ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণ পদার্থ বিজ্ঞানবিদ।

www.pathagar.com

অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বৈজ্ঞানিক মারলিন বুক্স ক্রীডার[1] বলেন, "সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

আল্লাহ্‌কে যে অস্বীকার করে, তাদের মস্তিষ্ক অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। এটা তাদের অল্পবিদ্যার দৌরাত্ম্য। এ সম্বন্ধে ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন বলেন, "সামান্য দর্শনজ্ঞান মানষকে নাস্তিকতার দিকে টেনে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শন জ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।"

কিন্তু মিঃ বেকনের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। বিদ্যার অগভীরতা বাদেও, পণ্ডিত-মূর্খ নামে একটা শ্রেণী আছে, এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। রোগটা এদের মনের মধ্যে। এ রোগ কোনদিন আরোগ্য হয় না। এমনি একজন বিশ্ববিখ্যাত নাস্তিক দার্শনিকের কথা উল্লেখ করতে পারি। সেই দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "মানুষের জন্ম, তার বৃদ্ধি, তার আশা ও ভয়, তার ভালবাসা ও বিশ্বাস, শুধুমাত্র পরমানুর আকস্মিক বিন্যাস বৈ আর কিছু নয়।......সকল বয়সের সকল শ্রম, সকল একনিষ্ঠতা, সকল প্রেরণা, মানব প্রতিভার মধ্যাহ্নের ঘরদীপ্তি সবই সৌর জগতের বিশাল মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হতে বাধ্য।"[2]

সৌর জগতের বাতির তেল মানবজাতি লোপ পেয়ে যাওয়ার অনুকূলে যে নিঃশেষ হয়ে আসছে, এ ধারণাও অনুরূপ মনোরোগীদের দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। অর্থাৎ নাস্তিক অর্থই নৈরাশ্যবাদী। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ ইরভিং উইলিয়াম নবলচ[3] বলেন, 'কিভাবে

---

১. মারলিন বুক্স ক্রীডার, এম. এস-সি., পি. এইচ. ডি; মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, শরীর বৃত্তবিদ।

২. আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, অনুবাদে সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, পৃষ্ঠা ৭৬।

৩. ডঃ ইরভিং উইলিয়াম নবলচ, পি. এইচ. ডি, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, (অধ্যাপক) ও বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৃতি বিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

পরমানু আর অণু প্রাণ সৃষ্টি করার জন্য একত্রে মিলিত হয়েছে, ... বিজ্ঞান কিছুতেই তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না।'

অধ্যাপক ডঃ নবলচ আরো বলেন, 'সকল বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞানকে সর্ব শক্তিমান মনে করেন না ... বিজ্ঞান জীবনকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আল্লাহ্ আছেন বা আল্লাহ্ নেই—বিজ্ঞান এর কোনটাই প্রমাণ করতে পারে না। ... বিজ্ঞান থিওরীগুলোর বাস্তবতা ও সততায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে; বিজ্ঞানের পরীক্ষা যতই অগ্রসর হয়, ততই সেগুলো আলেয়ার মত দূরে সরে যেতে থাকে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধি ও তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে অনিপুণভাবে নির্মিত আমাদের সব যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে গঠিত।'

বস্তুবাদই বলা হোক বা মহাপ্রকৃতির বস্তুজগতই বলা হোক, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রমাণের গর্বে শক্তিমান বলে ডঃ নবলচ মনে করেন না। তিনি বলেন, 'বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও ধর্ম একই ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।'

ডঃ নবলচের এই ব্যাখ্যাকে আরও সম্প্রসারিত করে দিয়ে মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক মিঃ অলিভার ওয়েণ্ডেল বলেন, 'জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে, বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ভ্রূকুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সঙ্গে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তোলে।'

আকস্মিক মহাবিশ্ব প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত বহু যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। শুধু এ কথার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে যে, স্রষ্টা ছাড়া অকস্মাৎ মহাসৃষ্টি কেন, একটি কচু গাছেরও জীবন্ত পরমাণু হঠাৎ প্রস্তুত হয়ে যাওয়া অসম্ভব। মহাবিশ্বের জড়জগত মহা চেতনা বা প্রাণময় মহা আইনের নিয়মে আবদ্ধ। বিশ্ব রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির ইবনে হাইয়ানের মতটিই সর্বতো সত্য। মহাবিশ্বের সব জড় পদার্থই আত্মা এবং মৃতদেহরূপে গঠিত।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে বিশ্ব বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডঃ অসকার লিও ব্রউয়ার সরাসরি বলেন, 'নাস্তিকতার অর্থ হচ্ছে, দ্বন্দ্ব (ঝগড়া) আর যুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি এর কোনটিই চাই না। থিওরী হিসাবে আমি নাস্তিকতাকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করি। বাস্তব দিক থেকে আমার মনে হয়, এ মারাত্মক ক্ষতিকর।'

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জর্জ আর্ল ডেভিস[২] বলেন, 'পারস্যের মহান জ্যোতির্বিদ ও কবি ওমর খৈয়াম তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রুবাইয়াতে সৃষ্টির এই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কে অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, মহাবিশ্বের অবঘাতনের মূলে বিশ্বের অতীত মনীষার এই সব প্রত্যাদেশ আমার জন্য আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পর্যাপ্ত প্রমাণ 'কোন পার্থিব জিনিস আপনা-আপনি সৃষ্টি হতে পারে না—এই অনুমিতি ছাড়াই এসব প্রত্যাদেশ আমার জন্য যথেষ্ট।'

অধ্যাপক হোয়াইটহেড বলেন যে, "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ম্ভু-(স্বয়ং সৃষ্ট) হতে পারে না। এটা নিশ্চিত সত্য যে, বিজ্ঞান আমাদের এক অদৃশ্য কারণ সত্তার দিকেই চালিত করছে। যদি কারণ সত্তাকেই আমরা সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ্ বলি তাহলে বিজ্ঞানই নাস্তিকতাকে অচল ও অসম্ভব করে দিয়েছে।"[৩]

শুধু বিশ্বাস নয়, অজস্র যুক্তির উপর আমাদের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে প্রমাণের ক্ষেত্রে নাস্তিকরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ-ই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সর্ববৃহৎ প্রমাণ। মহাবিশ্ব যখন আপনা থেকেই সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব প্রমাণিত হলো, তখন যিনি এর সৃষ্টিকর্তা, আমরা তাঁকেই বলি আল্লাহ্। মহা-বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও বলেন, 'যুক্তিই আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়।' আল্লাহ্‌র আদিতে কে ছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর মানব জাতির

---

১. অধ্যাপক ডঃ অসকার লিউ ব্রউয়ার, এম. এস-সি., পি. এইচ. ডি. ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান।

২. অধ্যাপক ডঃ জর্জ আর্ল ডেভিস, পি-এইচ. ডি. মিনেসোটা বিশ্ব-বিদ্যালয়, পদার্থ বিজ্ঞানী।

৩. বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম ঃ অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, পৃষ্ঠা ২১।

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ আয়ত্ত-বহির্ভূত। এ বিষয়ে একটি সহজ উত্তর দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ্‌র পূর্বে কোন স্রষ্টা থাকতে পারে না। যেমন ধরুন ঃ

কোন একটি বৃত্তরেখার উপর দিয়ে ক, খ, গ নামক তিনটি লোক যদি আজীবন দৌড়াতে থাকে, তবু কে কার আগে আছে বলা অসম্ভব। এমনি মহাবিশ্বের পূর্বে আল্লাহ্ থাকতে পারেন, আল্লাহ্‌র পূর্বে কেউ থাকতে পারে না।

বস্তু মাত্রই আত্মা দ্বারা গঠিত। জাবির ইবনে হাইয়ানের অভিমতটির দিকেই বিজ্ঞান ক্রমশ এগিয়ে চলছে। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কার করেন বিমূর্ত রূপ (abstract world) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। বস্তুর উর্ধ্বে যা অনুভব ধারণা ও অঙ্কের দ্বারা ধরার চেষ্টা বা অঙ্কের নিয়মে উৎপত্তি। মন সমীক্ষা যা বস্তুরূপ হারিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ গ্রহণ করেছে। আধুনিক বস্তু অবয়বহীন, দুর্বোধ্য, অতি সূক্ষ্ম সত্তা, যা অনুভবকারী চেতনার কাল্পনিক ছায়া।[১]

মহাবিশ্বের বড় তারকার আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে ধাবিত হয়েও কোটি বছরেও এখনও এসে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে নি।

মহাবি ্বই যদি এত প্রকাণ্ড, তার স্রষ্টা কত বড় ? যিনি ধারণারও বাইরে, তাঁকে প্রমাণের আওতায় আনা অবশ্য অসম্ভব।

তবু আল্লাহ্ আশ্চর্য হয়ে মানব জাতির জন্য সহজ যুক্তি উত্থাপন করে বলছেন, 'তারা কি মনে করে কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে গেল— অথবা তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে ?'[৩]

বিশ্ব বৈজ্ঞানিকদের উপরোক্ত উচ্চারণসমূহ কুরআনের এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

---

১. বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম ঃ অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, পৃষ্ঠা ২২।
২. কুরআনে বিজ্ঞ.ন ঃ ডঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াজ্জম, পৃষ্ঠা ২১।
৩. কুরআন—সূরা আত্-তুর ঃ ৩৫।

www.pathagar.com

গ্রন্থসূচি

অ

(অনুবাদ) অঙ্কের সাহায্যে জ্যোতিবিজ্ঞানের সমাধান

আ

আশ শাক-কুল কত্তা
আল-মুকনী ফিল হিসাব আল-হিন্দী
আসারুল বাকিয়া
আল মাজমুয়া (বিশ্বকোষ)
আল-মুসাতাওহ
আরব জাতির ইতিহাস
আল-মলাখস ফিল হাইয়া
আরকন্ত
আল্লাহর অস্তিত্ব
আর্যভট্টীয়
আল-বদি
আল-মাজেস্ট
আখবারুল হুকমা
আজ-জান ওয়াত
আল-আওমাকী জুরজানী
আহকামে (কিতাবুল) মিনিল মাওয়ালিদ
আল-মজিনতি
আল-ইখিল
আল (কিতাবু) মুনিকি আল মোকদ্দমা
আদর্শ নগরী

www.pathagar.com

আল-বর্নি ফিল হিসাব
আল-আশ-শামিলা
আল-মুখতাসারুল
আজ-জিজ জামি ওয়াল বালিগা
আহতাক মিল
আজিজুল হাকিম
আজ-জাবরা
আত-তমদ্দুন আল-ইসলামী
আল-কাউল
আহ ওয়াজুক
আমালি-সাবিতা
আসায়েবুল মখলুকাত
আর-রিসালী আল-মোহতিজি
আইন-ই-আকবরী
আসমানি মুখান
আল-মোকদ্দমা
আরব নৌবহর

ই

ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র
ইখতিসার
ইসলামের ইতিহাস
ইয়াহিয়া-উল-উলুমুদ্দীন
ইসতিখরাজ (কিতাবু)
ইবনে মজিদ
ইনতাব (কিতাবুল)··· · খাফিয়া
ইঞ্জিন
ইস্তিকমাল
ইখতিসার নিওমুল
ইলমুল মাসাইল

www.pathagar.com

ইউটোপিয়া
ইবনে কাসিম (মুহাম্মদ)

উ

উলুম হিসাব আল-হিন্দ
উলুফ (কিতাবুল) ফি বায়তুল ইবাদাত
উলুমিল আউয়ানে ইলা আখের
উরজুজাও
উলুমই আরবাই চেঙ্গিস
এলমুল নজুম
এলমুল জাবর-ওয়াল মুকাবিলা
এফরাদুল ফাল ফি আমরিল আমালাল
একটা ছায়া থেকেই মেরিডিয়ান ঠিক করা
A Hand book on Natural
এবাইয়ামুন-নাফিসা
Averroy
এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

ক

ক্যাপিটাল
কুরআন
কিতাবুল আহকাম
কাফি ফিল হিসাব
কিতাবুন-নজম
কিতাবু ইশবা
কানুন
কামিল ফিল আস্তারলব
কিয়াল কাওয়াকি
কিতাবুল হিন্দ
কিতাবুল আইনুল মস্তেক
কোরআনে বিজ্ঞান

www.pathagar.com

কিতাবুল আমল আল আস্তারলব (প্রস্তুত প্রণালী)
কিতাবুল আলম বিল আস্তারলব (ব্যবহার প্রণালী)
কিতাবু আশকালুত-তামিম
কিতাবুস সুরাত আল-আরদ (ভূগোল)
কিতাবুল কাসতাম
কন্তাবিন লুক আল-বালবেকী
কিতাব কিবালাত
কাশবুল
কিতাবুল কামিল
কিতাবুল বুরহান
কিতাবুল হান্দামা (ব্যবহারিক জ্যামিতি)
কিতাবুল মাদখিল
কিতাবুল মাবাদুত-তাবিয়া
কিতাবুল বারাজিন
কিতাবুল কাওয়াকিব আস-সাবিতা আল-মুসাওয়ার
কিতাবুত তাফহিম
কানুনে মাসউদী
কিতাবুল হিন্দ
কিতাবু ফি হারকাতুল ফালাক
কিতাবুল হামেল ওয়াল মহমেল
কিতাবুল বাবরে ওয়াল ইসমে
কানুন
কিতাবুল মায়াদ
কিতাবুল মনকিদ মিন আদ-দালাল
কিতাবুশ শিফা
কিতাবু উয়ুনুল হিকমা
কিতাবুল ফারক বায়নুল ফারাক
কিতাবু বুলুগ
কিমিয়ায়ে সাআদাত
কিতাবুত তাহাফাতুল ফালাসিফা
কিতাব ফিহিম সামত

www.pathagar.com

কিভাবে ধ্রুবতারার উন্নতি নিরূপণ করা
কিতাবুল খাওয়াম
কিতাবুল ফিল মানাজির
কিতাবুল হাইয়া
কিতাবুত তারিফ বি তাবাকাতুল উমাম (বিশ্ব ইতিহাস)
কিতাব আইনুল ···· মস্তেক হিকমা
কিতাবুল কাবি ফি আহকামিন নজুম
কিতাবুদ দুররা আল-ফকিরা ফি কাশফুল উলুম
কিতাবু খাওস
কিতাবু সাবইনা
কুরআনে বিজ্ঞান

খ

খন্দখাদাক
খালিস আল
খুলাসাতুল হিসাব
খুলামাহিরাজ
খুলসানে মুনতাসহিব

গ

(অনুবাদ) গ্রহাদির গতিবিধি সম্বন্ধে ত্রিকোনমিতির সমাধান
গায়ানুল হাকিম
গরিবুল হামিদ

চ

চাহার মাকালা
চতুর্বেদ

জ

(অনুবাদ) জ্যামিতি গণনার মাধ্যমে পৃথিবীর দুই মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয়
জিজ-ই-মালিক শাহী
জিজ আল-মুতাহার

www.pathagar.com

জাবির ইবনে হাইয়ান
জিজ-ই-মুহম্মদ
জবুর কিতাব
জিজ-ই-জাদিদই মলতানি
জিজ আল-খাকানী
জিজ-ই-উলুগ বেগ
জিজ মুমতাহান
জামি ওয়াত তাফারিক
জিজ আবি মাশার
জ্যোতিবিজ্ঞান গ্রন্থ ও তালিকা
জিজ আল-ফাকির
জ্যামিতির (অনুবাদ) কোণের পরিমাপ (সিনা)

ট

টেট্রাবিবলস ।
টলেমির টেট্রাবিবলসের ভাষ্য ।

ড

De Revolutionibus orbium Coclestium

ত

তফসীর
তৌরাত
তাজরি দুশশুয়াত
তাকসিলে জিজে হাবশ
তাশরিফুল ইনসান ইলাল মউত
তাফহিম
তাকবিম আন-নজর
তামাকিরা
তালখিন
তাকবিম আল-বুলদান
তালখিস ফি আমালুল হিসাব
তাকবিরুত তাহরির

www.pathagar.com

দ

দাখাল আল আয়ান (চক্ষুরোগ)
দার ইলমে কুল্লিয়াত
The Exactitude on the Indian Method of extracting Square and cub roots
দুররাতুত তাজ (বিশ্বকোষ)

ন

নজমুল ইকদ
নাফে আত-তিব
নাজাত
নফুসী হাইওয়ানিয়াহ
নিজামুল মুলক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
নওরোজনামা

প

প্লেনিসফিরিয়াম
পুঁজির উদ্ভব
পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান (ইবনে সিনা)
পৃথিবীর বাহ্য প্রকৃতি
পাঞ্জ্‌গিনত
(The) Perspective
প্লেটোর রিপাবলিক

ফ

ফিহরিস্ত (ঐতিহাসিক বিশ্বকোষ)
ফাখরি, আল (এলজাবরা)
ফি আমালি……আল আস্মাতে
ফি আগরাজে মারাদুত তাবিয়া
ফি জিজ (খাওয়ারিজমি)
ফারাস্তন
(The) flores Albom asaris

www.pathagar.com

ফি তাবইনে রায়ে
ফি (কিতাব) মাইয়াহতাজ··· ইলমু হিসার

ব

বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম
বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়েরী
বিজ্ঞানে মুসলমানের দান
বিপ্লবী নবী
বিজ্ঞান রত্ন
বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
বাদাওয়াত, কিতাবুল
বহরুল হিসাব

ভ

ভারত বিচিত্রা (পত্রিকা)

ম

মুসতাকমাল আল
মুসাতাতহা, আল
মদখল (কিতাবুল) আল-কবির
মাওয়ালিদ (কিতাবুল) আর-রিজাল ওয়াল নিসা
(জন্ম পুস্তক বা জন্মপুস্তকের জনক)
মিজান তাবিই
মানাজিল (কিতাবুল) ফিল হিসাব
মুজান্নব (আল)
মাখদল (আল) ইলা সিনাত নজুম
মাফাতাহিল উলুম (বিশ্বের সর্বপ্রথম বিশ্বকোষ)
মুয়ামালাত (আল)
মিজানুল হিকাম
মুহম্মদীয় তালিকা
মুসকিলত-ই-হিসাব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল-ইমরানী ৯৭
আবুল ফাতেহ ৯৮
আবদুর রহমান সুফী ৯৮, ১০০, ১০২
আল-মামুন ৬৫
আবূ ইসহাক ১০৩
আকবর আলী (এম.) ২৯, ৬০ ১০৫, ১০৭
আবুল ফারাজ আল-নাজিম ১০৬
আবদুল্লাহ্ (খলীফা) ১১৬
আর্মস্ট্রং, লর্ড ১১০
আবূ নাসির ১১৭, ১১৮
আলেকজাণ্ডার ডি স্পিনা ১১০
আল-আওফী (ইখওয়ানুস) ১০৪
আল-জাবমিনি ২০৩
আল-কুহী ১০০
আল-খারাকী ১৮৭
আমাজুর ৯৭
আলী ইবনে ইসমাঈল ১৭৬
আবুল আব্বাস আহমদ ২০১
আস্তারলবী ১০৩, ১৭৩, ১৮৬
আবূ আবদুল্লাহ্ আল-নাতেলী ১৩৪
আবূ রায়হান বেরুনী ২৫৮
আবুল হাসান ১৭৯, ২৪৭
আবুল হাসান আলী ৯৭
আইনস্টাইন ৩২, ১৬৬, ২৭৫
আকবর (সম্রাট) ১১০, ১৫৩, ২১৩
আল্লাদাদ (শেখ) ২১৫, ২১৬
আহমদ নাদির (তাজমহলের ইঞ্জিনিয়ার) ২১৬
আহমদ হাসান ১৩০
আতাউল্লাহ্ ২১৬
আরামন গাউস শ্লাসমি ১৪৯
আল-মিচ্ছি ১০২
আল-হাসান ১৭৪
আহমদ তাইয়েব ৮০
আল-আব্বাস (বৈজ্ঞানিক) ৮১
আল-জানজানী ১০৪
আল-ফজল ৮৪
আল-মাগানী ৯৯
আহমদ ইবনে ইউসুফ ৮৪, ১৭৫
আর্যভট্ট ৮৮
আবুল খিদার ২৫৮
আবূ ওয়াফা ১১৮
আবুল ওয়াফা ৬৩, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১০৩, ১১৮, ১৫১, ১৫৪
আবুল ফারদাস ৯৫
আবুল জুদ ১১৭
আবূ উসমান ৯৭
আজাদ-উদ-দৌলা ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২
আওরঙ্গজেব ২১৪
আবুল কাশেম ৯৯, ১৭৭
আল-কিন্দী ৬৫, ৬৬, ৯৭, ২৭১
আল-খুজান্দি ১১৭
আল-নাইরোজী ৯২

www.pathagar.com

আইরীন, সম্রাজ্ঞী ৫১
আনাটোল ৫১

ই

ইবরাহীম (আ.) ২, ৪, ৯, ২০৬
ইবনে কাসিম ১২, ২৩২, ২৪১
ইউসুফ আল-ঘুরী ৪১, ৯৬
ইবনে ইউনুস ৭২, ৯১, ৯৬, ৯৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫
ইবনে মজিদ (সমুদ্র সিংহ) ২৪৫, ২৫৭
ইবনুল আদামী ৯৬
ইউক্লিড ১৫, ৪০, ৪৮, ৬৭, ৭৬, ৮১, ৮৪, ৯৪, ৯৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৭, ১৭৯ ১৮৪, ১৮৬, ২৩৫
ইয়াকুব ১২৬
ইয়াহিয়া ২৪, ৫০
ইয়াহ্‌হিয়া বিন আবি মনসুর ৬৮
ইসাবেলা (সম্রাজ্ঞী) ১১৫, ১৭২
ইবরাহিম ইবনে সিনান ৯০
ইবরাহীম ইবনে হিলাল ১০৩
ইবনে ইউনুস (কবি) ১৪৪
ইবনে ইউনুস (বৈজ্ঞানিক) ২৬১
ইডিলার, অধ্যাপক ১৫০
ইবনুল হুসায়ন ১৫২
ইবনে তাহির ১৫২
ইতিমাদ, বেগম (কবি) ১৬৯
ইবনে কারনিব ১৭৫
ইমাদউদ্দীন ১৭৫, ২২৭
ইবনে সিনা ১৯, ৪২, ৭৭, ১১২, ১২১, ১২২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৭, ১৫৮ ১৬০ ১৬৪ ১৬৬ ১৭৯ ১৯৪ ২১৪ ২১৯ ২২৩ ২২৫ ২২৭ ২৩০ ২৩৩, ২৭১
ইবনে কুশাক ১৮৫
ইবনে বাজ্জা ৪২, ১৮৯, ১৯২
ইয়াকুব আল-মনসুর, খলীফা ১৯১
ইসমাইল,-অধ্যাপক ১৩৫, ১৫৯
ইউসুফ আল মোতাসন ১৬৯
ইউসুফ ১৬৯
ইয়াযীদ ১১২
ইবনুস সাফ্‌ফার ১৭০
ইবনুল মাসাহ্‌ ১৭৩
ইবনুল হাম্মাদ আল-আন্দালুসী ১৭০
ইবনে সাঈদ ১৭৩
ইবনুল বাজিয়ার ১৭৭
ইবনে নাজিযাত ১৭৭
ইবরাহীম মনসুর, সুলতান ১৯৫
ইয়াহিয়া বিন সহল ১৭৭
ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ ১৭৭
ইউহান্না আলকামা ১৭৭

www.pathagar.com

ইবনে সিয়ুবিয়া ১৭৭
ইবনুস মনবর্দী ১৭৭
ইবনুদ দাহ্‌হাম ১৮৭
ইয়াকুব ইউসুফ, খলীফা ১৯১, ১৯২
ইবনে বতুতা ২৫৬
ইরভিং উইলিয়াম নবলচ ২৭৩, ২৭৪
ইবনে খালদুন ১১১, ২৪৪, ২৬০
ইবনুল হায়সাম ৪২, ১১৪, ১১৫, ১৫১, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ২৬১
ইবনে মারুফ, মুহাম্মদ ২১২
ইমামউদ্দীন, মৌলানা ২১৭
ইবনুন্ন লুবিদী ১৯৫
ইবনুল ইয়াসিমিনি ২০০
ইবনুল বান্না ২০৩, ২০৪
ইবনে বিদার ২০২
ইসাবিলি ২০৪
ইলিয়াস আর্দাবেলী ২১৪
ঈসা মুহাম্মদ ২১৩
ইবনুল কাতিব ২০২
ইখওয়ানুস সাফাহ ১০৩,১০৫, ১৭৩, ২৬০
ইবনে আমাজুর ৯৬
ইবনুল শাতিব ২০৩
ইলখান আহমদ ২০৩
ইবনুল মাজিদি ২০৪, ২১২

ঈ

ঈসা (আ.) ৯, ২৬৬
ঈসা, মুহাম্মদ ২১৫
ঈসা খান ১১০

উ

উমর (রা.), হযরত, খলীফা ৬, ২৪৪
উইলবার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ১০৯
উইকে'ালো ১৫৮
উলফেঙেন ১৬০
উইটেলো ১৬৪
উমাইয়া বিনআবদুল আযীয ১৭৫
উরদী ১৯৬, ১৯৭
উলুঘ বেগ ৯৮, ১৬৯, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ১১৩

এ

এইচ. ফলজিক ২৬০
এরিস্টটল ১, ৪, ৪০, ৪৯, ৯১, ১০৫. ১৩৫, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৬০, ১৬৭, ১৭৯, ১৭৮, ১০৬, ১০৭, ১৩৫, ২০৫, ২৭১
এডিলার্ড বাথ ৫৮
এপোলোনিয়াস ৯৮, ১০০
এলিয়ান মারকিস ১৪৫
এডুইন, অধ্যাপক ২৬৪
এডওয়ার্ড লুথার কেমেল ২৭১
এপিকিউরাস ২০৬. ২৬৩
এডওয়ার্ড গিবন ১৮১

www.pathagar.com

এরিস্টারকাস ১০৭
এডমণ্ড কার্ল কর্নফেল্ড ২৬৪
এডওয়ার্ড, ষষ্ঠ ২৫৪

ও

ওরয় (অনুবাদক) ৭৩
ওয়াকিদি (ঐতিহাসিক) ৫০
ওয়ালিস ৬২, ৮২
ওমর খৈয়াম ৭১, ৮৩, ১১৭, ১৫২, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, ২৫৬, ২৭৫
ওবায়দুল্লাহ্ (মন্ত্রী) ৮৩
ওয়াসিক, (খলীফা) ৮২
ওসায়বিয়া ১৪৫
ওবায়দুল্লাহ্ (ইমাম) ১৫৮, ১৬২
ওয়ালিদ, খলীফা ২৩২
ওয়ার্ডস ওয়ার্থ (কবি) ২৫৩

ক

কন্সট্যান্টাইন (রোম সম্রাট) ৬
কুগেলমান. ল্যুদভিগ ২০৬
কুশায়ার বিন লাব্বান আল-জিনিন ৬১
কনফুসিয়াস ৯
কিং রজার ৩৮
কোয়াবিসি, আল ৯৯
কারপিনস্কি ৫৮
কারা দ্য-ভো ১৪৫
কিরমানি ১৭৩
কুইলিদিমি, আল ৬১
কুশায়ার (জ্যোতিবিজ্ঞানী) ১১৯
Cardan ৬২
কামিন আবু ১০৮
কারখি, আল ৪০, ১১৬, ২৬১
কারবেন দ্য-ভো ১৪৫
কিফতী ১৪৪, ১৭০, ১৭৩, ১৮৬
কঙ্ক (ভারতীয় বৈজ্ঞানিক)
কেলভিন, লর্ড ২৭০
কাজবিনি ১৯৯, ২৬১
ক্লে, মুহাম্মদ আলী ৭০
কুতুবউদ্দীন শিরাজী, ২০৩, ২১৪ ২৪৩
কাবুস, সুলতান ১২০, ১৪০, ১৪৬, ২১৪
কামিল, সুলতান ১৯৪
কাশকাউল ১৪৫
কাতিবি ১৯৯
কাজীম, মুহাম্মদ ১৮৪
কামালউদ্দীন ইবনে ইউনুস ১১৩, ১৯৪
কালামাদি ২০৫, ২১২
কে. এ. রহমান, অধ্যক্ষ ১১২
কোপার্নিকাস ৭১, ৭২, ১২৭, ১৭২
কুস্তা বিন লুকা ১০৭
কালুট, ম্যানুয়েল ১১০
কুশো চিং ১১৪
ক্লড ফ্রিণ্ড ১৭৮
কেপলার ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬

www.pathagar.com

ক্যাভেণ্ডিস ১৬৬
কুতুবউদ্দীন, শাহ ১৮৭
কায়সার ইবনে আবুল কাসেম ২০০
কাযী যাদা রুমী ২০৩
কলম্বাস ২৪৫
কার্লাইল ২৫৩, ২৫৬

খ

খালিদ বিন ইয়াযিদ ২২১
খালিদ (সেনাপতি) ১০
খালিদ (বৈজ্ঞানিক) ১৯, ৫০, ২৩১, ২৪১, ২৪২
খলিল ইবনে আহমদ ২১
খালিদ ইবনে হা'ইয়ান ২৪১
খাসিব, আল (বৈজ্ঞানিক) ৯৬
খাইজুরান ৪৫,
খাওয়ারিজমী, আল ২৯, ৪২ ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭৬, ৯৪, ১০৮, ১৬০, ১৬৭, ১৭১, ২৩৬, ২৬০
খাল্লিকান ১৪, ১৭, ৭১ ১৯০
খাজিম, আল ৯৫
খাজিমী (ক্রীতদাস বৈজ্ঞানিক) ৯৫
খয়ের উল্লাহ্ ২১৭
খালাফ ১১৬

গ

গিয়াসউদ্দীন জামশিদ ২১০
গ্যালিলিও ৫২, ৬৯, ৬৯, ৭১, ৭২, ১১০, ১২৭, ১৬৪, ১৯৩
গারবার্ট ৬১
গুণ্ডিসালভসম ১৪৯
গাযালী, ইমাম ১১৫, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০
গ্রীভস (অধ্যাপক) ২১০
গুটেনবার্গ ১১০
গ্যালেন ৮৩, ১৫০
গেরডনার ১৭৮
গ্রেগরী, পোপ ১৮১
গিবন ২৫৩, ২৫৬
গেটে ২৫৬
গোলাম মুয়াজ্জম, মুহাম্মদ ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৭৬

চ

চন্দ্রগুপ্ত ৪
চসার ২১৯, ২৫৩
চেঙ্গিস খাঁ ২৪, ১১০, ২৪০
চো চিউ কিং ১৫৪

জ

জ্যাকুবিন (ফরাসী বিপ্লবের প্রথম প্রেসিডেন্ট) ২০৭
জোহানেস ৯৯, ১৬৩
জোহানেস-দ্য-লুনা ২৬, ৫৫
জন ক্লোভার মনজমা ২৬৩, ২৬৯
জাবির ইবনে হাইয়ান ৪৮, ১০৫, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৭০
জুরজানী ৮১, ২০৩

www.pathagar.com

জউপাস ৮৪
জিন্দিক ২৭১
জায়দ (রা.), হযরত ১৬
জোহানেস ৯৯
জোহানেস হিস্পালেনসিস ৫৩, ১৪৯, ১৭০
জানজানি ১০৪
জিরার্ড ৫৫, ৭৩, ১৪৯, ১৫০, ১৮৬
জাফর সাদেক, ইমাম ২২২
জুবায়দা ১১৬
জায়েদ বিন রাফ'আ (ইখওয়ানুস সাফাহ্) ১৬, ১০৪
জিমনজেজ (সম্রাজ্ঞী) ১১৫,১৫৪, ১৭২
জন ক্লীডল্যাণ্ড কথর‍্যাল (অধ্যাপক) ২৬৯, ২৭০
জর্জ আর্ল ডেভিস ২৭৫
জুজমানী ১৪৭
জিরার্ড (২য়) ৪১৯
জন পেকহ্যাম ১৫৮, ১৬৪
জেকব বিল মাহির ইবনে তিবাল ১৩৮
জুডা বিন মোজেজ ১৭৪
জাবির ইবনে আফলাহ্ ১৮৮ ১৮৯
জয়সিংহ (মহারাজ) ২১০
জাহাঙ্গীর (সম্রাট) ২১৪
জুলিয়াস সিজার (সম্রাট) ১৮১
জাকির, খলীফা ১৮৮
জোসেফ বিন তিব্বন ২০২
জিয়াউদ্দীন ২১৫
জুরজি যায়েদান ২৪৩

ট

টমাস মুর, স্যার ২৫৩
টলেমি ২০, ২৫, ৪০. ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৭৬, ৮১, ৮৬, ৯১, ৯২, ৯৩, ১০৮, ১১৪, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৫৪, ১৫৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ২৫৯, ২৬০
টরিসিলি ১৬৬
টি, আলী ২৩, ৩০, ৪৯
টিবারটিলুজ ৮৮

ড

ডারউইন ১
ডাওফেন্ট ৬২, ৯৪, ১০৭
ডিস কোরাইডিস ৮৩
ডিটিরিসি ১০৩, ১০৪, ১০৫
ডোমিনিকো ১৪৯
ডিমোক্রিটাস ২৩৫
ডিটিরিয়াস ৯১
ড্রাফার ৩০
Drance Five ৯৯

ত

ত্যাজোরী ৯৪
তৈমুর লং ২০৮
তোফায়েল (ইবনে) ১৯১, ১৯২
তেনজিং ২৪৫
তাবারী, আত ৫৩
তুসী ১৮৬

www.pathagar.com

থ

থমাস ডেভিস পার্কস (অধ্যাপক) ২৭২
থিওডোনিয়াম ১০৭
থিওডেসিস ৭৬

দ

দাউদ (আ.) ২
দীলওয়ারী (আল) ৮০
দ্য স্লেল ১৪৫
দে কার্তে ১৬০, ১৮১, ১৮৩
দাউদ আল-মুনাজিম ১৭৫
দামদামী, আল ১৭৬
দাউদ, ইবনে ২০৪
দান্তে (মহাকবি) ২১৯
দাহির (সিন্ধুরাজ) ২৩৯

ন

নমরূদ ৩, ৯
নওবখত ২২, ২৫, ২৬, ৮৪
নূহ ইবনে মনসুর (খলিফা) ১৩৬
নিউটন ৭১, ১২৬, ১৬০, ১৬৬
১৭১, ১৮৩, ২৫৬
নাজিফ ইবনে ইয়ামন ৯৮
নাজীম ওস্তী ১৮৪
নূরউদ্দীন তুরখান ২১৫
নেপোলিয়ন ১০, ২০৭
নওশের খাঁ (বাদশাহ) ৪৪
নাসিরউদ্দীন তুসী ২৪, ৭৭,
১১৪, ১১৮, ১২৬, ১৫৪,
১৯৫, ১৯৬, ২১১ ২৫৮,
২৫১, ২৬১
নিযামী ১৮২
নিজামই আমিরই, কবি ১৭৯
নাইসেফোরাস ৫১
নাহাওয়ান্দী ৫৩
নূহ (২য়) ১০৫
নিজাম-উল-মুলক, মন্ত্রী ১৭৯,
১৮৪
নিজামই আরুজী ১৭৯
নূরুল্লাহ্ ২১৬
নাসিম হিজাযী ২৪১
নুমান, হাসান ইবনে ২৪৪

প

প্লেটো ৪, ৪৯, ৫৪, ১৩৫, ২০৪,
২০৬, ২০৭, ২০৫, ২৩৫
পেপিন (সম্রাট) ৫
পরাশর ৯
প্যাল ৪৯
প্রতাপ সিংহ ২৩৯
প্যাপাস ৯৭
পল ক্রাউস ২৩৬
পিয়ারে ডাটটিয়রেস ১৪৯
পল আর্নেস্ট এ্যাডলফ ২৬৫,
২৬৬
পল ক্ল্যারেন্স ইবারহোল্ড
(অধ্যাপক) ২৭২
প্যাটলিং ১১০
পিথাগোরাস ২৩৫

ফ

ফাও মন জী ১৯৬
ফয়েরবাখ, লুদভিগ ২০৬
ফিরাউন ৩, ৮, ৯

www.pathagar.com

ফিহ্‌রিস্ত ২২৩
ফাউলার, হেনরি ৬
ফ্রাগানাম তাল ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ২৬০,
ফার্ডিনাণ্ড ৫, ১১, ১৭, ৩৪, ১১৫, ১৭৫
ফাজারী, আল ২১, ২৮, ১৮৩
ফাজারী (২য়) ২৯
ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স ২০৬
ফজল, আল ৮৪
ফ্রেডারিক (২য়) ৩৮, ১৯৪
ফ্রাকানটিয়াস ডিমেনটিনাস ১৪৯
ফেরদৌসী ১১৯, ১৭৯, ২৫৬
ফরিদউদ্দীন আত্তার ১৭৯
ফতেহ. ইবনে মাকান ৯৮, ১৯০
ফরিদ ইবরাহীম (মোল্লা) ২১৬
ফ্রান্সিসকো পেটরার্ক (কবি) ২১৯
ফারাবী (আল) ৯১, ৯২, ১৪৭
ফারিমি ১৯৫
ফ্রাঙ্ক এ্যালেন, (বৈজ্ঞানিক) ২৬৮
ফ্রান্সিস বেকন ২৭৩
ফিরনিস, বিন ১০৯, ১১১
ফাউলটন ১১১
ফ্রাগেল ১০৩
ফনফ্রটেন লিডেন ১০৬
ফখরুল মুলক (মন্ত্রী) ১১৬
ফখর-উদ-দৌলা ১১৭, ১৪১
ফ্লেচার স্কর্চ ২৫৪
ফিঙ্ক ১১৭
ফ্রেডারিক ২য় (সম্রাট) ৩৮

ব

বাজ্জা ১৮৬
বাবর ১১২, ২১৩
বাত্তানী, আল ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১৭২, ২৬০
বিতরুজী, আল ১৯৩, ২০২
বাকী ১৮৬
বনি মুসা-ভ্রাতৃত্রয় ১১, ১৭, ৭৩ ৭৪, ৮৬, ৯৪, ১৩১, ১৬৭, ২১৬, ২৫৭, ২৬০
ব্রুনো ৬৯
বাহা-উদ-দৌলা ১০০, ১০৩
বেদব্যাস ৯
বুদ্ধ ৪, ৯
বদরউদ্দীন আলাভী ১৪৫
বোসো ১৫, ৬২, ১৭০
ব্রহ্মগুপ্ত ৮৮, ১৭১
বুখারী, ইমাম ৫০
বিলাল ৭০
বায়হাকী, আল ১৫১, ১৭৯
বদি আস্তারলবী ১৮৬
বেল ১১৭
ব্রকলম্যান ১০৬, ১৫৬, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৯৬
বাহাউদ্দীন ৩, ৬, ২১২, ২১৭
বায়রাম, মুহাম্মদ ২১?
বার্ট্রাণ্ড রাসেল ২৭৩
বায়রন, লর্ড (কবি) ২৩৩, ২৫৬
বৃন্দাবন ঘুসগো ২১৭

ভ

ভাস্কর (বৈজ্ঞানিক) ২১৩
ভাস্করাচার্য ১১৪, ১৬৪

www.pathagar.com

ভিটাম বেরিং ২৫৯
ভাস্কো দ্য গামা ২৪৫, ২৫৭

ম

মূসা (আ.) ২, ৪, ৯, ১০৫, ২০৬
মার্কস, কার্ল ৩, ১৪৫, ২০৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৬৩, ২৭০
মুহাম্মদ (সা.) ১০, ১৬, ১৪, ১৬, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২ ৪৪, ৫৬, ৬৩, ২২৯, ২৪৯
মারলিন বুক্‌স-ক্রীড়ার ২৭৩
মলিফ্যান্ট, স্যার (অধ্যাপক) ১৬০
মাবিয়া, হযরত ১৬, ১৯, ১১১, ২৪৪
মাভা মোউন ৯৮
মারোয়ান ইবনে হাকাম ১৯
মনসুর (খলীফা) ১৬, ১৭, ১৩, ২৪, ২৫, ২৭, ৪৩, ৫৩, ৭৪, ১০৫
মুতাকিদ, খলীফা ৯০
ম্যারোজিয়া (সম্রাট) ৬
মাহিবুল কুবল ১০৭
মোল্লা-আল কুশজী ২০৯
মুহাম্মদ আলী ২১৭
মূর, উইলিয়াম (ঐতিহাসিক) ৪৯, ২৫৩
মেহেদী, খলীফা ১৩, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১১১
মারওয়ার রোজী, আলী ৫৪, ১৭৬
মুতামিদ বিন আব্বাস ১৭২
মুহাম্মদ বিন আহকাম ১০৪
মুহাম্মদ বিন আকদাম ১০৫, ১৭৭
মুহাম্মদ বিন ঈসা ১০৫, ১৭৭
মুহাম্মদ বিন নুররাত ১৭৭
মুহাম্মদ বিন মূসা ১০৫
মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মাহারজুরি ১০৪
ম্যাকডোনাল্ড ১৭৮
মাইকেল স্কট ১৪৭
মালিক শাহ্ (সুলতান) ১৭৯, ১৮১, ১৮৫, ১৮৬
মালিক আশ-শিরাজী ১৮১
ম্যাকসওয়েল (বৈজ্ঞানিক) ২৭৬
মুহাম্মদ আল-উরদী ১৯৮
মহিউদ্দীন আলি মাগরিবী ১৯৮
মূসা-বিন-শাকির ৬৮
মাইকেলসন, এ. ১৬০
মোজেস বিন তিব্বন ২০২
মনসুর সাইফউদ্দীন (সুলতান) ২০৩
মঈনউদ্দীন কাশানী ২১০
মহানবী (সা) ২৫০
মাঞ্চো খান ১৯, ১৯৬
মকসুদ হিরারী, মওলানা ২১৫
মেডিলো (বৈজ্ঞানিক) ১৭২
মুল্লা মুহাম্মদ ২১৬
মুহাম্মদ আলী (মুষ্টিযোদ্ধা) ২১৬
মুকতাদির বিল্লাহ (খলীফা) ১০২
মালিক আশরাফ (সুলতান) ২৪৭
মিল্টন (কবি) ২৫৪
মেলস মেলব ১৭৮
মেকলে ২৫৩, ৫৬
মারটন, অধ্যাপক ১০০, ১১৬, ১৫৬, ১৬০, ১৭৭, ১৯১, ২৩৭
মামুন বিন মাহমুদ (সুলতান) ১২০, ১২১, ১২২, ১৩৭
মাসউদ, সুলতান ১২২, ১৪৩, ১৪৬, ১৬৩, ২১৪
মাহমুদ, সুলতান ১৪৩, ১৪৬

www.pathagar.com

মাওদুদ, সুলতান ১৪৬, ১৬৩, ১৬৪
মার্তি লেভী ১১৫
মুতামিদ সুলতান ১৬৯
মুজাফ্ফর, সুলতান ১৬৯
মুকতাদির বিল্লাহ্ (স্পেন) ১৬৯
মুতামিদ, (কবি) ১৬৯
মামুরী বায়হাকী ১৮৫
মুখিতউদ্দীন মাহমুদ (সুলতান) ১৮৬
মারটন ১৯৭
মায়মুনুর রশিদ (জ্যামিতিবিদ) ২০০
মায়ার্স (ঐতিহাসিক) ৩৬, ১১০
মাশার আবুল ১৬, ১৮২
মাজদাকী ২৭১
মামুন, আল (খলীফা) ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ২১৪, ২৩০, ২৪৩, ২৬০
মাহনী, আল ৬৬, ৬৭
মুতাজিদ বিল্লাহ (খলীফা) ৭৫, ৮৩, ৯১
মুতাওয়াক্কিল (খলীফা) ৮১, ৮৫, ১০৯, ২৪৩
ম্যানিলস ৮৩, ১১৯
মুকতাদির খলীফা ৯৭
মুকাদ্দামী, আল (ইখওয়ানুস সাফাহ) ১০৪
মাইকেল (৩য়) (সম্রাট) ৫১
মুহাম্মদ (দ্বিতীয়) ১২, ২১১
মাক্‌কারী, আল ১০৯
মুফলিহ ৯৭
মুহাম্মদ বিন ১১৮
মুহাম্মদ বিন আহমদ ১৭৭
মুতাহার ইবনে তাহির ১০৭
মাজরিতি, আল ১০৮
মুতাসিম বিল্লাহ্ ৬৫, ৮১
মাশাল্লাহ্ ১১, ১৬, ৫৪
মাসউদী ২৫৬
মঁসিয়ে মেডিলো ৯৩, ৯৪
মঁসিয়ে লে-পঁ ২৫৯, ২৬০

য

যীশু (আ.) ৮
যারকালী ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৮৬
যোসেফ বিন জুদাহ বিন আর্কানন (বৈজ্ঞানিক) ১৬০
যোসেফ বিন আকসিন ১৬৯
যোসেফ বিন মাহসুন (বৈজ্ঞানিক) ১৬৯
মেরিন স্ট্যানলী কংডন (অধ্যাপক) ২৬৮, ২৬৯

র

রবার্ট দ্য রিটাইনেস ১৪১
রাম ৯
রেমেণ্ড ১৪৯
রিজাল ইবনে ৪
রবার্ট চেস্টার ৫৮
রাবেয়া (র) ৭০
রায়বিকি, অধ্যাপক ১৬০
রুকনউদ্দীন কুরশাহ (সুলতান) ১৯৬
রুশদ, ইবনে ১৮৬, ১৯১, ২৭১
রোসার ১৬৪
রেজিওমনটেনাস ৫৫, ৮৮
রফিই নিশাপুরী (কবি) ১৭৯
রায়হান, আবু ২৫৮
রজকুল্লাহ, আল-মুনাজ্জিম ১৭৬
রুডোলফ ১০৮, ২০৮

www.pathagar.com

রেদওয়ানুর রহমান, সৈয়দ ২৬৩, ২৭৩
র‍্যামসে রাইট ৩, ২৬১
রোজার বেকন ১১০, ২১৯
রসূল (সা.) ১১, ১৫, ২৫১
রুমী (মওলানা) (কবি) ২৫৬ ২৬২, ২৩৬
রশিদ খলীফা (ডঃ) ২৪৮, ২৫০
রাসুব, অধ্যাপক ১১৪
রামুস ১৬২
রায়হানা বিন হাসান ১৬১

ল

লেথস, জে. বি. (অধ্যাপক) ২৬৯
লেঃ কর্নেল ২৬৫
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ৮৪, ১৬৪
লিভিংস্টোন ১১১
লুই চেকো (পাদ্রী) ১৭৪
লিও (সম্রাট) ৫১
লুৎফুল্লাহ্ ২১৬
লিউক ৪৯
ল্যাঙ্গল্যান্ড ২৫৩
লেনিন ২৬৩, ২৭০

শ

শার্লিমেন (সম্রাট) ৫, ৪৬, ১১৩
শাফী, ইমাম ৫, ১৫২
শাকীর ৭০
শরফুদ্দৌলা ১০০, ১০৩
শামস-উদ-দৌলা ১০০, ১৪৭
শি-হোয়াং-টি ৭
শরফউদ্দীন তুসী ১৯৫
শামসুদ্দীন ১৯৮
শ্রীধর ৬২
শিহাবউদ্দীন আহমদ ইবনে মজিদ ২৪৬
শাখারভ (সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক) ৬৯
শামসুদ্দীন সমরকন্দী ১৯৮
শাহরুখ মির্জা ২০৮, ২০৯
শার্প ২১০
শাহজাহান ২১৩, ২১৬
শেরশাহ্ ২১৩, ২১৪
শেক্সপিয়ার উইলিয়াম ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬
শ্রীকৃষ্ণ ৯
শেলী (কবি)২৫৩, ২৫৪
শেখ সাদী ২৫৬

স

C. A. Nallino ৮
সক্রেটিস ৩, ৪, ১০৫, ১০৬, ১০ ১৩৫, ২০৫
সম্রাট সাইরাস (পারস্য) ৭
সুলতান মাহমুদ ১৭৭ ১২৯, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ২২৭
সঁনিয়ে এফ. ওপেক ১১৬
স্পিনা ২১৯
স্মিথ ১৯৪
সিনান বিন ফতেহ ৬৩
সহল ইবনে বিশর (ইহুদী) ৮০
সহল ইবনে তারারী ৮১
সনদ ইবনে আলী ৮১
সায়ফুদ্দৌলা, সুলতান ৯৯
সায়ফুদ্দৌলা (বাদশাহ্) ৯১
স্যাডিলো ১৮৪
সারটন ১৭
সিফসি, আল ৮৪
সাদিয়া বিন যোসেফ ১০৯
স্কট, এন. পি. ১১২
সেলিম (খলীফা) (তুরস্ক) ১১২
সেলজুক ৬, ১২৩, ১২৪
সিউনার্ডো ৬৩

www.pathagar.com

সাবিত ইবনে কোরা ৭৪, ৭৫, ৯৮, ১০৮, ১৭৮, ১৮৯, ৫০
সাইদা বেগম ১৪১
সমরেশ দেবনাথ ৪৮, ৫০
স্নেল ১৬০, ১৬১
সুলতান সঞ্জর সেলজুকী ১৮৪, ১৮৫
সুলতান সালাহউদ্দীন ১৮৭
সুলতান মনসুর ইবরাহীম ১৯৭
সদরুদ্দীন ১৯৮
সালাহউদ্দীন মুসা ২০৯
সোলায়মান, খলীফা ২৩২
সৈয়দ সুলায়মান নদভী ২৪২, ২৪৪
সুলায়মান, সুলতান ২৪৭
সোলায়মান (নাবিক) ২৫৭, ২৫৮ ২৫৮

হ

হাসান (সুলতান) ২১০
হিরাক্লিয়াস ৫
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (অনুবাদক) ৪৮, ৫১, ৬৭, ৮১
হিট্টি ২৩, ১৫৩, ২২৩, ২২৯
হালাকু খান ২৪, ১১৪, ১১৫, ১৯৬, ২০৮
হুনায়ন ইবনে ইসহাক ৪৯
হাদী (খলীফা) ৪৫
হোয়াইটহেড, অধ্যাপক ২৭৫
হিলারী ২৪৫
হীরো (বৈজ্ঞানিক) ৭৩
হাসান ইবনে ইসহাক ১৭৯
হিবসরা. রাজকুমার ৪
হিমসী ৯৮
হারুনুর-রশীদ ৫, ১৬, ১৭, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৭, ৬৭, ৭৭, ৮১, ১১৩, ১১৬, ২২২, ২৩৩, ২৪২, ২৫৬
হামরনী, আল ২৪৪
হোসায়েন (বৈজ্ঞানিক) ২৬০
হাইড ২১০
হোমইয়ার্ড (অধ্যাপক) ১৪৮, ২২১, ২৩৭
হোনইয়ার্ড ২৩৬
হিপারকাস ১৭০
হুমায়ুন ২১৩, ২১৪, ২১৫
হাসান বিন সহল ৪৯
হাসান (সুলতান) ২১১
হারুন ইবনে আলী ৫৩
হামিদ ইবনে আলী ৯৬
হিসপালেনসি ৯৯
হিপসিকলম ১০৭
হাম্মুরাবি ৩৫
হাজিমী ২০৪
হাকাম (খলীফা) ১০৭
হোচিয়েন (জার্মান পণ্ডিত) ১১৬
হাকিম (খলীফা) ১৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৯৬
হাসান মেসবাহ ১৭৫
হাকিমি মওসিলি ১৭৯
হুসায়ন ইবনে ইসহাক ৮১, ৮৩
হাকিম লুকরী ১৮৪
হামসার ২০১
হেগেল ২০৬
হাইয়ান, জাবির ইবনে ১১২, ২৭৫, ২৭৬
হিশাম (খলীফা) ২৩২
হাররামী, আল ১৭৬
হাসান মাররাকুশী (বৈজ্ঞানিক) ২০১, ২৬১

ইফাবা—৮৮-৮৯—প্র/৪০৮৪ (রা)—৩২৫০—১.৪. ১৩৯৫/১৫.৭. ১৯৮৮

www.pathagar.com